এক জীবন অনেক জন্ম

নীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

"Was n't our love for each other (I should continue)
Infused with life, and life infused with our love ?
Very well ; repeat me in love, repeat me in life,
And let me sing in your blood for ever."

Christopher Fry : A Phoenix Too Frequent

১৭ই জুন ১৯৬১

কলিকাতা

এই লেখকের

- অন্য নগর
- স্মরণচিহ্ন
- নীলকণ্ঠী
- সুপ্রিয়ার বন্ধন
- দময়ন্তী
- অন্দরমহল
- সোহো স্কোয়ার

এক ॥

তুমি আছ। তুমি থাকবেই।

যতদিন আমার নিশ্বাস ঝরবে আর প্রশ্বাসে লাগবে জীবনের [illegible]—যতদিন আমার এই দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন তোমার উত্তাপের স্পর্শ থাকবে আমার রক্তে—আমার শিরায় স্নায়ুতে

আমি যতদিন থাকব তুমিও থাকবে আমার সঙ্গে সঙ্গে—আমারই ছায়ার মতো। এ জীবনে আর কোনদিনও তুমি এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়াবে না। কিন্তু [illegible] আমার [illegible] নয়ন তোমারই জন্যে। তারই [illegible] আমি [illegible] সারাক্ষণ।

তুমি আছ। তুমি থাকবেই।..............

কিন্তু চৈত্রের রুক্ষ কঠিন এবং [illegible] মরুভূমি হয়ে জ্বলুক আমা[র] সমস্ত জীবন। তবুও মিথ্যা শান্তির আশায় অদৃশ্য কোন নিষ্ঠু[র] পুরুষকে আমি ভগবান বলে পুজো করতে পারব না। আমা[র] ক্ষমতা থাকলে আগুনের তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে এই পৃথিবীর প্রত্যে[ক] মানুষের অলীক বিশ্বাস আমি শিথিল করে দিতাম। আমার [illegible] [illegible]—শূন্য। আমার বুকে সারাদিনরাতের কী অসহ্য যন্ত্রণা এখনও আমার শরীর কাঁপে। উঠে দাঁড়াতে গেলে আমি পা[ই না] পাই।

আমি ভুলতে পারি না বিস্ময় আর আর্তনাদের সে[ই] [illegible] ভয়ঙ্কর মধ্যাহ্ন। আমি ভুলতে পারব না আমার

ফুটে উঠেছে কাছাকাছি সব গাছ-পালায়। তুমি আবার আমাকে দেখলে।

আমি ঠোঁটের ফাঁকে হাসি কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখছ?

তোমাকে, তুমি এগিয়ে এলে আমার কাছে, আজ ছুটি থাকলে খুব ভাল হত—

আমি তাড়া দিয়ে বললাম, শিগগির তৈরি হয়ে নাও। ইস্কুল-পালানো দুষ্টু ছেলে কোথাকার।

বৃষ্টি থেমেছে তখন। রাস্তায় দেখা যাচ্ছে দু-একটা লোক। আর তুমিও বাইরে বার হলে। যেতে যেতে বার বার পিছন ফিরে তাকালে আমার দিকে।

যতক্ষণ তোমাকে দেখা যায় ততক্ষণ আমি জানলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ট্যাক্সি আসছিল খুব জোরে। তুমি হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামালে। তারপর ট্যাক্সিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তুমি খেয়াল করলে না যে আমি তখনও জানলায় দাঁড়িয়ে।

রোজই হয় এমন। তুমি চলে যাও আর আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর তোমার মূর্তি যখন মিলিয়ে যায় আমার চোখের সামনে থেকে আমি সরে আসি। মন দিই সংসারের কাজে। আর ব্যস্ততার ঝাঁজে বলতে পার তোমার কথা আমার মনেও থাকে না।

কিন্তু কি এমন কাজ আমার সংসারের। কিছুই না। আমি এ ঘরে যাই, ও ঘরে যাই। এটা নাড়ি, ওটা নতুন করে সাজাই। চাকরকে বকি, ঝিকে উপদেশ দিই। আর মাঝে মাঝে যখন আমার কোন বন্ধু এসে পড়ে তখন তার সংসারের কথা শুনি—তার সুখ দুঃখের ভাগ নিই। আর নানা হাল্কা কথা বলে কখনও কখনও দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে হাসাহাসি করি।

বন্ধুরা আমাকে ঈর্ষা করে। বলে, আমার মতো সুখী নাকি তারা

কেউই নয়। আমার সংসারে আমি একেবারে স্বাধীন। শ্বশুর নেই। শাশুড়ী নেই। দোষ ধরবার একটি লোকও নেই এ বাড়িতে। এখানে শুধু একটি মানুষই আছে যে আমার কোন দোষই দেখতে পায় না—যে শুধু প্রগাঢ় মাধুর্য দিয়ে আমার সব ত্রুটি ঢেকে দেয়।

কিন্তু আমি তাদের ভুল সংশোধন করে দিই। তাদের বুঝিয়ে দিই যে তুমি মোটেই মাটির মানুষ নও। একটু এদিক ওদিক হলে তুমি আমাকে ছেড়ে কথা বল না। আমি কোনদিন যদি আমার কোন বন্ধুর বাড়িতে যাই আর দেরি করে ফিরি কিম্বা তোমাকে একা ফেলে পাড়া[illegible]র বাড়িতে বেড়াতে যাই তাহলে ফিরে এসে দেখি তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তুমি অনেকক্ষণ তাকাও না আমার দিকে। আমি কথা বললেও উত্তর দাওনা।

অনেক পরে যেন আপন মনে বলে ওঠ, কাল থেকে রাত বারোটার পর বাড়ি ফিরতে হবে দেখছি—

আমি সব বুঝে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে বলি, কেন?

বেশ কড়া স্বরে অন্যদিকে তাকিয়ে তুমি উত্তর দাও, একা একা ভূতের মতো বসে থেকে তো লাভ নেই, আমার বাইরে অনেক কিছু করবার আছে।

তাই নাকি? একটা কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আমি বলি, আমার কিন্তু কোথাও কিছু করবার নেই।

তোমার ভাবনা তুমি ভাব—

তখন আমি তোমার খুব কাছে সরে এসে বলি, থাক। অনেক হয়েছে। আর রাগ দেখাতে হবেনা—

সরে যাও! তুমি যেন আমার স্পর্শ সহ্য করতে পারনা। জোর করে আমার হাত সরিয়ে দাও।

কিছুক্ষণ আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার ছেলেমানুষী দেখে আমার হাসি পায়। কিন্তু আমার ভাল লাগে তোমাকে—

আমার ভাল লাগে তোমার কৃত্রিম অবহেলা—তোমার ক্রোধের এই শিশু সুলভ অভিনয়। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তোমার প্রতিদিনের জীবনে আমি না থাকলে তুমি কতখানি অসহায়!

তোমাকে যেন আমার আগলে আগলে রাখতে হয়। স্বাস্থ্যের কোন নিয়ম কানুন তুমি জাননা—জানলেও মানতে চাওনা। আমি যখন আসিনি তোমার সংসারে তখন তুমি নাকি পনেরো-ষোলো কাপ চা খেতে আর সিগ্রেট খেতে পাঁচ-ছ প্যাকেট। তাছাড়া এমন আরও অনেক অনিয়ম করতে যা আর কিছুদিন চালালে তোমার শরীরের অবস্থা কেমন দাঁড়াত বলা কঠিন।

তুমিই আমাকে অনেকবার বলেছ যে আমিই সাজিয়ে তুলেছি তোমার বিশৃঙ্খল সংসার—আমিই তোমাকে ফুটিয়ে তুলেছি নতুন করে।

তোমার কথা শুনতে শুনতে আমারও বলতে ইচ্ছে করত অনেক কিছু। বলতে ইচ্ছে করত যে এ সংসারে এসে নিজের কাছেই আমার মুল্য বেড়ে গেছে অনেক। আর এতদিন এক নিদারুণ অনিয়ম তোমাকে পীড়া দিয়েছে ভেবে মনে কাঁটা-ফোটার অস্বস্তি অনুভব করতাম। কিন্তু আশ্চর্য, একটি কথাও বার হত না আমার মুখ দিয়ে। আমি শুধু তোমার কথা শুনেই যেতাম।

আর শুনতে শুনতে শরীরে গর্বের দু-একটা রেখা ফুটে উঠত কোথাও না কোথাও। নিজেকে মনে হত হাওয়ার ছোঁয়ায় উড়ে আসা শিমূল তুলোর মতো হালকা আর আকাশ-ছোঁয়া প্রখর আলোর রঙে ধাঁধা লেগে যেত আমার চোখে।

সেই সব দিন! সেই সব রাত! আমাকে মুছে দাও—নিশ্চিহ্ন করে দাও কাচের দেয়াল ঘেরা এই পৃথিবী থেকে। ঠিক তেমন আর একটা মধ্যাহ্ন এসে আমাকেও টেনে নিয়ে যাক তোমার কাছে।

হ্যাঁ, সেই মধ্যাহ্নের কথা।

ট্যাক্সি তোমাকে নিয়ে ছুটে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তুমি চলে গেলে অনেক দূরে। জলে ভিজে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো স্থির হয়ে আছে। একটা গরু খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে রাস্তায়। আকাশের এক প্রান্তে তখনও ঘন কালো মেঘ। একটু পরে হয় তো আবার ঝম ঝম করে জল নামবে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক গায়ে লাগছে।

কিন্তু এখন ঘরের মধ্যে জলের ঝাপটা না এলেই ভাল হয়। এখান থেকে সরে যেতে আমার ইচ্ছে নেই। আমার ভাল লাগছে মেঘলা আকাশ—আমার দেখতে ইচ্ছে করছে দূরের চিকন শ্যামল রঙ। আর ঠাণ্ডার মৃদু একটা স্পর্শ আমি যেন বুক দিয়ে অনুভব করছি।

হঠাৎ এই দাঁড়িয়ে থাকা, এই সবুজ-শ্যামল আভায় বিভোর হয়ে যাওয়া আর প্রকৃতির ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব আমাকে যেন কখন এক সময় ঝুপ করে ঠেলে দিল বেদনার আবরণহীন এক মুক্ত সরোবরে।

সেখানে তুমি নেই। সেখানে আর কেউ নেই। সংসার নেই। শৃঙ্খলা নেই। কিন্তু কী নিবিড় তৃপ্তির সে-অবগাহন !

সেখানে শুধু আমি একা। আর আমার চোখের জলে বেদনার এক-একটি তরঙ্গ ফুলে ফুলে উঠে আমাকেই আঘাত করছে বারবার।

আমি চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি সরে এলাম জানলার কাছ থেকে। যেন কঠিন হাতে ভীষণ শব্দ করে জানলা বন্ধ করে দিলাম।

আর তখন ভয়ের একটা সরীসৃপ আমার গা বেয়ে বেয়ে যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। আমি জেগে উঠলাম অন্য আর এক সংসারে। সেখানে আমার কোন দায় নেই। কোন কাজ নেই। সেখানে একাকীত্বের নিবিড় এক স্বাদে আমার নিশ্বাস যেন আরও

সহজ হয়ে এল। আর একটি একটি করে খসে পড়ল কর্তব্যের সব শৃঙ্খল।

সেদিন কে আমাকে তোমার এই ভরা সংসার থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল—সঙ্কেত পাঠিয়েছিল!

সে যেই হোক, তার নাম জানবার কোন কৌতূহল নেই আমার। কিন্তু সেদিন ভিজে ভিজে মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার রক্তের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বেদনার গোপন একটা বেগ—যা মাঝে মাঝে সুখকে হারিয়ে দেয় আর এতদিন সে-বেদনার স্বাদ পাইনি বলে নিজেকে কেমন খালি-খালি মনে হয়।

আমি সেদিন তোমাকে ভুলেছিলাম মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আর কী মধুর সে অনুভূতি! আমার জীবন থেকে তোমাকে লুপ্ত করে দিয়ে একা-একাই আমি যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তখন অনেক কান্না জমা হয়েছিল এই পৃথিবীতে।

আমি আজ বুঝতে পারি না সেদিন কেন একাকীত্বের তীব্র এক স্বাদ আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছিল। যেন আমি ঘুরে ফিরছি এখানে ওখানে খুশিমতো—আমার জীবনধারা হয়ে গেছে অনেক বেশি সহজ। আর তোমার ভার বহন করার কোন দায়িত্ব নেই বলে আমার মনের অনেক জটিল গ্রন্থি খুলে গেছে। মুক্তির বর্বর এক আনন্দের জোয়ারে কাঁপছিল আমার দেহ মন। আর ঠিক তখন, হয়তো নিজেকে জয় করবার জন্যেই আমি তোমাকে খুঁজেছিলাম।

তোমাকে চেয়েছিলাম নিজেকে শাসন করবার জন্যে। আজ তুমি নেই। তাই আমার অনেক কথা মনেই রয়ে গেছে। কাউকেই বলা হল না।

সবই তো ছিল আমার। কোন বাসনা-কামনাই অপূর্ণ ছিল না। তবু কেন আমি সেদিন দুপুরে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলাম!

কারণ যৌবনের একটা ভয়ঙ্কর দাহ আছে। সে-দাহ মাঝে

মাঝে সব নিয়ম-কানুন ভেঙে আমাদের অরণ্যের আদিমে নিয়ে যেতে চায়।

কিম্বা আরও বলা যায় যে দুঃখের একটা স্বাদ আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। তাই সারা দিনরাতের আনন্দ হঠাৎ এক সময় বিপুল ক্লান্তি আনে। আর তখন যে সবচেয়ে আপনার জন, জীবনে যেন তারও কোন প্রয়োজন থাকে না।

কিন্তু সেকথা থাক। এত কথা আজ বলবই বা কাকে! শুধু তোমাকে। তুমি আছ আমার ভাবনা-চিন্তায় রক্তে নিশ্বাসে। তুমি থাকবেই।

আমি ভাবিনি, তুমি যেখানেই থাক বিশ্বাস কর, আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে এমন রূঢ় আকস্মিক আঘাত দিয়ে তুমি আমাকে একাকীত্বের উৎকট স্বাদ দেবে—বিশৃঙ্খল করে তুলবে আমার সমস্ত জীবন।

২

দরজায় প্রবল আঘাত শুনে সেদিন আমার তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। কে এল এই বর্ষার ভরা দুপুরে? কে এমন করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল? আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজা খুলে দিলাম।

লোকটা দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে। কোন কথা বলেনি। আমাকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। হয় তো বাইরে গাড়ি কিম্বা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। ওর গায়ে এক ফোঁটা জল নেই।

একবার এপাশে-ওপাশে তাকালাম আমি। আর কেউ কোথাও নেই। চাকরটা বাইরে গেছে। ঝির ঘুম সহজে ভাঙে না। এ বাড়ির প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট একেবারে চুপচাপ

কি উদ্দেশ্য লোকটার?

কাকে চান ? আমার মুখ থেকে ভয়ের ভাবটা জোর করে মুছে দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় বললাম।

থেমে থেমে ভারী স্বরে লোকটি বলল, দীপা ঘোষাল—

হ্যাঁ, আমার নাম, আমি তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে।

না, তাকে আমি চিনি না। আমি কখনও দেখি নি। এমন অসময়ে কি বলতে এসেছে সে আমাকে! সতর্ক হয়ে তার কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু মুখ নামিয়ে রইল সে। ইতস্তত করছে। কি একটা কথা যেন আমাকে বলতে গিয়েও বলতে পারছে না।

আর তখন বৃষ্টির ভারী ঝাপটা লাগল জানলার সার্সিতে। আরও বেশি অন্ধকার হয়ে এল। হঠাৎ জানি না কেমন করে আমি বুঝে নিলাম সব। হ্যাঁ, ও বলবার আগেই আমি মনে মনে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। দেহও। আমার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। বারবার ঢোক গিলছিলাম। তবু ও বলুক। নিজেকে বিশ্বাস করলেও অবিশ্বাসের ক্ষীণ একটা রেখা হয়তো কাঁপছিল মনের কোথাও। যদি অন্য কথা শুনি—যদি কোন আশ্বাস পাই। তাই ওর কথা শোনার আগ্রহে আমার রোমকূপে যেন আগুন ধরে গিয়েছিল।

আবার থেমে থেমে ও বলল, প্রেমাংশু ঘোষাল আপনার কে হন ?

উত্তেজনার বিপুল জোয়ারে আমি ভুলে গেলাম সব কিছু। এক নিশ্বাসে অস্বাভাবিক স্বরে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে তার ?

আমাকে ছাড়িয়ে ও তাকাল ভেতরের দিকে। বোধহয় খুঁজেছিল আর কাউকে। যদি আমি একা সহ্য করতে না পারি—যদি আমি আছড়ে পড়ি মাটিতে।

কিন্তু আর কেউ তো নেই এ বাড়িতে। শুধু তুমি। আর তুমি যখন থাকনা তখন এখানকার ঘরে ঘরে কাঁপে তোমারই চঞ্চল প্রতীক্ষা।

উত্তেজনা-থরো থরো কিন্তু ঈষৎ রূঢ়স্বরে আমি বললাম, এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি কি বলবেন আমা-কেই বলুন।

ও বলল। বলতে হবে বলেই বলল। বলতে এসেছিল বলেই না বলে পারল না। ভূমিকা করেছিল সামান্য। কিন্তু তার মৃদুস্বর আমার কানে যায় নি।

হয় তো শুধু একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার বেরিয়েছিল আমার গলা চিরে। চিৎকার নয়—আর্তনাদ। আর একটু পরেই ঝাপসা চোখে দেখি ফ্ল্যাটগুলোর দরজা খুলে গেছে। আমাকে ঘিরে রয়েছে এ বাড়ি ও বাড়ির চেনা অচেনা অনেক লোক।

সেই ট্যাক্সিই—যা আমি দেখেছিলাম মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে—ভিজে ভিজে হলুদ-কালো ম্লান একটা রঙ—তোমাকে নিয়ে গেল এ পৃথিবী থেকে।

এখন আমি কী করব!

মুমূর্ষু মানুষের প্রায় বিকল হৃদযন্ত্র যেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ তোলে ঠিক তেমনি সেই ট্যাক্সির শব্দ আজও আমার কানে এসে লাগে।

কিন্তু একটি কথা আমি কাউকেই বলতে পারিনি—আমার চেনা আধচেনা কোন মানুষকেই নয়। আমার বুকের ভেতর কেঁপে উঠলেও—আমার পা থেকে মাথা অবধি শীতের অন্ধকারে ঠায় রাস্তায় দাঁড়ানো গাছের মতো কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও, আমি কাউকেই বলতে পারি নি যে সেদিন এ ভয়ঙ্কর খবর শোনবার জন্যে আমার অবচেতন মন যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। আর ছিল বলেই আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি নি দুঃসহ শোক-যন্ত্রণার কঠিন অতলে।

তুমি নেই সেকথা আমি মানব না। মানতে পারব না। তোমার স্বর এখনও ভাসে আমার কানের পাশে। তোমার উত্তাপ নেশা জাগায় আমার রক্তে।

[তুমি আমাকে ভালবেসেছ। ভালবাসতে শিখিয়েছ। তুমি আমার আশ্বাস। আমার দ্বিধা। আমার বিশ্বাস।

আমার সংসারে তুমি নেই। কিন্তু তুমি আছ আমার রক্তের মধ্যে মিশে। থাকবেই।]

॥ দুই ॥

এই পৃথিবী যেমন ছিল ঠিক তেমন আছে।

আজও দেখি অনেক ভোরে ঘুম ভেঙে যায় বলে ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে দেখতেই হয় আকাশের পূর্ব প্রান্তরে তেমনি করেই অল্পে অল্পে লালের ছোঁয়া লাগে।

তেমনি করেই ঘুমের ক্লান্তি আজও বিছানায় অবশ করে রাখে আমার শরীর। আর হাওয়ার ঠাণ্ডা ছোঁয়া মধুর সান্ত্বনার মতো আমাকে যেন বারবার নিঃশব্দে বুঝিয়ে দেয়, আমি অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলেও কোন ক্ষতি হবেনা এ সংসারের।

এখানে আমার করবার কিছুই নেই। এ জীবন এখন আমার কাছে লম্বা একটা বিশ্রাম। আর কেউই ব্যাঘাত করবেনা আমার বিশ্রামের।

আমার মা এসে বলবেন, শুয়ে থাক, শুয়ে থাক দীপা—ভিজে ক্ষীণ দৃষ্টিতে তিনি যেন জোর করে তাকিয়ে থাকবেন আমার দিকে। চোখের জল গোপন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে হাত বুলিয়ে দেবেন আমার গায়ে—মাথায়। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা আমি না কাঁদলেও তিনি ভাববেন আমি মনে মনে কাঁদছি নিশ্চয়ই।

রোজই এসে মা আমার পাশে বসেন। আর আমার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনার কথাগুলো আগে বোধ হয় তিনি সাজিয়ে নেন। তারপর একসুরে একবারও না থেমে তিনি বলে চলেন, কতই বা বয়স তোর! কতটুকুই বা দেখলি জীবনের। এর মধ্যে কি যে হয়ে গেল!

আমি দেখি মার চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে, আমার

দুঃখের ছোঁয়া তাঁকেও তিল-তিল করে পোড়ায়। শুধু তাঁকে নয়, এ বাড়ির প্রত্যেককে।

আমি যেন এ বাড়ির প্রত্যেকের মুখে বিষাদের গাঢ় রেখা এঁকে দিয়েছি। আমার দুঃখে নিজেদের জীবন থেকে আপাতত আনন্দ বিসর্জন দিতে হয়েছে সকলকে। তাই তাদের কাছে আমি সহজ হব কেমন করে—কেমন করে মেলে ধরব আমার ভাঙাচোরা দীন চেহারা।

আমার মা-বাবার বাড়িতে আমি একেবারেই সহজ হতে পারি না। আমার মাথা ঘোরে। শরীর কাঁপে। আমার গলা শুকিয়ে শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে যায়।

মা বলে যান, তোকে শক্ত হতে হবে দীপু। তোকে উঠে দাঁড়াতে হবে। ভুলিস না, তোর সমস্ত জীবনটাই পড়ে আছে—

আমি মার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদি। আমার বুক-ভাঙা দুঃখের জন্য হয়তো নয়, কাঁদি মার সান্ত্বনার কথা শুনে—কাঁদি নিষ্ঠুর পৃথিবীর কথা মনে করে।

প্রেমাংশু নেই। কিন্তু তার চলে যাওয়াটা যেন কিছু নয় এ সংসারে—আমার বেঁচে থাকাটাই অনেক বড়।

প্রেমাংশুর হাত না থাকলেও যেন আমার জীবন তছনছ করে দেয়ার সবটুকু দোষই তার। তাই হয়তো এ বাড়ির প্রত্যেকের মনে তার ওপর একটা চাপা আক্রোশ জ্বলছে। সে চলে গেছে বলেই আমি এসেছি এদের সংসারে শোকের তুষার ঝরাতে।

তার কথা কেউ বলেনা। আজ না হলেও আর একটু পরে, যখন বাসি হয়ে যাবে প্রেমাংশুর চলে যাওয়া আর এ সংসারে আমার থাকাটাও সয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে মা-বাবা দাদা-বৌদি আর আমার যত আত্মীয় আছে এখানে ওখানে, তারা সকলেই ওই মানুষ-টাকে একেবারে মুছে দিতে চাইবে আমার মন থেকে—এ পৃথিবী থেকে।

আমার জীবনটাকে উজ্জ্বল করে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টায় আমারই মনে সান্ত্বনার সুরে সুরেই তারা জ্বালিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে আর এক আগুন।

আর একজন আসুক—অধিকার করুক প্রেমাংশুর স্থান—আমাকে বাঁচিয়ে তুলুক তিল তিল মৃত্যুর সূচ-বেঁধা যন্ত্রণা থেকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিষ্টি ভাষায় তারা আমাকে বিয়ের কথাই বলবে। আজকাল এমন কথা অনেকেই বুঝিয়ে থাকে। আমার বাড়ির লোক তো বোঝাবেই। শোককে জয় করবার কথা নয়, শোককে ব্যঙ্গ করবার কথা বলে এই পৃথিবীকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলবে আমার কাছে।

তাই আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। এই ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার মধ্যে আমি মনে রাখতে পারব না প্রেমাংশুকে—আমি শ্রদ্ধা করতে পারব না আমার শোককে। জীবনকে শুধু একই ভাবে চেনবার কথা এখনই জোর করে কেন এরা বোঝাবে আমাকে!

[আমার জন্যে এই পৃথিবীর কোথায়ও কি এক ফালি জায়গা নেই যেখানে আমার সর্বস্ব দিয়ে আমি শ্রদ্ধা করতে পারব—গ্রহণ করতে পারব—বহন করতে পারব আমার গভীর দুঃখকে!]

দেখ, আজ আকাশে কাশ-শুভ্র চিকন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কী উজ্জ্বল রঙের ঝিলিক! মেঘের এমন নিঃশব্দ সমারোহে তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁকে কিম্বা ঘুম আসবার আগে প্রায় মধ্যরাত্রে অনেকবার দেখিয়েছ।

দীপু, আমার আরও কাছে সরে এসে দাঁড়াও—

না, ওই দেখ, সামনের বাড়িতে এখনও আলো জ্বলছে—

তাতে তোমার কি?

ওখান থেকে সব দেখা যায়।

ইচ্ছে করেই তুমি যেন গভীর হতাশার লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলতে, আমি পাশে থাকলেও তুমি বোধ হয় ভুলে যেতে পারনা এই পৃথিবীকে ?

পৃথিবীকে ভুলতে গেলে তোমাকেও যে ভুলতে হয় সে কথা বোঝনা ? শুধু উচ্ছ্বাস আর উচ্ছ্বাস। যুক্তি যার নেই সে কেমন মানুষ ?

থাক্, তোমাকে কাছে সরে আসতে হবে না। একটা কথা বলেছি বলে অত তর্ক করতে আমি পারব না।

এই তো—হয়েছে ?

ঠিক যেন একটা যন্ত্র।

আর তুমি একটা ভাবের জাহাজ, তোমার গালে আস্তে আঘাত করতাম আমি, অগাধ জলে হাপুস হুপুস করলে হঠাৎ একদিন সব যে শেষ হয়ে যায়—জান না ?

না। এখন তোমার কাছে শিখছি। তবে একদিন কথায় কথায় এই লেকচার দেয়ার জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে।

কেন বলতো ? মাঝরাত্রে কৃত্রিম বিস্ময়ের কৌতুক ফুটে উঠত আমার চোখে। কিন্তু তা তুমি অন্ধকারে হয়তো বুঝতে পারতে না।

তোমার গম্ভীর স্বর থমথম করত, রেখে ঢেকে অল্পে অল্পে চেপে চেপে জীবনকে ভোগ করা যায়না।

আমার কিন্তু ঠিক উল্টো কথা মনে হয়—

তোমার দর্শনের ব্যাখ্যা এত রাত্রে আর নাই বা করলে।

খুব অল্প কথায় বলেই ফেলি, তোমার গায়ের যত কাছে আসা যায় তত কাছে এসে বলতাম, অল্পে অল্পে জীবনকে ভোগ করলে ভোগের ক্লান্তি বুড়ো বয়সেও আসেনা। খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে আমি চাই না—

অনেক দূরে সরে গিয়ে তুমি বলতে, আমার এত কাছে এলে যে ? এখন পৃথিবীর কথা বুঝি ভুলে গেলে ?

ওই দেখ, সামনের বাড়ির আলো নিভে গেছে। এখন কেউ কোথাও নেই। এখন বাতাসে একটা নেশা আছে। এখন—

থাম, বিষণ্ণ নির্জীব মানুষের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে তুমি চলে যেতে ঘরের ভেতর। আর কি তীব্র আকর্ষণে আমি অনুসরণ করতাম তোমাকে!

বাইরে প্রথম শরতের কাঁপা-কাঁপা অন্ধকার। ভেতরে ম্লান জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আভা। আর আমি জানি ঠিক এই মুহূর্তে আমাকে পাবার ভয়ঙ্কর আগ্রহে তুমি অস্থির হয়ে উঠেছ মনে মনে। কিন্তু তুমি কথা বলবে না।

আমি মিশে যাব তোমার সঙ্গে—এক হয়ে যাব! সিরসির হাওয়া আর রুপোলি আলোর রেখা ভরে উঠবে আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার নেশায়!

আজও—দেখ, আমার শরীরে রঙের আভা লেগেছে। আমার নিশ্বাসের তপ্ত একটা ভাব মিশে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। আমি তোমাকে অনুভব করছি একা-একা অন্ধকারে অল্প অল্প করে।

কিন্তু সব হারিয়ে গেল, মুছে গেল। টুকরো টুকরো হয়ে গেল আমার ভাবনা। তোমাকে আমি পেলাম না নিবিড় করে বুকের মধ্যে। আর এক দুর্ঘটনা আজও তোমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে—আমার চোখের সামনে থেকে—আমার আয়ত্তের পরিধি থেকে।

একটু আগে এ বাড়িতে কিন্তু কোন শব্দ ছিলনা। বারান্দার আলোটাও নিভে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। দাদা-বৌদির ঘরও অন্ধকার। অনেকক্ষণ আমার কাছে থেকে মা সরে গেছেন।

তাই আমি আমার রোমকূপের অনুভূতি দিয়ে তোমাকে নামিয়ে আনলাম আমার রক্তের মধ্যে।

কিন্তু—হঠাৎ তাকে আমার মনে পড়ে গেল। ঝিরঝির বর্ষার দুপুরে নির্দয় কঠোর যে মানুষ এসেছিল আমাকে খবর শোনাতে। ফর্সা

রঙ। বিষণ্ণ চোখ। কোঁকড়া চুল। কিন্তু কী নির্মম সেই মানুষ!

যদি আবার সে কোনদিন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলে হয়তো আমি চিৎকার করে উঠব। তাকে আঘাত করব। তার চোখের আড়ালে যাবার ক্ষিপ্ত ইচ্ছায় আমি আশ্রয় খুঁজব কোন অন্ধকার ঘরে।

আজ বাবাকে দেখে আমি ঠিক তেমনি ভয় পেলাম। সেই দুপুরে অচেনা নিষ্ঠুর মানুষের মতোই আকাশের আলো চিকচিক অন্ধকারে বাবা এলেন কঠিন এক আঘাতে আমার মন থেকে তোমাকে লুপ্ত করে দেবার জন্যে।

দেখ, এক মুহূর্তে আমার সব অনুভূতি শুকিয়ে গেল। যেন হঠাৎ হাওয়ার উষ্ণ আমেজ সেঁকে সেঁকে যাচ্ছে আমার শরীর। বাবা এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে—আমার জীবনে নিঃসঙ্গ অকাল বার্ধক্যের মতো। রুক্ষ কঠিন উনি এলেন আমাকে কাঁদাতে।

ওঁর স্নেহের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারছি না গো। এ কৃপা আমার অসহ্য। তোমাকে নির্জনে অলৌকিক পাওয়ার গোপন কথা আমি কেমন করে তাঁকে জানাব।

তাঁর ঠাণ্ডা কথার শ্রোত আমাকে ঠাণ্ডা সংসারেই আবার নামিয়ে আনবে। আর এখন হিম-কনকনে দেহ নিয়ে আমি শুনে যাব তাঁর কথা। শুনব আর কাঁদব। তোমার স্পর্শ থাকবেনা এখন আমার এই কান্না থরোথরো শরীরে।

দীপু না, গাঢ় স্বর বাবার। তবু উনি কথা বলবেন। আমাকে বোঝাবেন যে জীবনে আনন্দের সঙ্গে দুঃখকে গ্রহণ করবারও শক্তি থাকা দরকার।

বাবা কথা বলবেন থেমে ভেবে ভেবে। কখনও কখনও উচ্চারণ করবেন গীতার শ্লোক। কখনও বলবেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আর

অনেকের জীবনের করুণ কাহিনী শুনিয়ে বোঝাবেন যে তাদের তুলনায় আমার শোক কিছু নয়।

মা, আবার বাবা বললেন কিছুক্ষণ পর, দৈবের ওপর মানুষের হাত নেই। কিন্তু মানুষ মানুষই। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই বিপুল দুঃখের মাঝেও সে হারিয়ে যায় না। জীবনকে ভরে তোলে ভগবানেরই অগাধ ঐশ্বর্যে।

আমাকে কাছে টেনে নেন বাবা। আর তাঁর বুকে মুখ গুঁজে আমি ফোঁপাই। আমাকে কাঁদতে হয় বলেই আমি কাঁদি। অনেকক্ষণ।

কিন্তু তোমার জন্য নয়, সান্ত্বনার এমন কথা আমি আজকাল যার মুখ থেকেই শুনিনা কেন, আমি কাঁদি আমার নিজের জন্যে। আমি ছোট হয়ে গেছি বলে।

কী ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব আমাকে কথায়-কথায় তোমার কাছ থেকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দেয়। তোমার দৃঢ় উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিবর্ণ রুক্ষ নিঃসঙ্গ এক আগুন-জ্বলা প্রান্তরে ছুঁড়ে দেয়।

আমার আনন্দের দিন, তোমার আমার অনেক ঘুমহীন রাত আর অজস্র স্মৃতির প্রখর দীপ্তি দিয়ে কিছুতেই এ বাড়িতে ভরে রাখতে পারবনা আমার মন।

তুমি যেন শুধু দুঃখই দিয়ে গেছ আমাকে। আর কিছুনা। মিথ্যা হয়ে গেছে এদের কাছে তোমার আবির্ভাব, তোমার সোহাগ আর আমাকে নতুন করে সৃষ্টি করবার তোমার অলৌকিক ক্ষমতা।

এখন এদের কাছে শুধু সত্য তোমার মৃত্যু আর আমার শোক। আমার সুখের দিনের কথা বলে কেউই আমাকে বলে না যে কী বিপুল সুখের গৌরবে আমি তৃপ্ত হয়ে উঠেছিলাম—কী আশাতীত আনন্দ—হ্যাঁ, তোমার ছোঁয়ায় নতুন জন্মই হয়েছিল আমার।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে বাবা আমার মাথাটা জোর করে

বুকে চেপে ধরে আছেন। তাঁর বুক উঠছে-নামছে। তাঁর নিশ্বাস লাগছে আমার গায়ে।

ঘুমবি না দীপু?

হ্যাঁ।

তোকে আমি কাঁদতে বারণ করবনা। কাঁদ দীপু। এই কান্নাই তোকে শক্ত করে তুলবে। তোকে ভাঙতে দেবেনা—

কান্না কাঁপা স্বরেই আমি বলি, আর কিছুদিন পর থেকে আমি একটা চাকরি করব বাবা—

মন ভাল রাখবার জন্যে তোর যা খুশি তাই করিস। কিন্তু একটা কথা ভুলিসনা যে আমি যতদিন আছি ততদিন তোর কোন ভাবনা নেই।

জানি।

আর আমি না থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না। আমি তোর জন্যে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব—

আশ্চর্য মানুষের দম্ভ! বাবার কথা শুনতে শুনতে আমার কান্না হঠাৎ থেমে যায়। আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলি, ব্যবস্থা সে-ই তো সব করে গেছে বাবা। টাকা পয়সার দিক থেকে বোধহয় কোন অসুবিধাই আমার হবে না—

এসব কথা বলতে বলতে আমি মনে মনে ভাবি, আমাকে শুধু শোকের সাগরে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যেই সে আসেনি এ পৃথিবীতে।

আমি আজ ছোট—অনেক ছোট তোমাদের কাছে। তোমরা আমার জন্যে কাঁদ—আমাকে কৃপা কর। মা মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তোমার মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর ঝিমিয়ে গেছে দাদা বৌদি।

কিন্তু এবার আমি সুযোগ পেয়েছি দম্ভ দেখাবার। এবার অন্তত একবারের জন্যেও আমি প্রমাণ করব যে হঠাৎ শেষ হয়ে

গেলেও প্রেমাংশু কখনও ভোলেনি আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। এত কম সময়ের মধ্যেও সে আমার জন্যে রেখে গেছে অগাধ অর্থ। কোন ত্রুটি ছিলনা তার কর্তব্য পালনে।

কিন্তু আমার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন না বাবা। তবু আমাকে অভয় দিলেন, তোর যা আছে তা থাক যেমনকার তেমন। আমি তোকে আলাদা একটা বাড়ি করে দেব। এক তলা ভাড়া দিয়ে দোতলায় তুই থাকবি নিজের মনে। আবার লেখাপড়া শুরু করবি। বাইরে যাবি ইচ্ছে হলে। ভাবনা কী তোর!

না, আমার কোন ভাবনা নেই। হু-হু করে আবার কাঁদি আমি। এই ভেবে আমার চোখের জল পড়ে যে যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন এমনি করুণার কথা আমাকে শুনতে হবে। আমার একটা গতি করবার ভাবনায় এ বাড়ির কারুর ঘুম হবেনা। যেন আমি এখানে এসেছি এদের সকলের হাসি মুখ বিষণ্ণ করে তুলতে। আমি কী করব!

তোমাকে হারিয়ে যেদিন প্রথম আমি থাকতে এলাম এ বাড়িতে —মানে যেদিন আমার প্রায় অচৈতন্য দেহটাকে এরা সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে এল সেদিন আমি ভাবতে পারিনি যে আমারই ছোঁয়ায় হঠাৎ একদিনেই শুকিয়ে যাবে এ বাড়ির প্রত্যেকটি লোক। আর আমি বেদনার প্রতীকের মত তাদের শুধু দুঃখই দেব।

আকাশে আজও আছে চিকন আলোর ঝিলিক। গাছের পাতাবা মধ্যরাত্রে ঠিক তেমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর সূর্যের প্রখর দম্ভ আজও ক্লান্ত করে তোলে মানুষকে।

কিন্তু শুধু তুমি নেই বলে হঠাৎ যেন ওদের সকলের ভাষাই বদলে গেছে। তবুও আমি ওদের ইঙ্গিতেই তোমাকে খুঁজি—তোমাকেই চাই। তোমাকে না অনুভব করতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। দুঃখ সহ্য করতে পারি কিন্তু দৈন্যের বোঝা বহন করবার মতো মহৎ আমি নই।

এরা আমাকে দীন করে তুলছে দিনে দিনে। সমবেদনা জানিে
নিজেদের অজ্ঞাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমি কত অসহায়।

আমার বাইরের চেহারা দেখেই সহানুভূতি জানাচ্ছে এরা। যে
চিরকালের মতো খাবার থাকবার ভাবনা ঘুচলেই আমি নিশ্চিন্ত।

তাই আমিও বাবাকে বলতে পারলাম যে, আমার ভাবনা নেই
সব ব্যবস্থাই পাকা করে গেছে প্রেমাংশু। টাকা-পয়সার ভাবন
ভেবে কোনদিনই আমাকে দিশা হারাতে হবে না।

তবু আমি কাঁদি। কেউ আমার মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখলন
বলে তোমাকেই খুঁজি। কাকে আমি দেব আমার প্রত্যে
মুহূর্তের ভাবনার ভাগ। অসীম ধৈর্যে কে শুনবে আমার অজ
প্রলাপ।

আর তা ছাড়া আজ যারা আমার কাছে-কাছে ফিরছে—আমাবে
সান্ত্বনা দিচ্ছে, সহানুভূতি জানাচ্ছে—তাদের সব উত্তাপ জুড়িয়ে যাবে
—ফুরিয়ে যাবে। আমি জানি যে খুব শিগগিরই আমি তাদে
কাছে একটা ভারী বোঝার মতো হয়ে উঠব।

আমার তখনকার অসহায় অবস্থার কথা ভেবেও আজ আমি
কাঁদি।

এখনও বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার পাশে। কিন্তু মনে হচ্ছে
তিনি যেন অনেক দূরের মানুষ—আমি তাঁকে ভাল করে চিনতে
পারিনা।

দীপু!

বাবা? আমার গলার স্বর ক্লান্ত করুণ।

এবার ঘুমো।

ঘুমব বাবা।

হ্যাঁ, এবার ঘুমিয়ে পড়।

ঘুমিয়ে পড়তেই হবে আমাকে। যখন অনেক রাত অবধি আমার
ঘুম আসে না আর একা একা বিছানায় শুয়ে ছটফট করি তখন

আমার মনে হয়, কেউ ঘুমের কড়া ওষুধ খাইয়ে দিক আমাকে। আর আমি সব ভুলে যাই।

বাবা কিন্তু বুঝলেন না আমাকে। থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন, আরও কত লোক আছে যাদের তুলনায় তোর দুঃখ কিছু নয়—তুই এমন করে ভেঙে পড়বি কেন ?

করুণ একটা নিশ্বাস ফেলেন বাবা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বোধ হয় মনে মনে কিছু একটা ভেবে নিয়ে আবার বলেন, দীপু মা, কোন দায় তোর এ সংসারে আছে বল ? ছেলে মেয়ে নেই। একটি মোটে মানুষ তুই। তোর যা খুশি তুই তা করতে পারিস—

এক একবার ইচ্ছে হয়, চিৎকার করে বলে উঠি, বাবা চুপ কর। আমার দুঃখ নিয়ে আমাকে একা একাই কাটাতে দাও [illegible]। সান্ত্বনার কথা বলে আগুনের ছোঁয়া দিওনা আমার মনে—

ছেলে মেয়ে ! ওগো, তুমি কি জাননা কোথায় আমার লাগে ! কেন আমি দিশা হারিয়ে শক্ত করে ধরি আমার সামনের দেয়ালটাকে।

ছেলেমেয়ে থাকলে মনের এই দাহ হয়তো অনেক জুড়িয়ে যেত। তোমার উত্তপ্ত রক্তের একটা জীবন্ত চিহ্ন থাকত আমার চোখের সামনে। তাকে জড়িয়ে ধরে আমি সকলের সব ঠাণ্ডা সান্ত্বনার কথা সহ্য করতে পারতাম।

আমার অল্পে অল্পে জীবনকে ভোগ করবার ইচ্ছা আজ কী [illegible]ক্ষর দাহে অবশ করে দেয় দেহমন।

তুমি চেয়েছিলে। আমি চাইনি। অন্তত প্রথম কয়েক [illegible]রের জন্যে শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম। ছেলে মেয়ে যেন বাধা হয়ে দাঁড়াত আমার এই চাওয়ার।

কিন্তু আজ ! ধারালো বিদ্রূপের কঠিন একটা ঝাঁজ একটু একটু করে ভুলিয়ে দিচ্ছে আমার বেঁচে থাকা। কী গ্লানি ! কী দুঃসহ যন্ত্রণা এই জীবন ধারণের।

তবে কি আমি ইচ্ছা-মৃত্যুর অন্ধকারে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাব সকলের অলক্ষ্যে? না খেয়ে, একে একে অনেক অনিয়ম আমন্ত্রণ করে, শুকিয়ে শুকিয়ে তোমার মতো হারিয়ে যাব এ পৃথিবী থেকে?

কি তোর দুঃখ, উঃ, বাবা এখনও কথা বলে যাচ্ছেন, এ একটা দুর্ঘটনা। কে কি করবে বল? কিন্তু না খেয়ে শেষ হয়ে যায় কত মানুষ—অন্যায় কাজ করে ফাঁসি যায়—তুই তাদের আত্মীয় স্বজনদের কথা একবার ভেবে দেখ—

বাবাকে বাধা দিয়ে বলি, আমি সব বুঝি—

তবু তিনি সরে যাননা আমার কাছ থেকে। আরও কথা বলে যান। আমার কানের পাশে শুধু তাঁর গলার স্বর ভাসে—তাঁর সব কথা আমি শুনি না। শুনতে পারিনা।

বাবা যাবেন। মা আসবেন। যতক্ষণ আমি ঘুমের ভান করে নিঃসাড় হয়ে না যাব ততক্ষণ তিনি বসে থাকবেন।

কিছুদিন আমাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ঘুমতেন। কিন্তু আমিই জোর করে তাঁকে অন্য ঘরে পাঠিয়েছি আমার রাত্রির গোপন ভাবনা বার বার বাধা পায় বলে।

তারপর দাদা আর বৌদি। দাদা আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় আর বৌদি প্রায় আমার সমান সমান।

দাদা যখন আমার সামনে দাঁড়ায় তখন আমি নিজেই কাঁদি। এই হাসি খুশি মানুষটি আমার জন্যে কী অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গেছে! আমি তাকাতে পারিনা দাদার দিকে।

আর মুখে কিছু না বললেও, আমি বুঝতে পারি যে বৌদি ভয় পায় আমাকে দেখে। আমার অবস্থা দেখে দাদাকে বলে সতর্ক হতে—সঞ্চয়ী হতে।

দুজনের স্বভাব একেবারেই আলাদা। একদিনেই দাদা চায় বিশ্বের সব আনন্দের স্বাদ পেতে। আর বৌদির শুধু সঞ্চয়। দাদা

না থাকলে যেন তাকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় না দাঁড়াতে হয়।

একদিন কথায় কথায় বৌদি আমাকে বলেই ফেলে, তবু প্রেমাংশুদার মতো মানুষ কজন হয়? এত কম বয়সে সব দিকে খেয়াল ছিল তার। যেখান থেকে যা পাব হৈ হৈ করে সব উড়িয়ে দেবার কোন মানে হয়?

ইচ্ছে করেই শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে আমি বলি, টাকা-পয়সা জীবনের যে-কোন সময়ই জমানো যেতে পারে বৌদি। কিন্তু বয়স? আনন্দ করবার বয়স একবার চলে গেলে আর বোধ হয় আসে না—

কিন্তু—হয়তো আমার উদাহরণ দিতে গিয়ে ইতস্তত করে বৌদি। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, হঠাৎ ভাল মন্দ একটা কিছু ঘটে গেলে? তখন? এদিক-ওদিক দুদিকই যায়। আনন্দ কিম্বা সঞ্চয় কিছুই থাকে না।

আমি ঘাড় হেলিয়ে বলি, তা বটে।

না বলে উপায় নেই বলেই সায় দি বৌদির কথায়। কিন্তু তাকে দেখতে দেখতে শোকের তুষার ঝরা এক দীর্ঘ বিষণ্ণ মরুভূমি পার হয়ে আমি যেন হঠাৎ পৌঁছে যাই কাঁপা কাঁপা আলোয় উজ্জ্বল আমার খুব চেনা এক আশ্চর্য প্রান্তরে।

সে আমার নিজের সংসার। সেখানে শুধু আমি ছিলাম আর তুমি ছিলে। আর ছিল দুটি মনের এক আশ্চর্য বিস্তার। কোন দৈন্য না। কোন কার্পণ্য না। হিসেব-নিকেসের অনেক ওপরে পৌঁছে আমরা পেয়েছিলাম মুক্ত জীবনকে।

বৌদি তা পায়নি। পাবেও না। দৈনন্দিন তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার ওপর যে প্রেম রূঢ় যবনিকা ফেলতে পারল না কী তার সার্থকতা—কী তার বিশালত্ব?

কিন্তু এসব কথা আমি তোমাকে ছাড়া কাকে আর বলব?

তবুও হয় তো এ আমার একার অহঙ্কার। একদিন আমি ভুলেছিলাম প্রতিদিনের গ্লানি—আমি পেয়েছিলাম জীবনকে। এই পৃথিবীর আর কোন মানুষ হয় তো তেমন করে সব-ভোলানো স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে নি। এই ভাবনাই তবে আজ আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিক। সব বিরুদ্ধ শক্তি ছাই করে দিয়ে আমি তোমাকে ধরে রাখি আমার আনন্দ দিয়ে। তুমি শুধু আমার স্মৃতি নয়—আমার জীবন। এখনও আমি তোমাকে নিয়েই বাঁচব।

এখনও বোধ হয় শরতের মাঝামাঝি। ঠিক খেয়াল নেই। আকাশের ঝাপসা মেঘে খুঁজে খুঁজে দেখলে হয় তো দু-একটা তারা চোখে পড়ে। কিন্তু কে খুঁজে দেখবে। আমার অত সময় নেই। আমি আজ মরে যাবার—মিলিয়ে যাবার ব্যাকুল উন্মাদনায় জ্বলে যাচ্ছি। আমি আমার ঘরের এক কোণে অন্ধকারের সঙ্গে এক হয়ে তোমাকে নিবিড় করে ধরছি আমার দুই বাহু দিয়ে —আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর আমার উষ্ণ নিশ্বাস যেন অল্প অল্প করে আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমার সব কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক এই সময়—একা একা অন্ধকারে আমি ডুবে যাই—হারিয়ে যাই—আগেকার মতোই লুপ্ত হয়ে যাই চৈতন্যের জগৎ থেকে। কেউ নেই। কিছু নেই। শুধু আছে তোমার কঠিন স্পর্শ আর স্থূল একটা বন্ধন। আমি এক হয়ে যাই তোমার সঙ্গে।

আর যখন ক্লান্তি নেমে আসে আমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে—আপন মনেই আমি হাঁপাতে থাকি—তখন আমার মনে হয় জীবনের শেষ দিন অবধি শুধু মন দিয়ে নয়—দেহ দিয়েও আমি তোমাকে রোজই রাতের অন্ধকারে ঠিক এমন করেই ধরে রাখব। রূপে

যৌবন-জ্বলা একটা নির্ভীক পুরুষ প্রথমে কাছে সরে আসবেই আমার। শুভ্র কোমল শয্যা হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠবে।

বাইরে কোলাহল থাকে তখন তাহলে তা কানে যাবে না কারুর। শুধু চঞ্চল নিশ্বাসের শব্দ।

হ্যাঁ গো, এমনি করেই একা একা নির্লজ্জ হয়ে উঠে আমি ধরে রাখব তোমাকে। আর দিনের আলোয় আমাকে যখন দেখবে বাড়ির লোক তারা খুশি হবে—ভাববে আমি ভুলেছি তোমাকে—আমি ভুলেছি আমার শোক! তারা বুঝবে না যে আমি তোমাকে আমার আরও অনেক কাছে টেনে এনেছি।

তোমাকে হারিয়ে কী ক্ষতি হয়েছে আমার!

খুব অল্পদিন! আমি সামলে নিলাম নিজেকে। আমি তোমাকে নতুন করে পেলাম। আমি তোমাকে পেলাম এদের সকলের মাঝে। হয় তো ঠিক আগের মতোই। আমি আবার সহজ হয়ে উঠলাম। মা-বাবা আর দাদা-বৌদিকে আমি দেখলাম নতুন চোখে।

ওরাও দেখল আমাকে। হয় তো আড়ালে হাসল বৌদি। এত অল্পদিনে আমি এমন করে তোমাকে ভুললাম বলে আমাকে মনে মনে বিদ্রূপ করল কি-না কে জানে। করুক। ওরা কেউ না জানুক, তোমাকে তো রাখতে পারলাম আমি মৃত্যুকে অস্বীকার করে।

এখন দুপুর। আমার ঘরের সামনে এক ফালি বারান্দা আছে। প্রথম শীতের হালকা রোদ স্থির হয়ে থাকে তারই এক ধারে। আর লাফালাফি করে এপাশে-ওপাশে অনেক চড়ুই।

একটা বেতের চেয়ারে আমি একদিকে বসে থাকি আর সারা ওদেহে তীব্র এক যন্ত্রণা অনুভব করি। কিসের যন্ত্রণা? আমি কাউকে লতে পারব না—বোঝাতে পারব না।

ওপর রাতের অন্ধকারে আমি নিবিড় করে তোমাকে পাই কিন্তু দিনের কী তালোয় সব যেন আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে যায়। আমি বসে থাকি কিছুক্ষণ। এদিকে কেউ নেই। এখন যেন কেউ না আসে।

আমার ভাবনা আমাকে আরও ক্লান্ত—আরও অবশ করে তুলুক।

কিন্তু না। দিনের বেলায় আমার জন্যে কোন নির্জনতা নেই কোথাও। বৌদি আমাকে খুঁজছে। আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

আর একটা বেতের চেয়ার টেনে জয়া বসে পড়ে আমার পাশে। সাত বছরের ঝণ্টু গেছে ইস্কুলে আর হয়তো এখন একটা গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুম আসছে না জয়ার। আমি মাথা তুলে হাসিমুখে তাকালাম ওর দিকে।

জয়া বলল, একা-একা চুপচাপ বসে আছ—আমাকে ডাকলেই তো পারতে—

সব সময় তোমাদের বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না, একটু থেমে রাস্তার ওপারে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার জন্যে আর কত সহ্য করবে তোমরা—

বাধা দিয়ে জয়া বলল, আমরা আবার কি সহ্য করলাম? এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটলে সকলেই তো দুঃখ পায়।

ম্লান হেসে আমি বলি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করি আমার জন্যে তোমরাও নিজেদের জীবন থেকে সব আনন্দ দূর করে দিয়েছ—

না না, তা করব কেন? তবে কি জান? নতুন করে আবার সেই পুরনো কথাই বলে জয়া, সঞ্চয়ের মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই—

হাসি পায় আমার। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। হাসতে পারি না। যদি আজ তুমি থাকতে—(শুধু আমার মনে নয়, আর সকলের চোখের সামনে) তাহলে আজ হয়তো জয়ার কথা শুনে আমি জোরেই হেসে উঠতাম। আর এক সময় তোমাকে চুপে চুপে বলতাম, জীবনের একটা কত বড় দিক জয়ার কাছে একেবারেই অজানা রয়ে গেছে।

কিন্তু জয়া হয়তো মনে করে যে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেছে জীবনকে। তাই ওর স্বরে দরদ কাঁপে। ও সান্ত্বনার স্বরে আমাকে বোঝায়, আজ এই দুপুরে একা-একা বসে তুমি যে প্রেমাংশুদার কথা ভাবতে পারছ—প্রাণ খুলে শোক করতে পারছ তার কারণ জান ?

জয়ার কথা স্পষ্ট বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, কি ?

কারণ প্রেমাংশুদা তোমাকে শোক করবার প্রচুর সুযোগ দিয়ে গেছে—

আমি আবার জিজ্ঞেস করি, কিসের সুযোগ ?

জয়া সুন্দর হাসি হেসে বলে, আজ যদি তোমাকে টাকার ভাবনায় ছুটোছুটি করতে হত—বেঁচে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টায় যেতে হত এর কাছে তার কাছে তাহলে স্বামীর জন্যে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শোক করবার অবসর পেতে না—

আমি কিছু বলতে চাইনি কিন্তু হঠাৎ যেন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তো বেঁচে যেতাম—

জয়া হেসে বলে, হয়তো বাঁচতে কিন্তু তাকে বেঁচে থাকা বলেনা—স্বামীর ওপর আজকের এই সুন্দর শ্রদ্ধা তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারতে না।

আমি তর্ক না করে বলি, জানি না। তবে তার ওপর আমার আকর্ষণ বোধহয় জীবনের কোন অবস্থাতেই কমবে না—ও না থাকলেও না।

আমার কথা শুনে জয়া মুখ টিপে অদ্ভুতভাবে হাসে, ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস না করলে জীবনের অনেকদিক জানা যায় না। কিন্তু তোমাকে সেসব দিকের কথা যেন কোনদিনও না জানতে হয়—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জয়া কী যেন ভাবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ওর নিজের কথা বলে। ওর মা-বাবার কথা।

জয়া বলে, জানোই তো, আমাদের অবস্থা কোনদিনও স্বচ্ছল ছিল না। অনেক অসুবিধার মধ্যে আমি লেখাপড়া শিখেছিলাম। আর শুধু আর্থিক অনটনের জন্যে আমার মা-বাবার জীবন একেবারেই সুন্দর ছিল না—

আমি চমকে উঠে বাধা দিয়ে বলি, সুন্দর ছিল না মানে?

জয়া হেসে বলে, কেবলই অভাব আর অভাব আর অভাব। টাকা জোগাড়ের চিন্তা ছাড়া বাবার মাথায় আর কিছু থাকত না আর কথায়-কথায় তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত—এই নিয়ে মা কত দুঃখ করতেন আমাদের কাছে—

মনে মনে করুণা করা ছাড়া জয়ার জন্য এই মুহূর্তে আর কোন অনুভূতিই আমার থাকে না। হ্যাঁ, আমরা সকলেই অভাব এড়িয়ে চলতে চাই কিন্তু অর্থের দৈন্য কেমন করে মানুষের প্রেমকে আচ্ছন্ন করে তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার আবার তোমার কথা মনে হয়। একবার—আমাদের বিয়ের পর প্রথম প্রথম গ্রীষ্মের এক শেষ রাত্রে—তখন হালকা অন্ধকার ভরা পৃথিবীতেও আলোর স্পষ্ট আভাস ছিল—তুমি বলেছিলে—আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব বিয়ে করে অনুতাপ করে—

আমি তোমার কথা শুনে ঠাট্টার সুরে বলেছিলাম, তুমিও কর নাকি?

আর কিছুদিন যাক, তখন বুঝতে পারব। এখন কিছু বলতে পারি না, আমাকে তোমার দুই শক্ত বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে তুমি হেসে বলেছিলে, অনেকের সঙ্গে আমার মত মেলেনা দীপু—আমার ভাবনা-চিন্তা মনে হয় যেন একেবারেই অন্য রকম—

মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন?

শুনে হাসবে না?

বল না ?

অভাব সকলের জীবনেই হয়তো কোন না কোন সময় আসে আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী এক ক্লান্তি দেহমন অবশ করে দেয় তখন মানুষ সব ভুলে যায়, আমাকে আদর করে তুমি গলার স্বর অনেক নামিয়ে বলেছিলে, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে সব চেয়ে আপনার জন তাকে তখন লোকে কেমন করে বোঝা বলে মনে করে—

আমি বলেছিলাম, ভালবাসায় খাদ থাকলে সকলের সব কথাই তো মনে হতে পারে।

দু-এক মিনিট চুপচাপ তুমি কী যেন ভাবলে। তারপর বাইরে হঠাৎ ফুটে ওঠা অল্প অল্প আলোর ইশারা পেয়ে যেন ফিসফিস করে বলেছিলে, যদি হঠাৎ আমি অক্ষম হয়ে যাই—কঠিন অভাবের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়—তাহলে ?

তোমার মুখ চেপে ধরে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, এসব কথা এমন করে আর কখনও আমার সামনে বলবে না তুমি—

হাসতে হাসতে তুমি বলেছিলে, না বলব না। আমি জানি চিরকাল তুমি আমারই থাকবে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করতে পারি না যে পরিবেশ অনেক রকম করে সব মানুষের মনের ওপর ছায়া ফেলে—

আমি তোমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠেছিলাম, আর তখনই বোঝা যায় কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা—ক্ষুব্ধ অভিমানে বোধ হয় আমার প্রশ্ন ঝাঁজালো মনে হয়েছিল তোমার, কেন, তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও ?

না না না।

কিন্তু আর না। কথা বলবার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে বসে আছে জয়া। ইচ্ছে না থাকলেও ওর কথা আমাকে শুনতেই হবে। আমি শুনব। তর্ক করব না। বাধা দেব না। আমার সঙ্গে সকলের যে আগাগোড়া অমিল। আমি জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে

থাকি চুপচাপ। ও কথা বলুক। ও আমাকে শোনাক ওর মনের দৈন্যের কথা।

কিন্তু দেখ, হয়তো নিজের মা-বাবার অশান্তির কথা ভেবে জয়া বলে, অভাবের মধ্যে বেড়ে উঠে একটা অস্বস্তি আমাকে অনেক ছোট করে দিয়েছে বলে আমি সব চেয়ে আগে তার হাত এড়াতে চাই—চোরের মতো ছোট হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না কিছুতেই।

না, ও পারবে না। আমার বৌদি জয়াকে আমি চিনি। হয়তো একটা কথা ও বুঝতে পারে না যে তিল-তিল সঞ্চয় করে হৃদয়ের সূক্ষ্ম বৃত্তিকে পিষে মেরে বড় হয়ে বেঁচে থাকা যায় না। আর সব চেয়ে আপনার জনের কাছেই আস্তে আস্তে নিজেকে এক সময় ছোট হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সেকথা আমার বৌদির মতো মেয়েকে বোঝাবার ধৈর্য আমার নেই।

॥ তিন ॥

আর একটা রাত। এখন সবই জুড়িয়ে গেছে—সহজ হয়ে গেছে। যেন—এ বাড়ির সকলে মনে করে আমিও ভুলেছি সব কিছু। সেই সব দিনের কথা আমার মনেও নেই।

কিন্তু এবার তোমাকে আমার চাইই-চাই। এই চাওয়া—আমার রক্তে-রক্তে একটা আকস্মিক বুনো প্রবৃত্তির আস্ফালন আমাকে অস্থির করে তোলে।

আমার কাছে এখন সব মিথ্যা হয়ে গেছে। মিথ্যা হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে গোপনে তোমার আসা-যাওয়া। তোমার আদর-সোহাগের কল্পনা আর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে না।

ভয়ঙ্কর এক আগুনের তাপ আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে এই পৃথিবীর শান্ত নম্র মধুর সব কিছু। আমিও জ্বলছি—জ্বলছি যৌবনের দারুণ ক্ষুধায়। রক্ত-মাংসের তোমাকে আমি চাই।

একটা ছায়া—মধুর কল্পনার রুপোলি জাল—এসব দিয়ে আমি আমাকে আর দিনের পর দিন ভুলিয়ে রাখতে পারব না। একা-একা ছেলে-ভুলোনো ছড়া গান গেয়ে কেমন করে আমি আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা মেটাব!

না, তোমার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই। আমি সব কথাই স্বীকার করব একে একে। কী নিদারুণ দ্বন্দ্বে আমার বুক জ্বলে পুড়ে যায় কে তার খবর রাখে।

আমি অনেক চেষ্টা করেছি নিজেকে জয় করবার। সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করেছি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। বারবার অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছি আমার বয়সের দাবীকে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি তরুণ স্বামী বারবার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে অফিস যায় আর হাসি মুখে একটি অল্পবয়সী বউ দাঁড়িয়ে থাকে জানলায় তখন সে-দৃশ্য দেখতে দেখতে ওই বউটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে আমার ইচ্ছে করে।

শুধু মনে হয়, ওর আছে—আমার নেই। ওর আছে অফুরান খুশির আগুন-জ্বলা রাত আর একটি রক্ত-মাংসের মানুষের কঠিন আলিঙ্গন আর আমার জন্যে শুধু একটা ছায়া—একটা অশরীরী—নিজেকে উপবাসী রাখার তিক্ত এক বিলাস।

তাই আমার আর মন ভরে না এই পৃথিবীর আলোয় আর হাওয়ায়, রাতের অন্ধকার আর ভোরের শুভ্রতায়। আমি যেন একটা যন্ত্র।

বোধ হয় এই প্রথম আমি আমার দেহ মন দিয়ে অনুভব করলাম যে, আমার জীবনে তুমি আর নেই। আমি চাই না তোমার অর্থ—চাই না স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তা—আমি তোমাকে চাই—হ্যাঁ, একটি স্পষ্ট রক্ত-মাংসের মানুষকে।

কিন্তু ছি ছি, আমি বারবার নিজেকে ধিক্কার দি। তুমি আমাকে বাঁচাও। বল, আমি কেমন করে শান্ত করব আমার মন—কেমন করে থামাব আমার রক্তের উত্তেজনা—কেমন করে অস্বীকার করব ক্ষুধার আগুন-জ্বলা আমার এই জীবনকে।

কিন্তু আমাকে তা-ই করতে হবে। আমাকে মরতেই হবে না, আমার জীবনে তোমার সজীব আবির্ভাব ছাড়া আর আমার বাঁচবার কোন উপায় নেই। এমন অল্প অল্প করে তিক্ত যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে নিজেকে মেরে ফেলাই যেন অনেক—অনেক ভাল—অনেক—অনেক সুখের। আজ থেকে আমি মৃত্যুর জন্যেই প্রস্তুত হব।

কী কঠিন শীত বোবা আর অন্ধ করে তুলেছে এই রাতকে।

কোন উত্তাপ নেই কোথাও। এমনি রাতেই বোধ হয় মানুষ খুব সহজেই চলে যেতে পারে মৃত্যুর হিম-গুহায়। আমিও তোমার কাছে যাব।

তবু একবার চিৎকার করে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। তোমার জন্যে নয়—আমি বাঁচতে পারব না বলে—আমার আশেপাশের আর সব মানুষ বেঁচে আছে বলে। আমি অধীর হয়ে উঠি। এই ভারী শীতে শুধু আমার মাথায় দারুণ ক্ষুধার ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে আর আমি ঘুমোবার চেষ্টায় মড়ার মতো ঠাণ্ডা বিছানার এক দিকে পড়ে থাকি।

থেকে থেকে বড় রাস্তায় গাড়ির হর্ন বাজে আর ঝমঝম একটা আওয়াজ। কিন্তু কোন চমক নেই আমার মনে। আমার ঘুম কখন আসবে আমি জানি না—সারা রাত এমনি জেগে জেগে আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে কি-না তাও আমার জানা নেই।

এখন কত রাত? কে জানে। আমি শুধু জানি যে আমার মতো জাগার এমন কঠিন পীড়ায় কেউ মরে যাচ্ছে না। যারা জেগে আছে ইচ্ছে করে—আনন্দে বিভোর তারা। এই রাত শেষ হয়ে যাবে বলে তারা হয়তো থেকে থেকে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

তারা কারা? তোমার আমার মতো স্বামী-স্ত্রী। নতুন প্রেমের স্বাদ পাওয়া কোন মেয়ে। কোন তরুণ প্রেমিক। আর আজ হঠাৎ তাদের কথাও আমার মনে পড়ে যায়।

সেই সব মেয়ে যারা পয়সার বিনিময়ে পুরুষকে আনন্দ দেয়। তারা জেগে থাকে রাতের পর রাত। তারা আনন্দ দেয় আর হয় তো আনন্দ পায়। আমার এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আমি তাদেরও ঈর্ষা করি।

এরা ছাড়া এই কঠিন শীতের রাত্রে আর কেউ জেগে নেই। এখানে ওখানে আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করছে সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরা জীবজন্তুর দল। এখুনি আলো জ্বাললেই আমি দেখতে পাব ঘরের

মধ্যে জানলার দুপাশে ঝিমোচ্ছে দুটো চড়ুই। কেউ কাছাকাছি গেলে ওরা শুধু উসখুস করে। কিন্তু উড়ে পালায় না।

আমি রোজই ওদের দেখি। পাছে ওদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় বলে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দি। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে দেখি আলোর প্রথম স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন ফাঁক দিয়ে ওরা উড়ে গেছে।

কত কি ভাবতে ভাবতে এক সময় বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার বুকের ওপর পড়ে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর একটু হলেই চিৎকার করে উঠতাম কিন্তু সেই অন্ধকারেও ছোট্ট ঝণ্টুকে চিনতে আমার দেরি হল না।

কি হয়েছে? ঝণ্টু? এই কাঁদছ কেন? আমি উঠে বসে ওকে বুকে আঁকড়ে ধরলাম।

ভয় পেয়েছে সাত বছরের ঝণ্টু। ওর মা-বাবার কাছে থাকতে পারেনি। ওপরে দাদু ঠাকুমার কাছে একা-একা যেতে ওর সাহস হয় নি। কোন রকমে ছুটে এসেছে আমার কাছে।

ছোট্ট ঝণ্টুকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঝণ্টু কোন রকমে বলে, ও ঘরে আমার ভয় লাগে—

কেন?

বাবা কেমন করছে—মাকে মারছে।

আমি আগেই ভেবেছিলাম এমন একটা কিছু ঘটেছে। যদিও জয়া আমাকে কিছু বলে নি—কয়েকদিন থেকে আমি দাদার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। অফিসের পর আগেকার মতো এখন আর দাদা সোজা বাড়ি ফিরে আসে না। মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে আমি বুঝতে পারি যে দাদা ফিরে এসেছে। আর আন্দাজে বুঝে নি যে বৌদির সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

জোরে জোরে কথা বলে বৌদি। দাদাও চিৎকার করে। তখন বৌদি হঠাৎ এক সময় ঝম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি আর কারুর স্বর শুনতে পাই না।

ছুটির দিনেও দাদা আজকাল বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকে না। আমার সঙ্গেও বেশি কথা বলে না। এক সময় ওর নতুন বন্ধুরা বাইরে থেকে খুব আস্তে ডাকে, বিজন! আর তাড়াতাড়ি দাদা ওদের সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে এ বাড়ির সব আলো নিভে যাবার পর।

এখন বৌদির ওপরই সংসারের সব ভার। মা-বাবা আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন। কিছুদিন হল বাবার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। মা এখন সব সময় তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত। সংসারে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার কোন খবরই ওঁরা আর রাখেন না।

আর মনের দ্বন্দ্বে নিজেই জ্বলে যাচ্ছি বলে আমি কখনও ভাবি নি যে ভয় পেয়ে সাত বছরের ঝণ্টু আমাকে জড়িয়ে ধরবে আর আমি দাদা-বৌদির চিৎকার শুনতে পাব প্রায় মাঝ রাতে। কী করব হঠাৎ ঠিক করতে না পেরে ঝণ্টুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ঘুমতে চায় না ঝণ্টু। কী যেন বলতে চায়। কাকে যেন খোঁজে। আর থেকে থেকে ফোঁপায়। ওদিকে জোরে জোরে কথা বলছে দাদা আর বৌদি। দরজায় কয়েকবার দুমদুম করে শব্দ হল।

বুক কাঁপতে লাগল আমার। দাদা হয় তো খুব বেশি মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। এখন কী করবে বলা যায় না। আমিই বা কী করব এখন। মা-বাবাকে ডাকব কি না ঠিক করতে পারি না।

ওদিকে গোলমাল যত বাড়ে এদিকে ঝণ্টু ততই ভয় পায়—কুঁকড়ে যায় আমার বুকের মধ্যে আর অসহায়ের মতো কাঁদে।

অন্তত তার জন্যেই আমাকে শক্ত হতে হবে। কিন্তু কী কথা বলব আমি তাকে। বারবার আমি নিজেই তো চমকে উঠছি। হয় তো পাড়া সুদ্ধ লোক জেগে উঠবে এখন। তারপর কী হবে?

ঝণ্টুকে জোর করে খাটে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমি বলি, লক্ষ্মী ছেলে—ঘুমোও!

কাঁদতে কাঁদতে ঝণ্টু বলে, পিসি, মা কেন ওকে বকল?

কাকে?

তুমি দেখ নি?

না তো।

বাবার সঙ্গে একজন পরী এসেছিল, ঝণ্টু লাফিয়ে উঠে বসে খাটের ওপর। হঠাৎ যেন ওর সব ভয় ভেঙে যায়, সত্যি তুমি দেখ নি পিসি?

ঘুমের ঘোরে ঝণ্টু ভুল বকছে মনে করে আমি তাকে আদর করে বলি, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন? তাহলে আমিও পরীকে দেখতাম—

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় ঝণ্টু। তারপর থেমে থেমে বলে, কিন্তু পরী আর আমাদের বাড়িতে আসবে না—

কেন?

মা ওকে বকেছে—তাড়িয়ে দিয়েছে, ঝণ্টু আপন মনেই বলে যায়, কী সুন্দর দেখতে পরী—জান পিসি? কী সুন্দর চোখ!

হঠাৎ আমার মনে হয় যে ঝণ্টু ভুল বকছে না। কিন্তু ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই দাদার ঘরের দরজাটা দম করে খুলে যায় আর ক্ষিপ্র গতিতে জয়া বেরিয়ে আসে বাইরে।

ও ঘরের আলোর রেখা এসে পড়েছে জয়ার মুখের ওপর। দূর থেকে আমি তার চেহারা দেখে চমকে উঠি। রুক্ষ কঠিন মুখ। চুল এলোমেলো। এই মুহূর্তে বিকারের ঘোরে একটা সাংঘাতিক

কিছু করতে যেন ও একটুও ইতস্তত করবে না। মশারী ঠেলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বৌদির সঙ্গে সঙ্গে দাদাও বেরিয়ে আসে বাইরে। ক্ষিপ্ত বন্য চেহারা। চোখ দুটো লাল। আমার সেই স্নেহময় দাদাকে দেখে হঠাৎ আমি ভয় পাই। আমার সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

কী ভেবেছ তুমি? সব লজ্জা ভুলে জয়া বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে, তুমি ভেবেছ আমি চুপ করে বসে নোলক পরা সতী সাধ্বী স্ত্রীর মতো সব সহ্য করব?

দাদার গলার স্বরও তখন স্বাভাবিক মনে হয় না, কী করবে?

বেরিয়ে যাব তোমার এখান থেকে। নালিশ করব। তোমার মতো শয়তানকে কেমন করে সোজা করতে হয় তা আমি খুব ভাল করেই জানি—

চুপ! ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার! রাত দুপুরে হৈচৈ না করে বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।

তুমি হুকুম দিলে আর রাত দুপুরে আমি নাকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলাম—এমন বোকা মেয়ে পেয়েছ নাকি আমাকে?

তোমাকে আমি—অদ্ভুত হিংস্র ভঙ্গি করে দাদা এগিয়ে আসে বৌদির দিকে আর আমি ঠিক তখন দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াই।

দাদা!

সরে যা আমার সামনে থেকে দীপু—আজ আমি সব শেষ করে দেব—

জয়া গলার স্বর আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে, লজ্জা করে না তোমার অমন করে শাসাতে? তোমার মেজাজ তুমি সেই বাজারের মেয়েমানুষটার কাছে দেখিও—

হো হো করে হেসে উঠে দাদা বলে, তোমার সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই—

তুমি চুপ করবে না আমি চিৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো

করে বলব যে যাকে রাত দুপুরে বাজারের মেয়েমানুষ মাতাল অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় তার গলাবাজি শুনতে ?

দাদা টলে পড়ে যেতে যেতে দেয়ালে ভর দিয়ে কোন রকমে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে ঘরের মধ্যে একা ভয় পেয়ে ঝন্টু কেঁদে ওঠে। আমি দাদাকে তার ঘরে ঠেলে দিয়ে আলো নিভিয়ে দি। আর ফিরে এসে জয়াকে নিয়ে আসি আমার ঘরে। উত্তেজনায় শরীরটা যেন আমার অনেক ভারী হয়ে গেছে।

জয়াকে জোর করে আমি আমার খাটে শুইয়ে দি। মাকে পেয়ে ঝন্টু আঁকড়ে ধরে। কিন্তু একটা কথাও বলে না জয়া। হাসে না। কাঁদেও না। ক্লান্ত হয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাকে আমার খাটে।

এখন কোন প্রশ্ন করে আমি জয়াকে আঘাত দিতে চাই না। কিন্তু আমি জানি, আজ রাতে ঘুমতে পারবে না ও। আর আমার চোখেও ঘুম আসবে না।

এ বাড়িতে আমারই চোখের সামনে একটু আগে যা ঘটে গেল তা এখনও আমার অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা হিমের কনকনে হাওয়ায় আমার শরীরটা যেন এক তাল বরফের মতো হয়ে গেছে। পাশ ফিরে জয়ার দিকে তাকাতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। কাল সকালে দিনের আলোয় ওর সামনে কেমন করে মুখ দেখাব আমি।

জয়া নিজেই তো আমাকে একদিন বলেছিল যে সংসারে অভাব ছিল বলে ওর মা বাবার জীবন সুখের ছিল না। কিন্তু জয়ার সংসারে তো কোন অভাব নেই। তাহলে কেন ওদের চিৎকারে গভীর রাত্রে সারা বাড়ি চমকে ওঠে ?

মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে উত্তর খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ আমি এক সময় বুঝতে পারি যে আমার নিজের যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। এদের ভাবনা ভাবতে ভাবতে সেই দেহমন জ্বালানো আগুনের তেজ

আমার মনের মধ্যে প্রায় নিভে এসেছে। আমি যেন সহজ হয়ে জীবনের আর এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখছি। কিন্তু কে দেখতে চায়!

যে রূপ তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে জীবনের আর সংসারের, সে-রূপের থরোথরো আভা আজও আমার মন থেকে মুছে যায় না বলেই তো যন্ত্রণায় আমি জ্বলে মরি।

যদি এমন হত তোমার-আমার সংসার—যদি মাঝ রাতে তুমি বাড়ি ফিরতে অন্য আর এক মেয়ের সঙ্গে আর আমাকে বের করে দিতে চাইতে বাড়ি থেকে তাহলে আজ হয় তো খুব সহজেই আমি এই পৃথিবীর খুশির জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারতাম। আর তাহলে সারাদিন রাতের এই দ্বন্দ্ব আমার মনে কাঁটা ফোটাতনা। আমি খুশি হতাম। মা-বাবা তো খুশি হতেনই আর জীবনের এই কঠোর পরিবর্তনের কথা হয়তো আমি বুঝতেই পারতাম না। কিন্তু এসব ভাবনা কেন আমি ভেবে মরি!

জয়া চুপ করে আমার পাশে শুয়ে থাকলেও আমি জানি, অনেক অনেক কথা ফুলে ফুলে উঠছে ওর মনে। এক-একবার শুকনো চোখে ও দেখছে ঝণ্টুকে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

হয় তো আমারই প্রথমে ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। যদি ও কাঁদে কিম্বা বকে যায় অনেকক্ষণ ওর যা খুশি—প্রকাশ করে দাদার ওপর ওর জমা করা আক্রোশ আর অভিযোগ তাহলে ভোর রাত্রে একটা হালকা সান্ত্বনার স্পর্শে হয়তো ওর চোখ দুটো বুজে আসতেও পারে।

কিন্তু এখন ওর সঙ্গে কী কথা বলব আমি ঠিক করতে পারি না। আর একটু আগে যে কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের বাড়িতে তা মনে করে এখন নিজের চুপ করে থাকাই যেন ভাল বলে মনে হয়। বিশ্রাম করুক জয়া। নিজেকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্তির শেষ রেখাটা একেবারে মুছে ফেলবার চেষ্টা করুক মন থেকে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাদার ওপর আমার রাগ হয়। কেমন করে সে এতবড় নির্লজ্জ হতে পারল! আমি, মা-বাবা, আশে পাশের আর পাঁচজন—এদের সকলের কথা ভেবে এমন একটা অতি নাটকীয় কাণ্ড বাড়িতে করবার কী দরকার ছিল। আমার একটা হাত হঠাৎ এক সময় জয়ার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে।

একজন কারুর কাছ থেকে হয়তো মনে মনে সমর্থন চাইছিল জয়া। একটা মানুষ খুঁজছিল যার কাছে সে ভেঙে পড়তে পারে—এই অপমানের প্রতিবাদে ক্লান্তির বোঝাটা চোখের জল ফেলে-ফেলে হালকা করতে পারে। কিন্তু এতক্ষণ হয়তো অভিমানের ঝাঁজে সে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল।

ঠাণ্ডা দুটো কাঁপা কাঁপা হাত আমাকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে। আর তীব্র গোঙানির অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই। কী করব আমি এখন। কেমন করে জয়ার এ বুক-ভাঙা কান্না থামাব!

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলি, বৌদি—বৌদি—

কী ভেবেছে ও আমাকে—কী ভেবেছে? জানো আমি কিছুই ভয় করি না? এই রাত্তিরে সব ঠেলে ফেলে একা একা চলে যেতে পারি।"

আস্তে কথা বল লক্ষ্মীটি। তোমার প্রত্যেকটি কথা বোধ হয় পাশের বাড়ির লোক শুনতে পাচ্ছে—

শুনুক। তারা যে চোখ কান বন্ধ করে থাকে না সেকথা আমি জানি। এখন আমার কোন লজ্জা নেই—

শোন—শোন—জয়ার দুটো হাত ধরে আমি বোঝাই, দাদা নিজেই লজ্জা পাবে—তোমার কাছে কাল ঠিক ক্ষমা চাইবে—

জয়ার কান্না প্রায় থেমে আসে। এই অন্ধকারেও আমি বুঝতে পারি ওর চোখ দুটো যেন আগুনের আঁচে কাঁপতে থাকে, ও কি করবে না করবে তা ভাববার কোন দরকার নেই আমার। সব

জিনিসেরই একটা সীমা থাকা উচিত, আবার বলে ওঠে জয়া, কী করেছি আমি? ওর ভাল চেয়েছি, সংসারের মঙ্গল চেয়েছি, ঝণ্টুর কথা ভেবে ওর খরচের রাশ টেনে ধরে টাকা জমাবার চেষ্টা করেছি—

আস্তে বলি, ঠিকই তো করেছ তুমি।

আমার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে জয়া, কিন্তু কে বুঝবে সেকথা? আমি স্বার্থপর। আমি টাকা ছাড়া কিছু চিনি না। আমার সঙ্গে একটা বাজারের মেয়ের নাকি কোনই তফাৎ নেই—সেকথা ভাল করে বোঝাবার জন্যেই তো আজ একটা মেয়েকে নিয়ে এসে দেখাল—

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকি আমি। মাকে পাশে পেয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে ছোট্ট ঝণ্টু। রাতও বোধহয় শেষ হয়ে এল। তবুও ভারী শীতের দাপটে আমার ঘরের কাছাকাছি আলো এসে পৌছতে অনেক দেরি আছে।

ঘুম আমার চোখে নেই। কিন্তু ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণা ভারী করে তুলেছে চোখ দুটোকে। আশ্চর্য, এ যন্ত্রণা কত হালকা! এই গোলমালে আমি বোধহয় আজ প্রথম ভুলে গিয়েছি আমার শূন্যতা—ভুলেছি আমার ক্ষুধা। তাই আবার কথা বলবার আগ্রহ জাগে আমার।

জয়ার কপালে একটা হাত রেখে বলি, নেশার ঘোরে দাদা তোমাকে অনেক আজে বাজে কথা বলেছে—ওসব কথা শুনে কেন তুমি শুধু শুধু দুঃখ পাও!

নেশার ঘোরে নয়, রোজই দুবেলা ওসব কথা ও আমাকে শোনায় আজকাল। কী অপমান সহ্য করে আমি এ বাড়িতে দিন কাটাই, তোমরা তার কতটুকু খবর রাখ?

বৌদি, এবার ঘুমোও। ঝণ্টু চমকে জেগে উঠবে—ভাল করে ঘুমতে না পারলে ও বেচারির অসুখ করবে কিন্তু—

করুক। আমি কী করব। আমি কিছু জানি না।

আমি থেমে যাই। আপন মনে যা খুশি বলে যাক জয়া। অপমানের যন্ত্রণা ভোলবার চেষ্টা করুক যত খুশি কথা বলে। আমি চুপ করে থাকলে এক সময় নিজেই ও থেমে যাবে।

দূরে বড় রাস্তার ওপর প্রথম ট্র্যামের ঘণ্টা বাজে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো দমকা একটা শব্দ। পাশ ফিরে আমি চোখ বুজে থাকি।

কিন্তু কথা বলে যায় জয়া। নিজের অসহায় অবস্থার কথা তুলে কাঁদে। ওর মাকে ডাকে ছোট মেয়ের মতো। বাবার কথা বলে। আর ওঁরা মেয়ের জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারেন নি বলে ভোর রাত্রে ধিক্কার দেয় নিজের ভাগ্যকে। আর হঠাৎ আমাকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্ত একটা অবলম্বনের মতো।

বল—বল—বল দীপু, কী দোষ আমার?

ভেবেছিলাম কথা বলব না, কিন্তু ওর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে আমাকে আবার বলতে হয়, কোন দোষ নেই।

শান্ত স্বরে ও আমাকে এবার জিজ্ঞেস করে, দরকার হলে সকলের সামনে আমার হয়ে একথা বলতে পারবে?

নিশ্চয়ই।

আমার কথা শুনে বোধহয় মনে মনে একটা আশ্বাস পায় জয়া। আর একটা কথাও বলে না। শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। আর আমাকে ছেড়ে ঝণ্টুকে কাছে টেনে নেয়।

বাইরে অল্প অল্প আলো ফুটে ওঠে। যদিও ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ তবুও আমি বুঝতে পারি রাস্তার ওপর তোলা উনুনটা এনে আঁচ দিয়েছে আমাদের বাড়ির পাশের দোকানের মুদী। পেতলের ছোট সাজি হাতে আস্তে আস্তে গেটওলা বাড়ির বাগানে ফুল তুলতে বেরিয়েছে সেই বুড়ি। আর জুতো খটখট করে বেড়াতে চলেছে আমার চেনা-অচেনা এ পাড়ার অনেক বয়স্ক মানুষ।

কিন্তু আমাদের দুজনের কারুরই এখন বিছানা ছেড়ে ওঠবার একটুও ইচ্ছে নেই। কখন উঠতে পারব তাও জানি না।

মাঝ রাতে বাড়ির মধ্যে একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করা দাদার পক্ষে একেবারে আকস্মিক নয়, ভেতরে ভেতরে অনেকদিন আগে থেকেই নাকি প্রস্তুতি চলছিল—সেকথা বৌদির কথায় আর দাদার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি।

প্রথমে ভেবেছিলাম, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দাদা অনুতাপে মাথা তুলতে পারবে না, এ বাড়ির কারুর দিকে তাকাতে পারবে না লজ্জায়—কিন্তু না, ওর চলা ফেরায় কোন জড়তা কিম্বা সঙ্কোচ নেই। ওর মেজাজ হয়েছে রুক্ষ। একটু এদিক ওদিক হলে ঝণ্টুকেও তাড়া দেয়। আর এতদিন ভেতরে ভেতরে যাই হোক, বাইরে কিছু প্রকাশ করেনি বৌদি—কাউকে কিছু জানতে দেয় নি; কিন্তু এবারে যেন ওর সব লজ্জা ভেঙে গেছে। আর কিছুকেই ভয় নেই। তাই জয়াও এখন দাদার অবহেলা চুপ করে সহ্য করে না। এমন কি, মার সামনেও দাদাকে কথা শোনাতে ইতস্তত করে না।

চারপাশে একটা অশান্তির ছায়া আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে আমি তারই স্পষ্ট আভাস পাই। আর আশঙ্কা করি যেকোন মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর লকলকে আগুন এই সংসারে জ্বলে উঠতে পারে। জ্বলুক না জ্বলুক এমন অবস্থায় থাকতে হয়তো কারুরই ভাল লাগে না। আর আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে ঝণ্টুর চেহারা দেখলে। যে যার মানঅপমান নিয়ে ব্যস্ত—ওকে দেখবে কে।

আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে দাদাকে ধমক দি—বৌদিকে বোঝাই আর ঝণ্টুকে কাছে কাছে রেখে ও বেচারির সব দুঃখ ভুলিয়ে দি।

কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে দাদার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে আমার সঙ্কোচ হয়। আর বৌদিকে তো বলেছি তার কোন দোষ নেই—কাজেই কী বোঝাব তাকে। তাই আমার কথা হয়

শুধু ঝণ্টুর সঙ্গে। আর মনে হয় যেন ও আমার কাছেই সব চেয়ে শান্তিতে থাকে।

ঝণ্টু, আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলি, একদিন আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে ?

খুশিতে ঝক ঝক করে ওঠে ঝণ্টুর মুখ, যাব পিসি। কবে যাব ? আমাকে একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে ?

হ্যাঁ।

শুধু তুমি আর আমি যাব কিন্তু। আর কেউ না। মা না। বাবা না। কেউ না।

আমি হেসে ওকে আদর করে বলি, মা-বাবা কেন যাবে না ঝণ্টু ?

তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে ঝণ্টু ভয়ে ভয়ে বলে, জান না ওরা খালি ঝগড়া করে ? কাল মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—

আমার চেহারাটা হঠাৎ যেন বদলে যায়। আমি বুঝতে পারি না কী কথা বলে সাত বছরের ঝণ্টুর ভয় ভাঙব ! আমিও তাকাই একবার এদিক-ওদিক। না, কেউ কোথাও নেই। তখন আমি ঝণ্টুকে আদরে-আদরে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। ও সব ভুলে শুধু আমারই বুক জুড়ে শুয়ে থাকুক।

আমি চিড়িয়াখানায় তোমাকে শিগগিরই একদিন নিয়ে যাব ঝণ্টু

হাতীতে চড়াবে ?

হ্যাঁ।

আর ঘোড়ায় ?

হ্যাঁ।

ঠিক ?

আমার কথা ও কেন বিশ্বাস করে না বুঝতে পারি না। ওকে

আমি বুকের মধ্যে প্রায় পিষে ফেলে বলি, ঠিক ঠিক ঠিক। শুধু তুমি আর আমি যাব—আর কেউ না।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঝণ্টু বলে, আমি রোজ রোজ তোমার কাছে ঘুমব পিসি—কিন্তু হঠাৎ ওর কথা থেমে যায়। ও ভয় পায়। আর আমি তাকিয়ে দেখি দাদা এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।

এই ঝণ্টু যা তো এখান থেকে, দাদা আমার কাছে সরে এসে এক মিনিট চুপ করে থেকে বলে, দীপু, আমাকে এক্ষুণি কিছু টাকা দিতে পারিস?

প্রথমটায় অবাক হই দাদার কথা শুনে। কিন্তু আমার এই বিস্ময়ের কথা ওর কাছে গোপন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ। কত?

এই শ দুয়েক। তোর কাছে এখন আছে তো?

আমি আলমারি খুলতে খুলতে হাসি মুখে আবার বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ।

দাদা অসহায় দৃষ্টিতে দেখে আমার নোট গোনা। আর বোধ হয় একটা কৈফিয়ৎ দেবার দরকার মনে করে। কাঁপা-কাঁপা হাতে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে নিতে বলে, ও এক পয়সাও দেয় না আমাকে জানিস?

কে?

জয়া। আমার সন্দেহ হয়, ওর সব দুঃস্থ আত্মীয়দের ও মাসে-মাসে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা পাঠায়—

আমি হেসে বলি, দূর।

গলার স্বরে বেশ জোর দিয়ে দাদা বলে, তাহলে টাকাগুলো যায় কোথায়? আর টাকার ওপর ওর এত লোভই বা কেন?

জয়ার পক্ষ নিয়ে আমি বলি, সকলের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বৌদি একটু বেশি সাবধান হয়ে চলে. একটু থেমে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি. সেটা তো ভাল কথা দাদা।

তা বলে টাকার চেয়ে বড় আর কিছুই হবে না ? কেন, ভবিষ্যতের ভাবনা আমি ভাবি না ?

মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে হয় তো অনেক বেশি ভাবে দাদা।

ছাই ভাবে। প্রেমাংশুর চেয়ে কোন মেয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা বেশি ভাবে বল ?

হঠাৎ দাদার মুখে তোমার নামের উচ্চারণ শুনে একটা অদ্ভুত শিহর খেলে যায় আমার শরীরে। আমি আর দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। মুখ নামিয়েই আমার বলতে ইচ্ছে করে, প্রেমাংশুর মতো মানুষ হয়তো একটিই ছিল পৃথিবীতে। আর কেউ নেই। তোমরা কেউই তার মতো নও—কোনদিনও তার মতো হতে পারবে না।

কিন্তু এ অহঙ্কার আমার একার। এত বড় জ্বলন্ত অহঙ্কারের কথা আমি দাদার সামনে প্রকাশ করব কেমন করে। তার চেয়ে আমার চুপ করে থাকাই ভাল। আমি আপন মনেই এদের সকলের সঙ্গে তোমার তুলনা করি আর তোমাকে আরও দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখি মনে মনে।

এখনও দাদা ঘর থেকে চলে যায় না। টাকা পকেটে ভরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আমার আরও কাছে সরে' এসে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, দীপু, আমি মাইনে পেয়েই তোকে টাকাটা দিয়ে দেব। কিন্তু—কথা শেষ না করেই দাদা থেমে যায়।

কি দাদা ?

তুই একথাটা আর কাউকে বলিস না।

দাদাকে অশ্বাস দিয়ে আমি বেশ জোরেই বলে উঠি, না বলব না। আর আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা চলে যায় ঘর থেকে। বোধ হয় বাড়ি থেকেও বেরিয়ে যাবে এখুনি। ফিরবে অনেক রাত করে।

রাত এগারটা-সাড়ে এগারোটায় ঝরর্ ঝরর্ করে একটা ট্যাক্সি

এসে দাঁড়াবে বাইরে। পাড়া একেবারে চুপচাপ তাই দাদার জড়ানো স্বর স্পষ্ট শোনা যাবে। জোরে জোরে কড়া নাড়বে দাদা। বিরক্ত হয়ে বুড়ি ঝি ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেবে। তাকে একটা কড়া গালাগাল দিয়ে দাদা টলতে টলতে ওপরে উঠে আসবে। তারপরই বৌদির তীক্ষ্ণ গলার স্বর। কিন্তু ওদের ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবে। আন্দাজে পরের দৃশ্যগুলো কল্পনা করা গেলেও ওদের দুজনের অস্পষ্ট উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই কানে আসবে না।

আজকাল রোজই এমন হয়।

হোক। আমি ভাল আছি। অনেক—অনেক ভাল। আমি বেঁচে গেছি। আমার কথা যেন ভুলেছে এ বাড়ির সব লোক। ভুলেছে আমার শোকের কথা—আমাকে কৃপা করার কথা। মাঝপথে দাদা একটা নতুন অধ্যায় যোগ করে দিয়েছে বলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। আমি মনে মনে হয় তো এমন পিছিয়ে পড়তেই চেয়েছিলাম সকলের কাছ থেকে। দাদা বেঁচে থাকুক।

বাইরে কেঁপে কেঁপে শীতের ছোট্ট বিকেল শেষ হয়ে আসে। আমার অন্ধকার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় স্থির ধোঁয়ার মতো ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশায় রাস্তায় হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলো বিবর্ণ নিস্তেজ হয়ে থাকে ঠিক আমারই মতো।

তীব্র এক ক্লান্তির ভারে উঠে গিয়ে আলো জ্বালাতে ইচ্ছে হয় না আমার। প্রসাধনের রুচিও নেই। আগে যখন অন্ধকারের প্রথম ঝোঁকে মনে মনে তোমাকে নিয়ে গড়ে তুলতাম আমার জগৎ তখন হঠাৎ এক সময় মা এসে দাঁড়াতেন ঘরে। টক করে সুইচ টিপে আলো জ্বালতেন আর আমাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিতেন আয়নার সামনে। কিন্তু এখন—মানে, দাদা নতুন অধ্যায় শুরু করে দেবার পর মা দাদা আর বৌদির সমস্যার সমাধান করতেই বেশি ব্যস্ত, আমার ঘরে আসেন কম আর তাই ইচ্ছে মতো অনেকক্ষণ ধরে ভারি শীতের প্রথম অন্ধকারে তোমাকে অনুভব করে আশ্চর্য যন্ত্রণা আর

তৃপ্তি পাই। হ্যাঁ, এখনও—এখনও পাই। কিন্তু বুঝতে পারি না আর আমার কতদিন কাটবে এই পাওয়া-না-পাওয়ার যন্ত্রণায় টুকরো-টুকরো হয়ে।

ঘরের আলো জ্বলে না। কিন্তু আস্তে আস্তে চটির খসখস শব্দ করে একটা মূর্তি এগিয়ে আসে আমার কাছে। মা নয়। জয়া। আমি উঠে গিয়ে নিজেই এবার আলো জ্বেলে দি।

আলো না জ্বাললেও পারতে, ঠাণ্ডা কঠিন স্বরে জয়া থেমে থেমে বলে।

আমি হাসি, অনেকক্ষণ ধরেই জ্বালব-জ্বালব ভাবছিলাম কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না—

আমার কথা শেষ হবার আগেই কোন ভূমিকা না করে জয়া সোজা প্রশ্ন করে, সব জেনে শুনে কেন তুমি ওকে টাকা দিলে ?

আমার বুকে কঠিন একটা ধাক্কা লাগে জয়ার কথা শুনে। আলোটা না জ্বাললেই বোধ হয় ভাল হত। অন্ধকারে ও দেখত না আমার করুণ চেহারা। দাদা কি ওকে বলেছে ? তাহলে কেন আমাকে বলে গেল কাউকে না বলতে। দাদার কথা শুনে এই ভেবে আমি খুশি হয়েছিলাম যে সব লজ্জা ও এখনও একেবারে বিসর্জন দিতে পারে নি। তাই পুরোপুরি তলিয়ে যেতে ওর আরও অনেক দেরি আছে। কিন্তু তাহলে ওর কি দরকার ছিল আমাকে বারণ করে জয়াকে বলে যাবার। এখন কী উত্তর দেব আমি জয়ার স্পষ্ট প্রশ্নের।

বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরে জয়া আবার বলে, না, ও আমাকে কিছু বলে নি। ও তেমন লোকই নয়, চুপ করে কিছুক্ষণ শূন্য চোখে জয়া দেখে আমাকে, কিন্তু ওকে চোরের মতো তোমার ঘর থেকে বার হতে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কেন তোমার কাছে এসেছিল।

জয়া থামে। কিন্তু আমার যেন ওকে বলবার কোন কথা নেই

এখন। হ্যাঁ, সব জেনে শুনেই আমি দাদাকে টাকা দিয়েছি। আমি জানি ও টাকা দিয়ে দাদা কী করবে। তবু কেন দিলাম সে কথাটা আমি কেমন করে বোঝাব জয়াকে! দাদার কোন কাজের সমালোচনা করা আমার পক্ষে কঠিন আর তাকে রূঢ়স্বরে ফিরিয়ে দেওয়া হঠাৎ সম্ভব নয়। কিন্তু এখন হয় তো আমার সব অবস্থা না বুঝে জয়া মনে করবে যে আমি ইচ্ছে করেই দাদার অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছি।

জয়ার স্বরে অভিমানের রেশ কাঁপে, আমি জানতাম—আর একটু জোর দিয়ে সে বলে, আমি জানতাম শেষ অবধি তোমরা সকলেই আমাকে দোষ দেবে—

না বৌদি, বিচলিত স্বর বার হয় আমার গলা ঠেলে, আমি কখনও তোমাকে দোষ দেব না—কিন্তু তুমি তো বুঝতে পার যে দাদা টাকা চাইলে তা না দেয়া আমার পক্ষে কত শক্ত—

আর তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পার যে এমন হলে এ বাড়িতে নিজের মান বাঁচিয়ে আমার পক্ষে থাকা কত শক্ত?

আমি সব বুঝতে পারি বৌদি। কিন্তু তুমি শুধু শুধু আমাকে ভুল বুঝ না। আমার জন্যে তোমাদের দুজনের মধ্যে কোন গোলমাল হয় আমি তা কিছুতেই চাই না—

আক্রোশের প্রবল ঝাঁজে অন্ধ হয়ে জয়া ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে, না, তুমি আর কী করবে! যার যা খুশি করুক, কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে, আমিও মনে মনে তৈরি হয়ে নিয়েছি—এবার আমার একটা কিছু করবার পালা।

একটা অশুভ আশঙ্কায় শিউরে উঠে আমি জিজ্ঞেস করি, কী করবে তুমি?

হিংস্র হাসির ঝিলিক কাঁপে জয়ার ঠোঁটের ফাঁকে, না, আত্মহত্যা নয়। অমানুষ স্বামীর অবহেলা পেয়ে নিজেকে ধ্বংস করার মতো বোকা মেয়ে আমি নই। আমি শুধু নিজের মান বাঁচাবারই চেষ্টা করব—

জয়া কি করবে না করবে তা শোনবার আর কোন কৌতূহল আমার নেই। ও যে মরবার কল্পনা করেনি সেটুকুই ঢের। এখন অন্য কথা তুলে ওর মন একটু হালকা করতে পারলে আমি বোধ হয় নিজেও এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারি।

ভেবে-ভেবে আস্তে আস্তে জয়ার পাশে সরে এসে বলি, এত অল্পে অধীর হলে চলে না বৌদি—

অল্পে অধীর হওয়া আমার স্বভাব নয়। এত বড় অপমানকে তুমি অল্প বল কেমন করে আমি বুঝতে পারি না দীপু।

না, আমি ওর কথা শেষ না হতেই বলে উঠি, অল্প নয়—কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবে—

কী ঠিক হবে ?

দাদা বুঝতে পারবে যে সে কত বড় অন্যায় করেছে তোমার ওপর। তাই আগে থেকে নানা কথা ভেবে কেন মনে মনে অশান্তি পাও !

কিছুই ঠিক হবে না, জয়ার শুকনো চোখ যেন আরও কঠোর হয়ে ওঠে, তোমার দাদাকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না।

আমি হাসবার চেষ্টা করি, তা চেনবার কথাও নয়। কিন্তু অনেকের মাঝে মাঝে এমন একটা অবস্থা হয় যে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারে না। তুমি যদি সময় নিয়ে দাদাকে ঠাণ্ডা মাথায় তা বোঝবার সুযোগ দাও—

তুমি তোমার দাদার পক্ষেই দাঁড়াবে তা আমি জানতাম—

আমি কারুর পক্ষেই দাঁড়াচ্ছি না বৌদি, আমার চোখের সামনে একটা সাজানো সংসার ভেঙে যাচ্ছে বলে—

আমি কি ভাঙছি ?

না। কে ভাঙছে আমি তাও জানিনা। তবে তুমি ভেবনা যে দাদাও খুব শান্তিতে আছে—

আমি কারুর খবর জানতে চাই না।

ম্লান হেসে বলি, তবু তো খবর রাখতে হচ্ছে বৌদি। আমি দেখছি। মা-বাবা দেখছে। আর ঝন্টুও দেখছে—

কিন্তু তোমার দাদা কি কারুর কথা ভাবছে?

ভাবতে দাদাকে হবেই। তুমি শুধু ওকে এই ভাববার সময়টুকু দাও। ও যা খুশি করুক, তুমি চুপ করে থাক। ওর ক্লান্তি একদিন আসবেই।

বিদ্রূপের হাসি হেসে জয়া বলে, আমি এত বোকা নই দীপু যে স্বামী লাথি ঝাঁটা মারবে আর দিনের পর দিন ও কবে সুবোধ বালক হবে সেই আশায় বসে থাকব।

বোধ হয় আমার স্বরে একটা অকৃত্রিম আকুতি মিশিয়ে বলি, আমি জানি তুমি বোকা নও, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এ ভাঙন বন্ধ করা যায় না বৌদি। আমি জানি তোমার ধৈর্যের বোকামি নিয়ে আগলে দাঁড়ালে দাদাকে থামতে হবেই।

তবুও জয়া দৃঢ়স্বরে বলে, যার কাছে আমার কোন মূল্য নেই—প্রয়োজন নেই তার কাছে ছোট হয়ে—বোঝা হয়ে আমি থাকতে পারব না—পারব না।

না, আমিও আর পারব না জয়াকে বোঝাতে। ভেঙে যাবে—চুরমার হয়ে যাবে ওদের সংসার। তবু কোন পক্ষই বোকা হবে না—ঠকতে চাইবে না—বুদ্ধি দিয়ে আদায় করতে চাইবে ঠুনকো সম্মান।

চোখের সামনে দাদা-বৌদির সম্পর্ক ভাঙতে দেখলে আমার বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাবা বিমূঢ় হবেন। মা আহত হবেন। শীর্ণ করুণ হয়ে উঠবে ঝন্টুর মুখ। কেউ খুশি হবে না। দাদা না। জয়াও না। তবু ভাঙবে ওরা দুজনেই।

আমার নিজের মনের অবস্থার কথা জয়াকে বলবার অদম্য আগ্রহে অস্থির হয়ে উঠলেও সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলবার ধরন এক ভয়ঙ্কর রক্তহিম করা ভয়ে আমি যেন হারিয়ে ফেলেছি।

শুধু তুমি শোন। তোমাকে শুনতে হবেই। তুমি ছাড়া আমার

এলোমেলো ভয় আর প্রলাপের ঝড় আমি কার কাছে তুলে ধরব। ওরা ভাঙতে চায়। ওরা চালাক তাই ভেঙে ভেঙে কাটা ছেঁড়া জীবনে বাঁচিয়ে রাখতে চায় আত্মসম্মান।

কিন্তু এই ভাঙার যন্ত্রণা আমি যেমন করে বুঝছি তেমন করে যেদিন জয়া বুঝবে—দাদা বুঝবে সেদিন কী হবে? ওরা দুজনেই থাকবে এই পৃথিবীতে তবু পরস্পরের কাছে থেকেও থাকবে না।

আমাদের সংসার তুমি ভাঙনি। আমি ভাঙিনি। তবুও আমার দেহ মন চিরে চিরে গেল একাকীত্বের যন্ত্রণায়—ভাঙনের বেদনায়। হয় তো এসব কথা মনের ঝাঁজে বোঝবার ক্ষমতা নেই বলেই জয়া সংসার ভেঙে বেরিয়ে যেতে চায়।

বৌদি!

কি বলছ দীপু?

আমার সব কিছু ভেঙেছে বলেই তোমাকে এত কথা বলি—তুমি জাননা কী যন্ত্রণা—কী ক্লান্তি!

তুমিও জাননা দীপু—তোমাকে কোনদিন জানতেও হয়নি, সংসারে থেকে একাকীত্বের অপমান বয়ে বেড়ানো কত কঠিন—উঠে দাঁড়ায় জয়া। একবার বাইরে তাকায়। প্রসাধনের কোন প্রলেপ লাগে নি ওর মুখে। চুলও ঠিক নেই। অপমানে ক্ষত-বিক্ষত একটা শরীর। প্রাণ আছে কি-না হঠাৎ বোঝা যায় না।

আমি দেখতে থাকি ওকে। আর দেখতে দেখতে ভাবি হয় তো আমার চেয়ে ওর যন্ত্রণা অনেক বেশি। একাকীত্বের যন্ত্রণা আর ঈর্ষার যন্ত্রণা আর ভাঙার আগে-আগে প্রস্তুতির আর এক যন্ত্রণা। এক দেহ আর এক মন দিয়ে ও এতদিক একা-একা সামলাবে কেমন করে!

বোধহয় আমারই মতো নিজেকে নির্জনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মনে জোর পাবার জন্যে ম্লান একটা ছায়ার মতো জয়া সরে যায় আমার ঘর থেকে।

ঘুম আসবে না। এই ভারী শীতের সব উত্তাপ-জুড়োনো রাতেও আমার মনে ধারালো পাথরের মতো থেকে থেকে খোঁচা মারবে চাপা একটা আশঙ্কা। দাদা বাড়ি ফিরে না এলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

প্রথম প্রথম ভাল লেগেছিল। একা-একা জ্বলে মরার চেয়ে অনেক ভাল লেগেছিল সংসারে অশান্তির ঝাঁজ—ভাল লেগেছিল দাদা আর বৌদির অসন্তোষ দিয়ে নিজেকে ভরে তুলতে। সংযত করতে পেরেছিলাম দুর্বার প্রবৃত্তিকে। কিন্তু দিনে দিনে দেখছি আমি অনেক বেশি একা—অনেক বেশি অসহায়। আর এখন তুমিও আমার বিছানার ধারে এসে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াও না লঘু সহজ পা ফেলে।

কখনও কখনও তোমাকে ভুলতে চেয়েছিলাম নিজে বাঁচবার জন্যে। এই পৃথিবীর আলো আর আকাশের সঙ্গে আর পাঁচজন মানুষের মতো একটা সহজ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলাম!

কিন্তু কোন প্রয়োজন নেই আমার সহজ হয়ে ওঠার। আমার জীবন জটিল হোক—কাঁটায়-কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হোক কিন্তু সার্থক হোক তোমার সঙ্গে আমার প্রত্যহের মিলন। তোমাকে আমি ভুলতে পারব না—হারিয়ে দিতে পারব না কাজ-অকাজের ভিড়ে—সংসারের অশান্তি আর কলহের এক-একটি নিষ্ঠুর ঝাপটায়।

আর একথাও ঠিক যে তোমার জন্যেই এ সংসারে আর বেশিদিন আমি থাকতে পারব না। আমাকে সরে যেতে হবে এই মান অপমানের মিথ্যা বোঝা বওয়া স্বার্থপর সংসারের কাছ থেকে। এখন সকাল থেকে রাত অবধি এখানকার তিক্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মনটাও ভয়ে ভয়ে কেমন যেন কুঁকড়ে গেছে। নিজের ওপর অকারণেই এক অদ্ভুত সন্দেহ জাগে। মনে হয়, সব মিথ্যা—প্রেম

আর জীবন, স্মৃতি আর অনুকম্পা, শপথ আর প্রতীক্ষা—এসবের কোন অর্থই নেই সংসারে।

কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে যায় মা-বাবার কথা। এতদিন ধরে তাঁরা টিঁকে আছেন শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। ছেলেবেলায় দেখেছি, বাবা অকারণে কতবার রাগারাগি করেছেন মার ওপর—বৌদির ভাষায়, হয় তো অপমানও করেছেন—মা কথা বলে প্রতিবাদ জানাননি বটে কিন্তু নীরব থেকে অভিমান জানিয়েছেন আর নারী সুলভ কৌশলে অসহযোগ করেছেন বাবার সঙ্গে। তখন বাবার সে কী ছেলেমানুষী! যতক্ষণ না মার মুখে নতুন করে হাসি ফুটেছে ততক্ষণ যেন বাবার সাধনার বিরাম নেই।

আমরা যেমন দেখেছি ঝণ্টু তার মা বাবার বেলায় তেমন দেখতে পাবে না। তা না দেখতে পেলে কার কী লাভ-ক্ষতি আমি জানিনা, তবে আজ এই বয়সে নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে আমার চোখ দুটো হঠাৎ ভিজে ওঠে আর মনে হয়, কে বড়! আমার বোকা মা-বাবা না ঝণ্টুর চালাক মা-বাবা?

বড় হবে ঝণ্টু। নিজের ভাল মন্দ বুঝবে। চালাক হবে। বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে যাচাই করবে বলে ভেঙে টুকরো টুকরো করবে নিজেকে। হৃদয় দিয়ে কিছু জোড়া লাগাবার চেষ্টাও করবে না। তাই করুক সকলে। কেউ যেন আমার মতো বোকা না হয়—মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে আর সকলের কৃপা কুড়িয়ে বেঁচে না থাকে। হঠাৎ আমার নিজেরও ওদের মতো বুদ্ধির অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে সব কিছু ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে।

চোখ বুজে কতক্ষণ পড়েছিলাম খেয়াল নেই। আর ভাল লাগছে না একাকীত্বের অন্ধকারে খেয়াল-খুশি মতো হাতড়ে হাতড়ে মিথ্যা তৃপ্তির অনুসন্ধান! কথা বলবার জন্যে, নিজেকে সঁপে দেবার জন্যে আমি উদ্দাম হয়ে উঠেছি।

আগুন জ্বলুক ভিতরে-ভিতরে, ভেঙে যাক এ সংসার তবুও মা

বাবা যেমন আছেন সব প্রতিকূল স্পর্শ বাঁচিয়ে তেমনি তুমি এস সকলের অলক্ষ্যে আমাকে বুকে তুলে নিতে। তুমি এস আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে। তুমি এস আমার একাকীত্বের থম থম কুয়াশা সূর্যের প্রখর আলোর মতো হাসিতে-চুম্বনে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে। এ রাত আবার জীবন্ত হয়ে উঠুক। শীতের কঠিন ভার শ্লথ হয়ে যাক আর একে-একে আমার সব দৈন্যের অবসান হোক তোমার আবির্ভাবে।

কিন্তু কোথায় তুমি।

অনেক দূর থেকে একটা ট্যাক্সি আসছে। ট্যাক্সি দেখলে এখনও মাঝে মাঝে আমি ভয় পাই—আর আওয়াজ শুনে হঠাৎ চমকে উঠি। হ্যাঁ, ওই একটা ছোট ট্যাক্সি আমাদের বাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে বলে আজও আমার বুক কাঁপছে।

রাতের দারোয়ান লাঠি ঠুকে পাহারা দিচ্ছে—ঠক ঠক। অনেক দূরে সেই থেকে টানা সুরে একটা বেড়াল কেঁদে চলেছে—মিঁয়াও মিঁয়াও। আর থেকে থেকে গাছের মাথায় উদভ্রান্ত কাকের দল ডেকে উঠছে কা—কা।

কী বোকা ওই কাকগুলো! এত রাতে ওদের ডাক শুনে আমি বুঝতে পারছি আজ বাইরে চাঁদের রুপোলি আলোর ছায়া খেলছে আর ওরা মনে করেছে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। দারোয়ানের লাঠি ঠক ঠক, বেড়ালের কান্না আর কাকের মিথ্যা উল্লাস—আমি কাঠ হয়ে শুনি সেই দূরের ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায় আমাদেরই বাড়ির দরজায়।

দাদা ফিরেছে। দাদা নামল। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার শব্দে আমি সব বুঝতে পারি। দু-এক মিনিট পরই ট্যাক্সিটা চলে যায়—সরে যায় অনেক দূরে। যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ আমি যেন ইচ্ছে করেই সেই ট্যাক্সির শব্দ শুনি। আর মাঝে মাঝে শীতের রাতের তন্দ্রা-ভাঙা হর্নের আওয়াজে একটা অস্বস্তিকর চাপ অনুভব করি

বুকের মধ্যে আর ইচ্ছে করেই দুটো চোখের পাতা চেপে ধরি আমার সব শক্তি ব্যয় করে।

কিন্তু একটু পরেই আমাকে উঠে বসতে হয়—হাতড়ে হাতড়ে যেতে হয় সুইচের কাছে। তারপর দ্রুত আঙুলের চাপে আলো জ্বেলে বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় একা-একা। ভারী লজ্জায় হঠাৎ ঠিক করতে পারি না এখন কী করা উচিত আমার।

হয় তো আজ সন্ধ্যা থেকেই বৌদি প্রস্তুত হয়েছিল দাদার ফেরার অপেক্ষায়। নিজেই খুলেছে দরজা আর পাঁচজনকে শুনিয়ে দাদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে। কারণ সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্যে বৌদি যখন নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করতে পেরেছে আর বিশৃঙ্খল জীবনে নির্লজ্জের মতো মেতে উঠে দাদা ভেঙে দিয়েছে তার সব লজ্জা—সব সম্মান তখন বৌদির আর কাকে ভয়।

দাদা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে—আমি জানিনা বৌদি বাইরের দরজা বন্ধ করেছে কি-না—আর্তনাদের মতো একটা ভাঙা চিৎকারে আমি চমকে উঠি। বৌদির গলার স্বর চিনতে আমার বেশ কিছু সময় লাগে।

আমাকে এমন তিল-তিল করে মারবে আর আমি—

হোয়াট ডু ইউ মীন? সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে এসেছে দাদা। কেননা ওর গলার স্বর আমার কানে স্পষ্ট হয়ে আসে। স্বর জড়ানো। স্বর জোরালো।

তোমার এই অবস্থাটা আমি মা-বাবাকে, দীপুকে ঝণ্টুকে আর পাড়ার লোককে ডেকে দেখাতে চাই যেন কেউ আমাকে কখনও দোষ না দেয়—

দাদা মেঝেতে জোরে জুতো ঠুকে বলে, কী দেখাবে তুমি? আর তোমার আসল রূপটা আমিও দেখাতে পারি না ভেবেছ?

তোমার দৌড় আমার জানা আছে, অস্বাভাবিক চিৎকারে ঘুমন্ত

বাড়িটাকে যেন জাগিয়ে দেয় বৌদি, আজ একটা এদিক-ওদিক না করে আমি—উঃ!

দরজা বন্ধ করে আর আমি বসে থাকতে পারি না। বোধ হয় দাদার কাছ থেকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে কয়েক মিনিট যন্ত্রণায় চুপ করে থাকে বৌদি। আমি শুধু দাদার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। দাদা তুম তুম করে এগিয়ে আসে তার ঘরের কাছে। আর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভয় পায় ঝণ্টু।

ও পিসি, বাবা মাকে মেরেছে। পিসি—পিসি—ও পিসি—আমার ঘরের দরজায় কচি হাতের ঘন ঘন ধাক্কা পড়ে। আর ঠিক তখনই আমি দরজা খুলে বাইরে আসি।

কঠিন শীতের দাপটে যেন ভেতরের বারান্দার আলো স্থির হয়ে আছে। কিন্তু এখন শীত কি গ্রীষ্ম তা বোঝবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার—হয় তো বৌদিরও নয়।

বৌদিকে দেখে আমার শরীরে রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে যায়। কেরোসিন গায়ে ঢেলে পুড়ে মরবার সময় মানুষের চোখ মুখের অবস্থা যেমন হয় ওর চেহারা ঠিক তেমন দেখাচ্ছে এখন। ওকে দেখেই আমার বুঝে নিতে দেরি হয়না যে একটা সাংঘাতিক কিছু করবার জন্যে ও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে।

কিন্তু কী করবে জয়া?

ছোট্ট ঝণ্টু আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারপাশ। জয়ার চেহারা দেখে তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আমার হয় না। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে একটা কিছু আমার করা দরকার। না হলে—কী ঘটবে আমি বুঝতে পারি না।

ক্ষিপ্ত জয়া ছুটে এসে বোধ হয় গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাদার গলা চেপে ধরে বলে, বল তুমি ঠিক সময় ভদ্র অবস্থায় বাড়ি ফিরবে কি-না?

কিন্তু দাদার দ্বিতীয় ধাক্কা সহ্য করতে পারে না জয়া—মেঝেতে

হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর নিজের মাথার এলোমেলো চুল কাঁপা কাঁপা আঙুলে ঠিক করবার বৃথা চেষ্টা করে দাদা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, হুকুম দিতে এসেছেন! তুমি কে? টাকা দিয়ে যাদের কেনা যায় তেমন একটা মেয়েমানুষ—বাজারের একটা—

সব ভুলে যাই আমি। আর আমার গলা চিরে যেন ভয়ঙ্কর এক শাসন ছুটে বেরিয়ে আসে, দাদা!

কিন্তু দাদা চমকে ওঠে না আমার স্বর শুনে। একটু লজ্জাও পায় না। জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, তা ছাড়া কী ও? কী আছে ওর যে আমি সুড়সুড় করে রোজ বিকেল বেলা সুবোধ বালকের মতো বাড়ি ফিরে আসব?

তোমারই বা কী আছে, আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সব আঘাত অগ্রাহ্য করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় জয়া, যে মাঝ রাতে লাথি খেয়েও আমি তোমার চরণ যুগল আঁকড়ে পড়ে থাকব?

কে বলেছে তোমাকে পড়ে থাকতে? আর একটি পয়সাও তুমি আমার কাছ থেকে পাবে না। যেখানে পয়সা পাবে সেখানে সোজা চলে যেতে পার—

মুখ সামলে কথা বলবে। এত বড় ছেলে রয়েছে যার তার একটু লজ্জা করে না রাত দুপুরে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে?

না, দাদা বোধহয় আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে জয়াকে, সব লজ্জা গেছে একটা স্বার্থপর মেয়ে মানুষের জন্যে যে জানে শুধু গলা টিপে টাকা আদায় করতে—আর, কিছু দেবার ক্ষমতা যার নেই—

তোমার টাকা নিয়ে আমি ফূর্তি করে বেড়াই—আমার আত্মীয়দের সাহায্য করি?

কী কর তা জানবার কোন দরকার আমার নেই। আমি জানি যে টাকা খরচ করলে তোমার চেয়ে অনেক—অনেক ভাল মেয়েমানুষ পাওয়া যায়—

ঝণ্টু এখনও ছাড়ে না আমাকে। আমি তাকে সুদ্ধ কোন

রকমে দাদার সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াই, ছি ছি, দাদা! এখুনি মা-বাবা নেমে আসবেন—

যা হয় হোক। আমি কাউকে গ্রাহ্য করিনা—জয়ার দিকে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে দাদা আবার বলে, বেরিয়ে যাও—

কিন্তু দাদা থামবার আগেই খট করে ওপরের ঘরের খিল খোলবার শব্দ হয় আর জোরে জোরে পা ফেলে বাবা এসে দাঁড়ান দাদার সামনে। পেছনে-পেছনে মা-ও।

বাবাকে দেখে বোধ হয় নেশা কেটে যায় দাদার। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু জয়া নড়ে না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দাদাকে যেন ছাই করে দিতে চায়। আমি লক্ষ্য করি এখন ও ঠক ঠক করে কাঁপে। শীত আর উত্তেজনা—দুই মিলিয়ে ও আর যুদ্ধ করতে পারে না বোধহয়।

কিছুক্ষণ দাদাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন বাবা। তারপর ওকে জোরে আঘাত করবার জন্যে একটা হাত তোলেন। কিন্তু মারেন না। আস্তে হাতটা আবার নামিয়ে নেন। মা তাড়াতাড়ি এসে বাবা আর দাদার মাঝখানে দাঁড়ান।

বাবা চিৎকার করেন না। খুব আস্তে থেমে থেমে দাদাকে বলেন, বাড়ি আমার না তোমার? কী অধিকার তোমার আছে যে বাড়ির বউকে তুমি বেরিয়ে যেতে বল স্কাউনড্রেল কোথাকার—

দাদা বলে, আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারব না—

তাহলে তুমি বেরিয়ে যাও। দেখ বিজন, এবার একটু গলা তোলেন বাবা, আমি সব লক্ষ্য করছি—আমি দেখছি তুমি আস্তে আস্তে একেবারে শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—আর কোনদিনও যদি এমন অবস্থায় তুমি বাড়িতে ঢোক তাহলে আমি চাবুক-পেটা করে তোমাকে বার করে দেব—

বাবার হাত ধরে মা বলে ওঠেন, ওগো থাম, অত উত্তেজিত হয়ো না—তোমার শরীর খারাপ হবে।

না, কিছু হবে না, এবার মাকে লক্ষ্য করে বাবা বলেন, দিনের পর দিন একটা লোক অন্যায় করে যাচ্ছে আর তোমরা চুপ করে আছ—আশ্চর্য !

বাবা আর কথা বলেন না। দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে শুধু বলেন, বৌমা আর ঝণ্টুকে তোর ঘরে নিয়ে যা দীপু। যাও বৌমা। আবার ঘুরে দাঁড়ান বাবা। মাকে বলেন, এস। ও ছেলের জন্যে কাল পাড়ার লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে সেই কথা ভাব—

তবু ফিস ফিস করে মা দাদাকে বলেন, বিজু, এবার শুয়ে পড় !

নিস্তব্ধ রাতে পাছে চটির আওয়াজ জোর হয় বলে পা টিপে টিপে বাবা ওপরে নিজের ঘরে চলে যান। আর একবার মাকে ডাকেন। মা আর দাঁড়ান না। যাবার সময় শুধু আলগোছে দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে যান। তাকান না জয়ার দিকে। ঝণ্টুকেও কিছু বলেন না।

এবার আমার কথা বলবার পালা। কাজ করবার পালা। কিন্তু কী কথা বলব আমি—কী কাজ করব ! এতক্ষণের ঝড়ের প্রবল ঝাপটা যেন আমাকেই হিংস্র আঘাত করে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। আমার হাত কাঁপছে। পা কাঁপছে ! ওদের কারুর দিকে তাকাতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে।

শিষ দেয় দাদা। পা থেকে জুতো মোজা খুলে ছুঁড়ে ফেলে এদিক-ওদিক। তারপর ঢুকে পড়ে মশারির ভেতর। একটু পরেই আমি ওর ঘন ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাই।

বৌদি, আমি এবার আস্তে ডাকি, এস আমার সঙ্গে।

আশ্চর্য ! কোন প্রতিবাদ করে না জয়া। শান্ত মেয়ের মতো বলে, হ্যাঁ, চল।

দাদার ঘরে আলো নিভিয়ে দি—বারান্দারও। ঝণ্টু আর বৌদিকে

নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে আসি নিজের ঘরে। সাবধানে দরজার খিল তুলে দি। শুয়ে পড়ে জয়া। শুয়ে পড়ে ঝণ্টু। আমিও শুই।

যেন সব ঠিক হয়ে গেল বাবার কয়েকটি কথায়। আর কেউ কোন গোলমাল করবে না। সকলের সব সমস্যা মিটে গেছে। জয়া এত শান্ত হয়ে গেল কেন? শুধু কি এইটুকু ও চেয়েছিল? মা দেখবে, বাবা দেখবে, আমি দেখব? আর সকলেই দোষ দেবে দাদাকে। জয়া মাঝ রাতে চিৎকার করে প্রমাণ করবে যে ওর কোন দোষ নেই। নিজের জীবনে সর্বনাশ নেমে এলেও ও সকলকে জানিয়ে দেবে যে ওর ওপর অন্যায় করা হয়েছে—অবিচার করা হয়েছে—ওকে অপমান করা হয়েছে। কিন্তু এত কাণ্ড করেও শেষ অবধি কী রইল জয়ার!

আমার দরকার নেই কিছু জানবার। আমার দরকার শুধু তোমাকে। আমি তোমার বুকে মুখ গুঁজে অস্বীকার করতে চাই এই কাটা-ছেঁড়া ভাঙা চোরা জীবনকে। এস তুমি—আমায় বুকে তুলে নাও। এস—এস!

না, কেউ নেই। ঠাণ্ডা ঘর। ঠাণ্ডা বিছানা। কেউ নেই আমার কথা শোনবার—আমার বুকের অশান্ত আগুনটা নিভিয়ে দেবার। না, স্মৃতির টুকরো দিয়ে সেই রঙীন জাল রচনা করে তোমাকে কাছে টেনে আনবার ক্ষমতাও আজ আমার নেই। আমি জ্বলছি। জ্বলবও।

তুমি বিশ্বাস কর—আমি এদের কারুর কথা ভেবে ব্যাকুল হচ্ছি না। আমি ভাবছি, এবার কী নিয়ে বাঁচব। সংসারের এমনি ঝড় ঝাপটা যদি আমাকে দুর্বল অক্ষম করে তোলে আর তুমি আমাকে একা ফেলে দূর থেকে দূরে সরে যাও—তাহলে কোন বিশ্বাসে নির্ভর করে বাঁচব আমি—কোন কাজে নিজেকে মাতিয়ে তুলব।

মা-বাবা, দাদা-বৌদি—এরা সকলেই তো দূরের মানুষ—

সংসারের এত বড় বিপর্যয়ে কে আমার মনে জ্বলন্ত বিশ্বাসের মতো বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে! কেউ না।

তুমি নেই—যে কথাটা সত্য আর সকলের কাছে—শেষ অবধি তা-ই কি আমার কাছেও এতদিন পর সত্য হয়ে উঠবে? আর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে আমার বিশ্বাস আর জীবন? এতদিন তাহলে কী নিয়ে ভুলেছিলাম আমি—কী নিয়ে তৃপ্ত হয়ে উঠেছিলাম!

কেন প্রথমদিনই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি তোমার টাকা-পয়সা, যত সম্পত্তি আর সঞ্চয়? কেন তোমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়নি আমাকে? তাহলে তখন থেকেই আমাকে পায়ে-পায়ে বুঝতে হত—তুমি নেই। এতদিনে সয়ে যেত আমার তোমাকে হারানোর সব দুঃখ যন্ত্রণা শোক।

এখন কেমন করে কাঁদব আমি? আমার চোখ শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে—এক ফোঁটা জলও নেই। আমি জানি তুমি আর আসবে না আমার কাছে—আমাকে শান্ত করতে পারবে না। একটা আশরীরী এই জ্বলন্ত শরীর মনের দাবী মেটাতে পারবে না। কিছুতেই না।

তাহলে এখন কাকে খুঁজে বেড়াব আমি? তোমার অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু কখনও ছিল না আমার। কোন বিশ্বাস না। কোন সত্য না।

আমি আর পারছি না এমন করে মনে মনে জ্বলে যেতে। চুপ করে আছে জয়া। শান্ত হয়ে ঘুমচ্ছে ঝণ্টু। ওদের সব মান-অপমানের শেষ হবে। এ ঝড় থেমে যাবে। কেননা মৃত্যুর ভ্রূকুটি নেই ওদের মাঝখানে। জীবনকে সামনে রেখেই ওরা হাসবে কাঁদবে ঝগড়া করবে আর ভালবাসবে।

কিন্তু তোমার আমার মাঝখানে রয়েছে মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গে কী বোঝাপড়া করবে জীবন? কী তর্ক করবে? শুধু হিম আর ঘুম আর দীর্ঘশ্বাস। কোন উত্তাপ নেই কোথাও।

জয়া জানে ওর বোঝাপড়া উত্তাপের সঙ্গে—জীবনের সঙ্গে। তাই ও মাথা তুলে চিৎকার করতে পারে—আঘাত করতে পারে—প্রতিবাদ জানাতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কারুর কোন কথা নেই—যে সম্পর্ক রাখতে চায় সে মূর্খ। সে জড়। তার হাসি নেই। কান্না নেই। রাগ দ্বন্দ্ব মান অভিমান কিছু নেই। হ্যাঁ, আমার কিছু নেই।

কিন্তু সেকথা কেন তুমি আমাকে বুঝতে দাও নি প্রথম-প্রথম? কেন তুমি আসতে আমার কল্পনায় প্রেতচ্ছায়ার মতো দেহে মনে আগুন ধরিয়ে দিতে? কী মূর্খ আমি!

তার চেয়ে তখন কেন আমি মনে মনে বুড়ি হয়ে ভগবানের কাছে সঁপে দিলাম না আমার জীবন! কেন বিদ্রোহ করে শুধু এক দম্ভ বজায় রাখবার জন্যে মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে অস্বীকার করলাম নিজেকে—সমস্ত জীবনকে।

এখন কী নিয়ে বেঁচে থাকব আমি।

॥ চার ॥

তবু আমি বেঁচে আছি। আর ইচ্ছে করলে মরা যায় না বলেই আমাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু মরবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এখন জোর করে জীবনের সঙ্গে আমি একটা সন্ধি করে নিতে চাই।

কিন্তু দাদার সঙ্গে কোন রকম সন্ধি করতে পারেনা বৌদি—চায়ও না হয় তো। বাবা সে রাত্রে দাদাকে কঠিন শাসন করলেও কোন পরিবর্তন হয়নি দাদার চলাফেরার। আর হয় তো লাভ নেই বলে বাবাও আর শাসন করতে আসেন নি দাদাকে।

শুধু অনেক পরিবর্তন হয়েছে বৌদির। আমি চুপ করে দেখি কাউকেই আর গ্রাহ্য করে না জয়া। মাকে না। বাবাকে না। এমন কি, ঝন্টুর জন্যেও তার যেন কোন দায়িত্ব নেই। ওর সব দায়িত্ব জয়া এখন চাপিয়ে দিয়েছে মার আর আমার ওপর।

খুব সকালে—দাদা অফিসে বার হবার আগেই দ্রুত হাতে অল্প প্রসাধন সেরে জয়াও বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে খাবার ঠিক আগে আগে। তারপর স্নান খাওয়া সেরে আবার বার হয়। ফিরতে দেরি হয় ওর। কোন-কোনদিন বাড়িতে খায়ও না।

কোথায় যায় জয়া—কি করে—ইচ্ছে থাকলেও সেকথা কেউ জিজ্ঞেস করে না ওকে। কেননা কেউ বুঝতে পারে না যে প্রশ্ন শুনে কোন ধরনের উত্তর সে দেবে।

মা শুধু মাঝে মাঝে দাদাকে টেনেই আমার সঙ্গে কথা বলেন, উনি বললে কী হবে, বৌমার জন্যেই তো বিজু এমন বাইরে বাইরে ঘুরে যা-তা করে বেড়ায়।

বৌদির জন্যে কেন দাদা এমন হবে ?

দেখ, সব সময় টাকা-টাকা করলে ছেলেরা তো বিরক্ত হবেই।

বিরক্ত হোক, তা বলে দাদার এমন কাণ্ড করে বেড়াবার কোন মানে হয় না। তোমাদের মান-সম্মানের কথাও তো দাদা ভাবে না আজকাল। আর সত্যিই তো, টাকা নিয়ে বৌদি নিজে যা-তা করে উড়োয় না। দাদার যেমন স্বভাব, ও কোনদিনও ঝণ্টুর জন্যে কিছু জমাতে পারবে ভেবেছ?

তবু জয়ার বিরুদ্ধেই মা কথা বলেন, কিন্তু কিছুদিন সংসারের শান্তি বজায় রাখবার জন্যে একটু কম জমালেই তো পারত বৌমা, একটু থেমে মা আবার বলেন. আর বৌমা নিজেই বা এখন কী করে বেড়ায় সারাদিন তুই বল?

আমি বলি, তা তো করবেই। দাদা না বুঝলে ওর ভালমন্দ ওকে তো বুঝতে হবেই।

কেন, আমরা নেই?

দাদার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেলে ও কিসের জোরে তোমাদের ওপর নির্ভর করবে?

আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যান মা। চোখ বড় করে বলেন, সম্পর্ক চুকবে কিরে! দুদিন মন কষাকষি হলেই সম্পর্ক চুকে যায়? তোর বাবার সঙ্গে আমার তো কতবার কত গোলমাল হয়েছে—

আমি বাধা দি, এমন গোলমাল কখনও হতে পারে না মা— এমন অপমান আজকালকার কোন মেয়ে সহ্য করতে পারে না—

আমার কথা শুনে মার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তিনি আর কোন কথা বলেন না আমার সঙ্গে। ঝণ্টুর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আস্তে আস্তে উঠে যান। আমি জানি, আমার কথাগুলো মার ভাল লাগে নি—নিজের ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা কারুরই ভাল লাগে না। কিন্তু আমি নিজে কোনমতেই আর দাদাকে সমর্থন করতে পারি না।

এবার এ সংসার ছারখার হয়ে যাবে। দুদিন পর বাবা যখন

আর থাকবেন না এ পৃথিবীতে তখন কেউই নির্ভর করতে পারবে না দাদর ওপর।

কিন্তু কে আর নির্ভর করবে! আমার কথা ওঠে না। আমি বুঝতে পারি বৌদি নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে সারা দিনরাত চেষ্টা করছে। বাবা থাকুন বা না থাকুন, মাও দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না।

শুধু ঝণ্টু। আমি তার কথাই ভাবি। সেও আসে আমার কাছে ছুটে ছুটে। আমি তাকে আদর করি। তার সঙ্গে গল্প করি ওরই সমবয়সী বন্ধুর মতো। আর সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, পিসি, তুমি আর আমাকে ভালবাসনা—

কেন কেন কেন ঝণ্টু বাবু?

আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে না তো তুমি—

ওর কথা শুনে আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলি, কালই তোমাকে নিয়ে যাব ঝণ্টু।

পরদিন সত্যি আমি ওকে নিয়ে যাই চিড়িয়াখানায়। ও বেড়ায় ছুটে ছুটে। এক-একটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে স্ফূর্তিতে চিৎকার করে আর আমি কোন জন্তু জানোয়ার দেখি না। ওকেই দেখি। ওর এত স্ফূর্তি আমি শিগগির দেখি নি। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ও যেন বেঁচে গেছে।

আজ চিড়িয়াখানায় অনেক লোকের ভিড়। আমি কখনও এখানে এত লোক দেখি নি। এত রঙ—এত খুশিও না। ঝণ্টুকে নিয়ে আমি এখানেই আসব বারবার।

কিন্তু ওর সঙ্গে তাল রেখে আমি চলতে পারি না। ও ভাল্লুকের খাঁচার সামনে এসে লাফায়। তারপর এক মনে পাখি দেখে। সেখান থেকে চলে আসে উটের কাছে। আর বাঘ-সিংহের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নড়তে চায় না।

শীত চলে যাচ্ছে। মাঘের মাঝামাঝি হলেও সূর্যের তেজ আজ

একটু বেশিই। হয়তো এবার অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক তাড়া-তাড়ি গরম পড়ে যাবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে শীত গ্রীষ্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ঝণ্টুর নেই। হাতি আর ঘোড়ার পিঠে চড়বার জন্যে ও হঠাৎ আব্দার ধরে। আমাকেও ওর সঙ্গে ওদের পিঠে চড়তে হবে। আশ্চর্য, আপত্তি করবার সাহস হয় না আমার।

কিন্তু দেখতে দেখতে—ঝণ্টুর তালে তাল মেলাতে মেলাতে আমার বয়েসটা আমাকে না জানিয়েই যেন হঠাৎ অনেক কমে যায়। আর আমি আপন মনেই হাসি। অনেকক্ষণ। ওর মতো একটা ছোট ছেলে আমার মুখে এমন সহজ হাসি ফোটাতে পেরেছে বলে আমি ওকে আরও জোরে আমার কোলে চেপে ধরি।

এখান থেকে আমার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ঝণ্টুর মতোই চোখে খুশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমি দেখি তাজা ঘাস। বড় বড় গাছ। আর জলে গাছ মানুষ আর হালকা মেঘ ছাওয়া আকাশের স্পষ্ট ছায়া। দেখতে দেখতে আমি সব ভুলে যাই। তোমাকেও।

আর এক সময় আমার একথাও মনে হয় যে তোমাকে ভুলতে পারলে আমার শরীর কত হালকা হয়ে যায়! কত শান্ত হয় মন! আর জীবন কত সহজ! তবে কি এমনি করেই সত্যি আমি তোমাকে ভোলবার চেষ্টা করে ঝণ্টুকে চেপে ধরব আমার বুকের মধ্যে? যদি এমন হাসি লেগে থাকে আমার ঠোঁটের ফাঁকে তাতে কার কী ক্ষতি! সে তো আমারই একার মস্ত বড় একটা লাভ।

ঠিক এই সময়, আশ্চর্য, আমার এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটা জীবন্ত ইঙ্গিত যেন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। আর ওকে দেখতে দেখতে আমার দু চোখে কিছুক্ষণের জন্যে কোথা থেকে নেমে আসে একরাশ বিস্ময়। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেও প্রথমে আমি ওর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারি না।

ওকে দেখে আমি অবাক হই না। কিন্তু তোমাকে ভোলবার

কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর আবির্ভাব আমাকে বিস্মিত করে। ওকে দেখতে দেখতে আমি ডুবে যাই তোমারই ভাবনায়। আর আবার হঠাৎ সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে যায়। যেদিন তুমি অফিসে বেরিয়ে যাবার পর ভিজে-ভিজে ঝাপসা আলোয় আমার অবচেতন এই ভরা সংসার থেকে, তোমার বন্ধন থেকে, প্রতি দিনের সব দায় থেকে মুক্তি চেয়েছিল। আর সেইদিনই আমি জানি না কেমন করে, তুমি শ্রদ্ধা করে গেলে আমার অবচেতনকে—আমাকে মুক্তি দিয়ে মুছে গেলে আমার সংসার থেকে।

আর সেদিন যেমন তোমার এই মুছে যাওয়ার খবর নিয়ে এসেছিল এক আগন্তুক—আজও তেমনি তোমাকে ভোলার ভাবনা উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তোমাকে আমার মন থেকে একেবারে মুছে ফেলবার জন্যেই এসে দাঁড়াল আর একজন।

এই শৈলেনের কথা তোমাকে আমি অনেকবার শুনিয়েছি। আর ওর কথা তুলে তুমিও বারবার আমার সঙ্গে রসিকতা করতে ইতস্তত করনি। তুমি ওকে দেখনি। কিন্তু ওকে দেখবার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তোমার। সেই শৈলেন আজ হঠাৎ আবার এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।

সবে ইস্কুল ছেড়ে তখন কলেজে উঠেছি। আর কাঁচা-কাঁচা কল্পনার ছোঁয়ায় মনটাও অল্পে অল্পে ফুটে উঠেছে। বন্ধুদের বিয়ের খবর পাই। আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নিজের ফুটে ওঠা শরীরের দিকেও তাকিয়ে দেখি। আর থেকে থেকে কিছুই ভাল লাগে না। শুধু নিজেকে সাজাতে ইচ্ছে করে।

তখন দাদার কাছে আসত শৈলেন। কিন্তু ওর আমাকে দেখার আগ্রহ বোধহয় ছিল আরও বেশি। আমি বুঝতাম। কিন্তু ওকে প্রশ্রয় দেবার সাহস ছিল না তখন। তাই চেষ্টা করতাম ওর কাছে সহজ হয়ে উঠতে—যত সহজ হওয়া যায়।

যেন ও আমাদেরই বাড়ির একজন। ওর কাছে আমার সঙ্কোচ

করবার কোন মানে হয় না। কিন্তু আমি প্রশ্রয় না দিলেও, আস্তে আস্তে সাহসী হয়ে ওঠে। আমার কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এক ট্র্যামে ওঠে। আমার টিকিট কাটে।

আর একদিন রাস্তায় একা পেয়ে আমাকে স্পষ্টই বলে, দীপা, তোমার সঙ্গে আমি আরও অনেক বেশি কথা বলতে চাই—

ওর কথা বলার ধরন দেখে আমি ভয় পাই। ঘন ঘন আমার নিশ্বাস পড়ে। আমি খুব আস্তে কোন রকমে শুধু জিজ্ঞেস করি, কি কথা ?

তা তো জানি না, ভয়ে-ভয়ে হাসে শৈলেন, শুধু জানি যে তোমার সঙ্গে আমার অনেক-অনেক কথা আছে—

রাস্তায় ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে আমার সাহস হয় না। কিন্তু মন্দ লাগেনা ওর চোর চোর ভাব—ওর সলাজ চাউনি। আমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাই। ওকে আর কিছু বলবার সুযোগ দি না।

ব্যস্, এই টুকুই। শৈলেনের অনেক কথা শেষ অবধি আমার শোনা হয় না। শোনবার উপায়ও থাকে না। আজ মনে হয়, তখন সকলের অলক্ষ্যে মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে কারুর কথা শোনবার জন্যে আমার মন একেবারেই প্রস্তুত হয়নি। আর হয় তো সব বাধা চুরমার করার জন্যে একটা নির্ভীক ইঙ্গিত আমাকে পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল না শৈলেনের।

তাই ওর সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্ক ওকে ইচ্ছে করে দূরে-দূরে রেখে আমি নিজেই ভেঙে দিলাম। ও সেদিন আমাকে কী ভেবেছিল জানি না, কিন্তু আমার কাছে প্রশ্রয় না পেয়ে নিজেও সরে গিয়েছিল। কাঙালের মতো আমার সামনে জোর করে ওর অনেক-অনেক কথা শোনাবার জন্যে আর কখনও এসে দাঁড়ায় নি।

কিন্তু শৈলেন আর আমার সামনে আজ বোধ হয় সঙ্কোচের ক্ষীণ একটা রেখাও নেই। ওর মুখ দেখে আমার মনে হয়, সেই ছেলে-

মানুষীর কথাও ভুলে গেছে। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। আর ওর সঙ্গে এমন করে দেখা না হলে এসব কথা হয় তো আমার কোনদিনও মনে পড়তনা। মনে পড়বার কথাও নয়।

প্রথমে শৈলেনই কথা বলে, যাক, তোমার সঙ্গে তাহলে চিড়িয়াখানায় আবার দেখা হল—

আমি হাসি মুখে বলি, জায়গাটা তো খুবই ভাল—কী বলেন?

নিশ্চয়ই, বাঘের খাঁচার দিকে আঙুল দেখায় শৈলেন, ওই দেখ।

এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল বাঘগুলো, হঠাৎ দেখি ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। ছটফট করছে। একবার এদিকে আসছে—একবার ওদিকে যাচ্ছে। আর ওদের দেখতে দেখতে ঝণ্টু জোরে হেসে ওঠে।

ওকে কাছে টেনে নিয়ে শৈলেন আমাকে জিজ্ঞেস করে, ছেলে?

দাদার ছেলে।

তাই নাকি? বিজনের ছেলে এত বড় হয়ে গেছে! আর তোমার কটি?

মুখ নামিয়ে বলি, না, আমার কিছু নেই।

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে শৈলেন বলে, কতদিন যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি!

আপনি তো আর একেবারেই যান না—এখানেই আছেন তো?

হ্যাঁ, এই যাই-যাই করে শেষ অবধি আর যাওয়া হয় না—তবে প্রায়ই তোমাদের খবর পাই এখান-ওখান থেকে, বোধ হয় সব চেয়ে বড় সুন্দর বাঘটা দেখতে দেখতে শৈলেন বলে, তোমার খবর শুনে খুবই খারাপ লেগেছিল, ও এবার আমার দিকে তাকায়, কোথায় আছ এখন?

বাবার কাছে।

কিছু করছ নাকি?

না, ভাঙা-ভাঙা স্বরে থেমে থেমে বলি, কি করব না করব এখনও ঠিক করতে পারি নি—

আবার কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয় শৈলেন। ঝণ্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, তোমাকে তাহলে এ-ই এখানে টেনে এনেছে—তোমার নাম কী?

ওর নাম ঝণ্টু। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো কেউ নেই। আপনাকে কে টেনে আনল এখানে?

হাসি-হাসি মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে শৈলেন। তারপর যেন আপন মনেই বলে ওঠে, না, এখনও আমার কেউ নেই এখানে টেনে আনবার মতো। বলতে পার, মনের স্বাভাবিক টানেই এলাম এখানে, ও একটু থামে, তবে এসে ভালই হল—কী বল?

কেন? ওর কথা বুঝতে পারি না আমি।

শুধু জন্তুজানোয়ার দেখেই ফিরে যেতে হল না—মানুষও দেখলাম।

এপাশে ওপাশে তাকাতে তাকাতে আমি বলে উঠি, হ্যাঁ, এত ভিড় আমি এখানে কখনও দেখি নি।

স্বরে অদ্ভুত ধরনের রহস্য মিশিয়ে শৈলেন বলে, না না, ভিড়ের কথা আমি বলছি না—আমি একটি মানুষের কথাই বলছি, একেবারে স্পষ্ট করে ও বলে, হ্যাঁ তোমার কথাই।

বোধহয় এক মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুতের মতো একটা চমক ঝলসে ওঠে আমার মনে। কিন্তু শৈলেন যেন সেকথা জানতে না পারে তাই আমার এই চমকের কথা গোপন করবার চেষ্টা করে আমি তাড়াতাড়ি বলি, আমারও দেখা হল আপনার সঙ্গে—

চল, ঝণ্টুর হাত ধরে শৈলেন বলে, ওদিকে যাই। চা খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি কী খাবে ঝণ্টু? কেক? চানাচুর?

শৈলেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝণ্টু বলে ওঠে, চানাচুর।

এস দীপা, আস্তে চলতে চলতে শৈলেন বলে, জায়গা পাওয়া যাবে কিনা জানি না, ওদিকটায় একটা ভদ্র রেস্তোরাঁ আছে—

আমি মৃদু আপত্তি করি, আর একদিন হবে। আজ থাক না—

তা কি হয়? কতদিন পর দেখা হল তোমার সঙ্গে। চল।

হাঁটতে হাঁটতে বলি, এবার মাঝে মাঝে যাবেন তো আমাদের ওখানে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর জায়গা পাওয়া গেল চিড়িয়াখানার রেস্তোরাঁয়। ভিড়ে ভিড়। এখনও লোক আসছে। সূর্যের তেজ কমে এসেছে। বাতাস দিচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ভাল লাগছে এখানে বসে থাকতে—আমার ভাল লাগছে শৈলেনের সঙ্গে কথা বলতে আর ওর কথা শুনতে।

যদিও বেশি কথা আর হয় না আমাদের। শৈলেন কথা বলে ঝণ্টুর সঙ্গে। আর ঝণ্টুর কথা ফুরোয় না। বড় হয়ে এই চিড়িয়াখানায় একটা বাড়ি করে ও নিজে থাকবে, বাঘের সঙ্গে ভাব করবে। হরিণ-দের খাওয়াবে। আর হাতির পিঠে চড়ে বসে থাকবে সারা দিন।

চুপ চুপ ঝণ্টু, হালকা সুরে আমি ওকে সাবধান করে দি, এসব কথা এখানে অত জোরে-জোরে বলতে হয় না—তাহলে কী হবে জান ?

কী ?

চিড়িয়াখানার লোকেরা তোমাকে ধরে এখুনি বাঁদরের খাঁচায় পুরে দেবে।

দূর, আমি কি বাঁদর ?

আমরা হাসি কিন্তু এক মনে অনেকক্ষণ কী ভাবে ঝণ্টু। তারপর আবার আমাদের দুজনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলে, সত্যি বলছ পিসি, চিড়িয়াখানার লোকেরা আমাকে এখুনি ধরে নেবে ?

না না, ঝণ্টু, শৈলেন জোর গলায় ওকে আশ্বাস দেয়, কেউ এখন তোমাকে ধরবে না। কেউ ধরতে এলে আমি তাকে মেরে দেব।

না না, কাকু, মের না লক্ষ্মীটি।

শৈলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন ?

হঠাৎ ঝণ্টুর হাসি-হাসি মুখটা ম্লান হয়ে যায়। বাদামের প্লেটের দিকে ও আঙুলও বাড়ায় না। ও শুধু বলে, আমরা আর বাড়ি যাব না। এখানেই থাকব—

কেন, কেন ঝণ্টু?

বাড়িতে মা-বাবা শুধু ঝগড়া করে। সেখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

ঝণ্টুর কথা শুনে আমার বুক দুর দুর করে! একটা অস্বস্তিতে হঠাৎ দিশাহারা হয়ে পড়ি। আর কী কথা বলে ব্যাপারটা চাপা দেব তা-ও হঠাৎ ঠিক করতে পারি না। কিন্তু শৈলেন যেন ওর কথা শুনতে পায় না। চায়ের কাপটা কাছে টেনে নিয়ে চুমুক দিতে থাকে।

আমার কথাও যেন ফুরিয়ে যায়। এখানকার সব আনন্দ কোলাহল জুড়িয়ে আসে। আর এতক্ষণ পর বাড়ির কথা মনে পড়ে। নিজের কথা মনে হয়। আর ভাবি, কতক্ষণ তোমাকে আমি ভুলে ছিলাম!

শৈলেন ঝণ্টুর সঙ্গে অন্য কথা বলে যায়। মাঝে মাঝে তাকায় আমার দিকে। ও বোধ হয় লক্ষ্য করে আমার এই পরিবর্তন। কিন্তু নিজের মুখ ম্লান হয়ে ওঠায় আজ আমি লজ্জা পাই। আমার ভাল লাগে না দ্বন্দ্ব অশান্তি আর স্মৃতির কাঁটা ফোটা এমন চেহারা শৈলেনকে দেখাতে।

চল ঝণ্টু, ওর দিকে তাকিয়ে আমি বলি, এবার বাড়ি যাই?

একটু পরে বিল চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন উঠে দাঁড়ায়, চল। বেরোবার সময় বোধ হয় হয়েছে—এখন একটা ট্যাক্সি পেলে হয়—

আপনি ব্যস্ত হবেন না। একটু হাঁটলেই ট্রাম পাব।

ঝণ্টু, হাঁটতে পারবে?

ট্রাম থেকে নেমে আসবার সময় তো হেঁটেই এল—

ঝণ্টু বলে, এখন আমার পা ব্যথা করছে পিসি।

শৈলেন ওকে কাঁধে তুলে নেয়, এবার কেমন ঝণ্টু বাবু? সব ঠিক আছে?

ঝণ্টু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেও আমি শৈলেনকে বারবার বলি ওকে নামিয়ে দিতে। প্রথম দিনই এত অন্তরঙ্গতা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু একথা আমার মনে হয় বাইরে বেরিয়ে—চারপাশে অনেক লোক দেখে। চিড়িয়াখানার মধ্যে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ শৈলেনের সামনে সহজ হয়ে ওঠার কোন বাধাই যেন আমার ছিল না। কেন এখন আমার এই ক্লান্তি—এই সঙ্কোচ!

ভেবেছিলাম ট্যাক্সি পেলেও নেব না। কারণ এখনও ট্যাক্সি দেখলে আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপে। আমি যথাসম্ভব ট্যাক্সি এড়িয়ে যাই। কিন্তু আজ হাত দেখিয়ে যখন একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামায় শৈলেন তখন আমি তাকে কোন কথাই বলতে পারি না—আমার এই বোকামির কথা ওকে জানাতে ইচ্ছে করে না।

বেশ কাটল আজ, ড্রাইভারকে কোথায় যেতে হবে, বলে শৈলেন তাকায় আমার দিকে, তোমাদের সঙ্গে দেখা না হলে এতক্ষণ আমাকে ক্লান্ত হয়ে একা-একা বাড়ি ফিরতে হত—

এখন ক্লান্তি নেই?

একটুও না।

কোনদিকে থাকেন এখন?

ভবানীপুরে একটা ফ্ল্যাটে, ঝণ্টুর গালে হাত বুলিয়ে শৈলেন বলে, কখনও তো যাওনি আমাদের ওখানে—এবার একদিন সকলে যেও—আমি একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাব তোমাদের, ও হাসে, তা না হলে তো আর যাবে না তোমরা।

আমিও হেসে বলি, কে কে আছেন এখন আপনার বাড়িতে?

মা আছেন, দাদা-বৌদি আছে। আর আমি তো আছিই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানে—ড্রাইভারকে থামতে বলি। বাড়ি এসে গেছে।

ট্যাক্সি থেকে শৈলেনও নেমে দাঁড়ায়। বেশ ঘুম পেয়ে গেছে ঝণ্টুর। ও তাকে হাত ধরে নামিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে শৈলেন এগিয়ে আসে দরজার কাছে। হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেছে ওর মুখ। ওর চেহারা দেখে আমি বুঝে নি সব। একটা খুব জানা জায়গায় একজন মানুষ এসেছে অনেকদিন পর। কিন্তু যাদের কাছে ও আসত আগে—যেন আজ তারা কেউই নেই। সব কিছুই অনেক—অনেক বদলে গেছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শৈলেন, বলে, এবার আমি যাই.?

বাঃ, বসবেন না একটু ?

না না, আজ নয়। শিগগিরই আসব একদিন। বিজন আছে নাকি এখন ?

দাদা অনেক দেরি করে বাড়ি ফেরে—ঝণ্টু ওর বাবার কথা কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পাছে যা-তা কিছু আবার বলে ফেলে বলে আমি একরকম জোর করেই ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দি।

আর দাঁড়ায় না শৈলেন। আবার গিয়ে সেই ট্যাক্সিতে ওঠে। আর যতক্ষণ ট্যাক্সিটা না চলে যায় ততক্ষণ আমি ঘরের মধ্যে যাই না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকি। হেসে হাত নেড়ে বিদায় দি শৈলেনকে। তারপর ক্লান্ত পায়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে ক্লান্তিতে গড়িয়ে পড়ি বিছানায়।

এখন শীত লাগছে। এখন চুপচাপ চারপাশ। ঝণ্টুর গলাও শুনতে পাচ্ছি না। কী ভয়ঙ্কর রকম ক্লান্ত আর করুণ মনে হচ্ছে এই বাড়িটা! চিড়িয়াখানার সব আলো গল্প ভিড়—কিছুই যেন ধরে রাখা যাবে না এখানে। ঝণ্টুই বা গেল কোথায়! বাড়িতে কি আর কোন মানুষ নেই! মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছে। আমি বুঝতে পারছি না মা রান্নাঘরে না ঠাকুর ঘরে। যন্ত্রের মতো এ বাড়ির সব কাজ হয়ে যাচ্ছে—একটি গলার স্বরও শুনতে পাচ্ছি না।

কেন আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে গেল শৈলেন! ও কিছুক্ষণ এই নিঃঝুম পুরীতে বসে কথা বললে হয়তো ওর হাসির দমকে এখানকার সব জড়তা কেটে যেত। চিড়িয়াখানায় হঠাৎ পাওয়া আনন্দ আমি এখানেও কিছুক্ষণের জন্যে ধরে রাখতে পারতাম।

কিন্তু কেউ নেই।

হয়তো একা-একা এমন করে শুয়ে শুধু কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হত আমার। তারপর যথাসময় উঠে রাতের খাওয়া খেয়ে আবার ছটফট করতে হত বিছানায়। কিন্তু হঠাৎ জয়াকে এমন সময় আমার ঘরে আসতে দেখে আমি অবাক হই। আর এতক্ষণ পর কথা বলবার একটা লোক পেয়ে আমার বিমর্ষ ভাবটাও কেটে যায়।

আজকাল সাধারণত এ সময়ে বাড়ি থাকে না জয়া। আজও একটু পরে হয়তো ও বেরিয়ে যাবে। কারণ ওকে দেখে আমার মনে হয় ও বেরোবার আগে-আগে আমার সঙ্গে তু-একটা কথা বলতে এসেছে। হয়তো দাদার বিরুদ্ধে ওর কোন নতুন নালিশ আছে। ওর যা খুশি বলুক। এখন যে কোন মানুষের যে কোন কথা শোনবার জন্যে আমি অধীর হয়ে উঠেছি।

ঠাণ্ডা স্বরে জয়া বলে, আমি আরও আগে চলে যেতাম, কিন্তু শুধু তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি বলে চলে যেতে দেরি হল।

জয়ার কথা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও একটা আশঙ্কা কোথায় যেন সাপের মতো লিকলিক করে ওঠে, কোথায় যাচ্ছ?

কোন ভূমিকা না করে একেবারে সোজা ভাষায় জয়া বলে, প্রথম কিছুদিন আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে থাকব—একটা চাকরি জোগাড় করেছি। পরে নিজের থাকবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নেব নিশ্চয়।

একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে, বৌদি, তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?

আমাকে যেতেই হবে, কোন ভাষা নেই জয়ার চোখে, সে-রাতের পর এতদিন যে এখানে ছিলাম—কেমন করে ছিলাম জানি না।

মা-বাবাকে বলেছ?

জয়া হেসে বলে, না। এবার বলব। আমার সঙ্গে একবার ওপরে যাবে দীপু?

আমি ওর কথার উত্তর দি না। শুধু নিঃশব্দে একটা যন্ত্রের মতো ওর পেছন-পেছন মা-বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। ওঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝন্টু তখন হাত-পা নেড়ে চিড়িয়াখানার গল্প বলে চলেছে। জয়াকে দেখে মা-বাবাও আমার মতো অবাক হন। আর এক মুহূর্তে ঝন্টুও চুপ হয়ে যায়।

মা, অসংযত স্বরে আমি বলে উঠি, বৌদি এখান থেকে আজ চলে যাচ্ছে—আমার কথার মাঝেই জয়া মা-বাবাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়ায়।

আকস্মিক একটা আঘাত লাগে মার বুকে। ওঁর চোখ দেখে বুঝতে পারি উনি বড় বেশি বিচলিত হয়েছেন। আর যেন দিশা হারিয়ে কথা বলতেও ভুলে গেছেন কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকেন বাবা। শুধু ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটে। বাবা অনেকক্ষণ দেখেন জয়াকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর যেন সাবধানে খুব আস্তে পা টিপে-টিপে দরজার দিকে এগিয়ে যায় জয়া। তখন ব্যাকুল চিৎকার করে মা ডাকেন, বৌমা—

জয়া ঘুরে দাঁড়ায়। মুখ তোলে না মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিমূঢ় ঝন্টু সাহস পায় না তার মার কাছে যেতে। আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। একটা সাংঘাতিক কাণ্ড যে ঘটছে এ ঘরে তা বোঝবার ক্ষমতা ওই সাত বছরের ছেলের নেই।

ছি ছি বৌমা, যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন মা, এমন করে

বেরিয়ে যাওয়া কি এ বাড়ির বউ-এর সাজে ? তুমি কেমন করে এমন নির্লজ্জ হতে পারলে ?

মার কথা শেষ হতে না হতেই দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বাবা বলে ওঠেন, নির্লজ্জ বৌমা হয় নি—নির্লজ্জ হয়েছে তোমার আদুরে গোপাল— সেকথা কেন তুমি ভুলে যাও ?

তা বলে বৌমা বাড়ি ছেড়ে যাবে ? আমাদের সম্মানের কথা একবার ভেবেও দেখবে না ?

তোমরা তার কে ? যে সম্পর্ক ঘুচিয়েছে সেই রাস্কেলের খাতিরেই তো বৌমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক। তোমাদের মানসম্মান ওর নিজের আত্মসম্মানের চেয়ে বড় নয়।

বাবার মুখের ওপর হঠাৎ নতুন যুক্তি দেখিয়ে কথা বলতে পারেন না মা। কিন্তু তীক্ষ্ণ বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জয়ার দিকে। চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে জয়া। দাতে দাঁত চেপে মনের সব কোমল বৃত্তিকে যেন পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছে। আশ্চর্য, একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না ঝণ্টুর দিকে।

এবার আর এক অস্ত্র ছাড়েন মা, আর ঝণ্টু ? তাকেও কি তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে ? ওকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না—দেখি তুমি কেমন করে নিয়ে যাও—কয়েক পা এগিয়ে আমার কাছ থেকে দুই হাত বাড়িয়ে ঝণ্টুকে মা যেন ছিনিয়ে নেন।

মুখ না তুলে মৃদু দৃঢ়স্বরে জয়া বলে, আমি কাউকে আমার সঙ্গে নিচ্ছিনা—আমি একাই যাচ্ছি। আর—এবার মাথা তুলে শুকনো চোখে মার দিকে জয়া তাকায়, একটা গয়নাও নিচ্ছিনা—শাড়িও না। এই দেখুন, আমার হাতে শুধু কয়েকটা কাচের চুড়ি—আজই বিকেলে কিনেছি—

জয়ার কথা শুনে চমকে উঠে দাঁড়ান বাবা। রূঢ় কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করেন, গয়নাগুলো তুমি কোথায় রেখে যাচ্ছ বৌমা ?

বাবার কাছ থেকে বোধহয় ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন জয়া আশা করে-

নি। তাই কথা বলতে ইতস্তত করে দু-এক মিনিট, যেখানে থাকে ওগুলো সেইখানেই আছে। আমি আলমারির চাবি টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি—

বাবা ব্যঙ্গের স্বরে বলেন, চমৎকার! ওই রাস্কেলটাকে তুমি আরও কয়েক ধাপ নীচে নামবার সুবিধা করে দিয়ে যাচ্ছ! গয়না-গুলো কার? তোমার না ওর? ওসব তুমি নিয়ে যাও বৌমা।

জয়া মৃদুস্বরে বলে, না। আমি ওকে আমার সঙ্গে দেখা করবার কোন সুযোগ দিতে চাই না।

শান্ত করুণ স্বরে বাবা বলেন, তাই বুঝি তুমি ঝন্টুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও না?

মাথা নিচু করে জয়া বলে, হ্যাঁ।

কেমন মা তুমি, মা বিদ্রূপ করে বলে ওঠেন, যে ছেলেটার জন্যেও তোমার একটু মন কেমন করে না?

কঠিন স্বরে বাবা ধমক দেন মাকে, ওর কোথায় লেগেছে তা তুমি তোমার স্কাউনড্রেল ছেলের স্নেহে অন্ধ হয়ে আছ বলে বুঝতে চাইছ না—

বাধা দিয়ে গজগজ করে ওঠেন মা, এ সব ব্যাপার বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই—আমি বুঝতে চাইও না। কিন্তু স্বামী একটু এদিক-ওদিক করলে সকলকে ভাসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যেও আমি কোন বাহাদুরী দেখতে পাই না।

দেখ না। কে তোমাকে দেখতে বলেছে! তবে দয়া করে একবার বৌমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখতে পাচ্ছ ওর ভেতরটা পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে?

মার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাবা বলতে থাকেন, এ সংসার ওকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে—ও ছেলেকে না নিয়ে যাচ্ছে শুধু শান্তিতে থাকবার জন্যে—পাছে তোমার গুণধর সন্তান ওই ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওকে আবার অপমান করে—

আমি ঝণ্টুকে ছাড়ব না !

আরও জোরে বাবা বলে ওঠেন, কিন্তু বৌমাকে আটকাবার ক্ষমতা নেই। তোমার ছেলের হয়ে ওর হাত ধরে বলতে পার না যে আমি কথা দিচ্ছি, বিজন তোমাকে আর কখনও অপমান করবে না—

ভাঙা-ভাঙা স্বরে জয়া বলে, না না, আমার জন্যে কারুর কোন কষ্ট করবার দরকার নেই—

হা-হা করে বাবা হেসে ওঠেন, তোমার স্বামীকে খুব ভাল করে চিনেছ বৌমা—হাজার কষ্ট করলেও ওকে ফেরাবার আশ্বাস কেউ তোমাকে দিতে পারবে না, হঠাৎ বাবা নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন ঘরের মধ্যে। আমাকে যেন দেখেও দেখেন না।

আপন মনে আস্তে আস্তে উনি বলে যান, যাও বৌমা। আমি তোমাকে বাধা দেব না—আমি ভাল করেই জানি যে তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু গোটা ভবিষ্যৎ আমি যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। রোগে-রোগে ক্ষয় হয়ে যাবে ওই রাস্কেল। আমি যখন থাকব না তখন শেষ পয়সাটাও ও উড়িয়ে দেবে ওর খেয়াল মেটাতে—এরা সব রাস্তায় দাঁড়াবে—তখন ওই নির্লজ্জ অমানুষ হাত পেতে ভিক্ষা নিতে যাবে তোমারই কাছে—

মা এখনও গর্জন করে ওঠেন, এই ভর্ সন্ধ্যেবেলা কী সব যা-তা বকছ তুমি !

একটা ট্যাক্সি ঘন ঘন হর্ন দেয়। চমকে ওঠে জয়া। সব দ্বন্দ্ব জয় করে বলে, এবার আমি যাই—

তোমার সব গয়না নিয়ে যাও বৌমা।

করুণ চোখ তুলে জয়া তাকায় বাবার দিকে, না, আমি পারব না। আমাকে মাপ করবেন বাবা, তাড়াতাড়ি ও এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে।

কী একটা কথা মনে পড়ায় ঝণ্টু হঠাৎ ছুটে যায় ওর মার কাছে,

মা, ও মা, আসবার সময় আমার জন্যে একটা বাঘ আর একটা সিংহ কিনে এনো—সেই নিউ মার্কেটে একদিন দেখেছিলাম ?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়া। শক্ত করে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে থাকে ঝণ্টুর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর ঠক ঠক পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙে। একটু পরেই আমরা ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই।

গালে হাত দিয়ে খাটের ওপর বসে থাকেন বাবা। ঝণ্টুকে ধরে মা দাঁড়িয়ে থাকেন যেমনকার তেমন। চাকর—ঝি এসে ভয়ে-ভয়ে একবার উঁকি মেরে যায়। কারুর মুখেই কথা নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রত্যেককে দেখে ঝণ্টু। কিন্তু এ দৃশ্য ওর ভাল লাগে না। হঠাৎ নিচু হয়ে ও চলে যায় খাটের তলায়। আর একটু পরে গলা ছেড়ে বলে, আমি জলহস্তী হয়েছি—হাপুস হুপুস !

কিন্তু ঝণ্টুর কথা যেন কানে যায় না কারুর।

শুধু বাবা শুয়ে পড়েছেন আর ওঁর এক পাশে ঘুমচ্ছে ঝণ্টু। কিন্তু মা আজ এখনও ওপরে নিজের ঘরে যেতে পারেন নি। আজ ওঁর পক্ষে ঘুমনো খুবই কঠিন। আমি বুঝতে পারি মা দাদার ফেরার অপেক্ষা করছেন। আমিও জেগে আছি দাদারই জন্যে।

বৌদি সত্যি চলে গেল। কিন্তু এ সংসার থেকে জয়ার চলে যাওয়া ওর মৃত্যু নয়। তাই মুখে আমরা যা-ই বলি না কেন, আমরা প্রত্যেকেই আশা করছি যে ও আবার ফিরে আসবে। এ বাড়ির মানুষগুলোর ওপর লজ্জার কাদা ছিটিয়ে দাদার সঙ্গে সব সম্পর্ক হয়তো আদালতের সাহায্য নিয়ে ঘুচিয়ে দেবে না শেষ অবধি।

জয়া বেঁচে আছে—সে থাকবে কোথাও না কোথাও। তাকে চোখের সামনে কোনদিন না কোনদিন দেখতে পাবে কেউ না কেউ। ওর গলার স্বর শুনবে—শরীরের ঘ্রাণ পাবে—ওকে নিয়ে আলোচনা

করবে পাঁচজন। কারণ এই পৃথিবীতেই ও চলা ᐧাকে করবে।

মা এখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। ওঁর সব উত্তেজনা নিতে গেছে। আমার ঘরে খাটের ওপর মা বসে আছেন কিন্তু ওঁর মনটা যেন এখানে নেই—ওটা ঘুরে ঘুরে মরছে ঝড়ের কোন অন্ধকার অরণ্যে জয়ারই পেছন-পেছন। মা কাঁপছেন। মা কাঁদছেন। আশঙ্কায় আর যন্ত্রণায়। লজ্জায় আর সমবেদনায়। ওঁর মুখ দেখে এসব কথা বুঝে নেবার মতো ক্ষমতা এখন আমার হয়েছে। আমি মার খুব কাছে এসে বসি।

কী হবে দীপু এখন? আমার একটা হাত ধরে অসহায় ছোট মেয়ের মতো মা আমাকে জিজ্ঞেস করেন।

যে মা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন দুদিন আগে—এখন নিজের বলা কথাগুলো ওঁর আর মনে পড়ে না—উনি আমার কাছ থেকে হয় তো সেই পুরনো কথাগুলো শোনবার জন্যে একটা শক্ত অবলম্বনের মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেন।

কিন্তু কী কথা বলব আমি!

জয়ার সামনে মা যে কথা একবারও বলতে পারেন নি, সেকথা আমাকে বলেন এতক্ষণ পর, কত কষ্ট হবে বৌমার! একটা সংসার ছেড়ে অন্য নতুন জায়গায় গিয়ে হঠাৎ মানিয়ে নেয়া কি সোজা ব্যাপার!

নিজের ছেলের কথা ভাবছেন না মা—লোকলজ্জার কথাও নয়—মা ভাবছেন জয়ার কথা। হয়তো বাবাও এখন বিছানায় শুয়ে ওই এক কথাই ভাবছেন। আর একবার আমিও ভাবি, জয়া বেঁচে আছে।

দাদাকে এবার একটু শাসন কর মা। ও গিয়ে বৌদিকে ফিরিয়ে আনুক

তোরা কর যা-হয়। আমার কথা কে শুনবে? বৌমা শুনল?

ও · শুপু বৌদিকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও কেন? দাদাকে কিছু বলতে পার না?

মা ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস করে বলেন, বলব।

মাকে একথা বললেও আমি জানি যে কিছুই হবে না। মা হয় তো বোঝাবেন দাদাকে কিন্তু দাদা বুঝবে না। আর বুঝলেও জয়া সহজে ফিরে আসতে চাইবে না এ সংসারে। তার চেয়ে ভাল করে আর কে চিনবে দাদাকে। ভাব মন থেকে দাদা একেবারে দূরে সরে গেছে বলেই তো সব ফেলে সে চলে যেতে পারল। ফেরবার হলে কেউ কি এমন করে যায়।

আমি আর মা—দুজনেই ট্যাক্সির আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠি। দাদা ফিরে এল এখন। একটানা কলিংবেল বেজে চলেছে। আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি পা ফেলে নিচে নামি। আর আমিই আগে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দি।

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে আমাদের দুজনকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দাদা আর আমরাও ওকে দেখি। ওর স্যুট। লাল চোখ। নীল টাই। এলোমেলো চুল। আর ওর মুখের ঝাঁজালো গন্ধও আমাদের নাকে এসে লাগে।

হাসবার চেষ্টা করে দাদা জিজ্ঞেস করে, এ কী! এখনও ঘুমস নি? তুমি জেগে আছ কেন মা? ঝি-চাকর—ওরা সব কোথায় গেল?

থমথমে ভারী স্বরে মা বলেন, বিজু, ওপরে চল।

হ্যাঁ হ্যাঁ চল, দাদা সিঁড়ি টপকে-টপকে ওপরে ওঠে, কী হয়েছে আজ তোমাদের? বাবার শরীর আজ কি বেশি খারাপ হয়েছে?

না, উনি ভালই আছেন।

তাহলে?

দোতালায় দাদার ঘরের সামনাসামনি এসে মা আমাকে বলেন, দীপু, তুই বল।

কী বলব আমি। কেমন করে বলব। মা যেন আমাকে একটা

বিশ্রী অবস্থার মুখোমুখি ঠেলে দেন। এত রাতে অপ্রকৃতিস্থ দাদাকে এ কি একটা বলবার মতো খবর! আমি চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকি।

বুক টান-টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় দাদা, কী হয়েছে দীপু?

যেমন করে বলতে চাই তেমন করে বলতে পারি না। আমার মুখ থেকে যেন হঠাৎ বেরিয়ে যায়, দাদা, বৌদি নেই—

চমকে অস্বাভাবিক স্বরে দাদা বলে ওঠে, জয়া নেই? কী হয়েছে তার?

আলাদা থাকবে বলে এখান থেকে আজ সন্ধ্যেবেলায় বৌদি চলে গেছে।

চমক গোপন করবার কৃত্রিম চেষ্টা করে দাদা বলে, চুলোয় যাক। আর ঝণ্টু?

ওকে রেখে গেছে।

রেখে না গেলে আমি পুলিশ দিয়ে নিয়ে আসতাম। কিন্তু টাকা পয়সা গয়না? সব নিয়ে আমাকে না জানিয়ে চোরের মতো পালিয়েছে, ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে জ্বালতে দাদা বলে, দাঁড়াও আমি ওর চালাকি বার করছি—কাল ঠিক নালিশ করব—

না দাদা, বৌদি কিছুই নিয়ে যায় নি। ওই দেখ, টেবিলের ওপর আলমারির চাবি—

দাদা যেন লাফিয়ে আসে টেবিলের কাছে। থাবা মেরে চাবি তুলে নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে আলমারি খোলে। একটুও হাতড়াতে হয় না তাকে। পরপর গয়নার সব বাক্সগুলো সামনেই সাজানো রয়েছে।

মা হয় তো লক্ষ্য করেন না; কিন্তু আমি দেখি, গয়নার বাক্সগুলো যেমনকার তেমন আছে দেখে খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না দাদার—যেন হেরে যাওয়ার রূঢ় আঘাতে নিষ্প্রভ হয়ে যায় আর বড় করুণ—বড় অসহায় মনে হয় ওকে।

কিন্তু তা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে দাদা। দ্রুত হাতে চাবি ঘুরিয়ে আলমারি বন্ধ করে। চাবির গোছা সাবধানে রাখে বালিশের তলায়। হাসবার চেষ্টা করে আপন মনেই গুন গুন করে গান গায়। জুতো-মোজা খুলতে খুলতে মার আর আমার দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকায়।

বাঁচা গেছে,দাদা যেন আমাদের শুনিয়ে-শুনিয়ে নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়, বাঁচা গেছে! আসুক একবার টাকা চাইতে—ঝণ্টুকে দেখার ছুতো করে যদি কোনদিন আবার ঢোকে এ বাড়িতে—

চুপ কর দাদা।

টাই-এ হাত দিয়ে আমার কথা শুনে দাদা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলতে ভরসা পায় না। শুধু মাকে বলে, এই মা, তুমি কাঁদছ? আরে ছি ছি! অমন একটা—ইয়ের জন্যে কেউ আবার কাঁদে নাকি? এবার আমরা সকলে খুব শান্তিতে থাকব। দেখা যাক না ওর দৌড় কতদূর! ওসব মেয়ের আবার তেজ!

হয়তো দাদাকে কিছু বলবেন বলে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন মা। কিন্তু তিনি যেন কথা বলতেই ভুলে যান। দাদার খাট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু চোখের জল ফেলেন।

আমার আর ভাল লাগে না এ ঘরে থাকতে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মার হাত ধরে তাঁকে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে আসি। এত রাত্রে আর তর্ক-আলোচনায় কাজ নেই। মাকে জোর করে ওপরে নিয়ে যাই।

দাদার ঘরে আলো নিভে যায়। ঠক করে দরজার খিল তোলার শব্দ শুনতে পাই। আর বোধ হয় অকারণেই হিংস্র উল্লাসের কটু স্বাদে হাসির একটা রেখা ফুটে ওঠে আমার মুখে। আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করলেও আজ খুব জব্দ হয়ে গেছে দাদা। ও অনেকক্ষণ ঘুমতে পারবে না কিছুতেই।

সকাল বেলা অনেকক্ষণ রোদ ওঠে না। ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে বারান্দা। ঠাণ্ডা দেয়াল। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে আজ। কিন্তু রোজকার মতো সংসারের কাজ আজও চলছে। শুধু এ বাড়ির সব মানুষগুলোর মুখ থমথমে! খুব দরকার না হলে কথা বলছে না কেউ।

ঝন্টু ওপর-নিচ করছে। মাকে খুঁজছে। মাঝে মাঝে মা মা বলে ডাকছে ও। কিন্তু কাঁদছে না। দাদার দিকে বিষণ্ণ মুখে তাকাচ্ছে। আর ওর বড় বড় দুটো চোখ অভিমান জমা করে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দাদার জন্যেই রাগ করে জয়া এখান থেকে চলে গেছে।

এক সময় আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঝন্টু জিজ্ঞেস করে, মা কখন আসবে?

কী উত্তর ওকে দেব হঠাৎ ঠিক করতে পারি না। ছোট একটা ছেলের কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলতেও আমার বেধে যায়। আমি ভাবি, যে ঝন্টু কাল চুপ করেছিল—ওর মার যাবার সময় একবারও কান্নাকাটি করে নি—আজ হঠাৎ সব ব্যাপারটা বুঝে ও সচেতন হয়ে উঠল কেমন করে।

তবু ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি বলি, তোমার মা ফিরে আসবে ঝন্টু।

কখন?

খুব আস্তে বলি, বিকেলবেলায়।

আমার কথা বিশ্বাস করে না ঝন্টু। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। হয় তো আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় কিন্তু ঠিক সেই সময় মাথার ওপর দুটো চঞ্চল চড়ুই লাফালাফি করে আর একটা পালক উড়ে এসে পড়ে মেঝেতে। সেটা তুলে নেবার জন্যে সব ভুলে ছুটে যায় ঝন্টু।

আপাতত মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে ঝন্টুকে ভোলালেও আমি ভাবি

যে বিকেলবেলা না হলেও একদিন ফিরে আসবেই জয়া। মা-বাবাও হয় তো সেকথাই ভাবেন। আর দাদাও বোধহয় মনে করে ঝণ্টুকে ছেড়ে জয়া আর কদিন বাইরে থাকবে।

আজ দাদা খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠেছে। খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে খাবার টেবিলে। যেন কিছুই হয়নি—এমন একটা ভাব আনবার চেষ্টা করছে মুখে। আর মাঝে মাঝে কাগজ সরিয়ে দেখছে মাকে আর আমাকে।

হয়তো চলে যাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল বলেই এ সংসার থেকে জয়া অনেক আগেই দূরে সরে গিয়েছিল—সব দায়িত্ব কঠোর হয়ে তুলে দিয়েছিল আমাদের হাতে। তাই রোজকার কাজ করবার সময় আমাদের কারুর তার অভাব বোধ করবার সুযোগ নেই।

কিন্তু জয়া সংসারের কোন কাজ না করলেও আজ এ সময় তাকে প্রত্যেকেরই মনে পড়েছে। আর দাদাই বোধ হয় সব চেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। কারণ মেজাজ দেখাবার, ঝগড়া-অপমান করবার আর কেউই এখন রইল না এ বাড়িতে। তাই কারুর সঙ্গেই কথা বলতে পারছে না দাদা। কাউকে আঘাত করতেও পারছে না। নিষ্কর্মা মানুষের মতো কাগজে মুখ গুঁজে একদিকে বসে আছে চুপচাপ। আর হয় তো মনে মনে জয়ারই ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে। একেবারে জুড়িয়ে যেতে কে আর চায়!

জয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাকে চিৎকার করে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন মা! কঠিন শাসনের বেড়া তুলে তাকে আটকে রাখতেই চেয়েছিলেন। বাবা জয়াকে একবারও থাকবার কথা বলতে পারেন নি কারণ ছেলের জন্যে নিজেকে ছোট করতে চাননি তিনি। এবার দাদাকে হয়তো বলবেন যা বলবার।

আর মা এতদিন কিছুই বলেন নি দাদাকে—বলতে পারেন নি। কিন্তু ছক উল্টে দিয়ে জয়া চলে গেছে বলেই মা কাল রাতে জেগে বসেছিলেন দাদাকে বলবার জন্যেই। এবার তাঁকে বলতেই হবে।

এখনও কেউ কোন কথা না বললেও, বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সংসারে একটা বিরাট ছন্দোপতন হয়েছে। একজন জীবন্ত মানুষ যে চোখের সামনে নেই সেকথাটাই বড় হয়ে উঠেছে সকলের মনে। ঠিক এ সময় কারুরই মনে হচ্ছে না কলঙ্ক-অপবাদের কথা—লোকলজ্জার কথা। কেবল একটি কথাই বাজছে চলতে ফিরতে—জয়া **নেই**।

একটা জীবন্ত মানুষ যার গলার স্বর শোনা যেত কাল—যার প্রাণও আছে যেমনকার তেমন—শুধু সে এ সংসারে নেই। সে না থেকে—একটি কথাও না বলে প্রধান হয়ে উঠেছে এ সংসারের সকলের কাছে।

অফিস যাবার আগে-আগে দাদার সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে মা আরম্ভ করেন, কী যে ছেলেমানুষী করিস তোরা!

যেন মার কথার এক বর্ণও পরিষ্কার হয় না দাদার কাছে, কী করলাম?

হুট করে রাত্তির বেলা কোথায় চলে গেল বৌমা—একটু খোঁজ কর—

সে কচি খুকি নয়, স্বরে উষ্মা প্রকাশ করে দাদা, হারিয়ে যাবে নাকি ভেবেছ?

না না, হারিয়ে যাবে কেন?

তাহলে?

মানে, ব্যাপারটা বাইরে ছড়িয়ে যাবার আগে বৌমাকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে হবে তো?

যাকে-তাকে সাধাসাধি করবার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। তোমরা কর যা হয়। এসব ব্যাপারের মধ্যে আমাকে জড়িও না।

বারে, তোদের ব্যাপার। এখন তোরা না মিটমাট করলে কে কি করবে বল?

কারুর কিছু করতে হবে না, রূঢ়স্বরে দাদা বলে, যাক না দুদিন—সুড়সুড় করে ঠিক ফিরে আসবে দেখ।

আর বেশি কথা না বলে মা শুধু বললেন, বৌমা তাড়াতাড়ি ফিরে এলে সব দিক রক্ষা হয় বিজু—

আমি ভেবেছিলাম মা দাদাকে জোর করবেন—মিনতি করবেন বৌদিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। এত অল্প কথা বলে থেমে যাবেন না। আমার যেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে চারপাশ—বিদায়ের করুণ একটা কাঁটা মনে খোঁচা দিচ্ছে বারবার—মারও ঠিক তেমন মনে হচ্ছে। আমি দাদাকে আমার মনের ভাব স্পষ্ট করে জানাতে পারি না, কিন্তু মা পারেন। তবু মা আর কথা বাড়ালেন না। থেমে গেলেন।

দাদা নিশ্চয়ই আর একটু চাপ আশা করেছিল মার কাছ থেকে। মা যদি তাকে আরও জোর করতেন—বারবার বোঝাতেন তাহলে শেষ অবধি হয়তো বৌদির বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলত না দাদা। চুপ করেই থাকত। যেন মার জন্যেই বৌদিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার কথাটা মেনে নিল। যতই অসহায় বোধ করুক দাদা—বৌদির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ভয় যতই প্রবল হোক—এখন অলীক হলেও আর পাঁচজনের সামনে কৌশলে তাকে পৌরুষের দম্ভ বাঁচিয়ে রাখতে হবে বৈকি।

তাই আসলে হেরে গেলেও হারের কথাটা মার কাছে সহজে প্রকাশ করবে না সে। নিজের কাছেও করবে কি-না কে জানে। হয় যেমন ভাবে চলেছে তেমন করে নিজেকে একেবারে ধ্বংস করবে, না-হয় হঠাৎ থেমে পড়ে রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে প্রচ্ছন্ন অনুতাপে আমাদের সকলের কাছে হারের আঘাতের কথাটাই নিজের অজ্ঞাতেই জানিয়ে দেবে।

কিন্তু আজ দাদা আর বৌদির ব্যাপারটা এখানেই চাপা পড়ে গেলে ভাল হত। যদিও মা অল্প কথা বলেছেন বলে আমি নিরাশ হই তবু একটু পরেই মনে হয়, কেউ কোন কথা না বললেই হয়তো দাদা একা-একা আপন মনে নিজের অবস্থা যাচাই করে দেখবার সময়

পড। এখন অন্যের কথায় পরের কাছে দম্ভ বজায় রাখতে ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ করতে হবে।

দাদা অফিসে যাবার সময় বাবা এসে দাঁড়ালেন ওর সামনে। বাবার চেহারা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রুক্ষ কঠিন মুখ। এতটুকু কোমলতার ছায়া নেই চোখে। আমি এখন কল্পনাও করতে পারি না যে এই বাবাই কিছুদিন আগে আমাকে সান্ত্বনার অনেক কথা শুনিয়ে ছিলেন—সহানুভূতির ছোঁয়ায় ওঁর চোখ ভারী হয়ে উঠেছিল।

এখন বাবার চেহারা দেখলেই মনে হয় যে উনি দাদাকে শাসন করবার জন্যেই নিচে নেমে এসেছেন। কাজ ফেলে মা এসে দাঁড়ালেন বাবার পাশে। আমিও রইলাম কাছাকাছি। কিন্তু দাদা মুখ তুলে দেখল না বাবাকে। বাইরে বেরোবার জন্যে পা বাড়াল। আর তখনই বাবা যেন গর্জন করে উঠলেন, দাঁড়াও!

চমকে উঠল দাদা। ঝি-চাকররাও কৌতূহলী হয়ে উঠল। মা উসখুস করতে লাগলেন। আমি স্থির হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা যেন কোন ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে কাঁপছে চারপাশে।

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এসে দাদার মুখের সামনে দাঁড়ালেন বাবা। কিন্তু এখন দাদা নিজেকে সামলে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। হয়তো এই বয়সে সকলের সামনে বাবার কাছে ধমক খাবার লজ্জায় ম্লান মুখে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। বোধ হয় ঝণ্টু কাছাকাছি কোথাও আছে কি-না সে-বিষয়েও নিশ্চিন্ত হতে চাইছে।

সকলকে শুনিয়ে জোরে-জোরে বাবা দাদাকে বলেন, এখন কী করবে ঠিক করেছ?

কী? দাদা শুধ একটা কথাই বলে কিন্তু তাকায় না বাবার দিকে।

মানে, আমি বলছিলাম, ব্যঙ্গের সুর কাঁপে বাবার কথায়, এবার

তো একেবারে নিশ্চিন্ত—কী বল ? এখন বাধা দেবার কেউ নেই—টাকা-পয়সা নিয়ে গোলমাল করবারও কেউ নেই। আর ঝণ্টুর কথা ভাববার মতো কর্তব্যপরায়ণ বাপ তুমি নও। তার জন্যে আমরা রইলাম—দীপু রইল—

ঝণ্টুর দেখাশোনা আমি করব।

বাবা হেসে ওঠেন, ওর সামনে এসব কথা তুলব না বলে আমি ওকে ওপরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি। ও যদি এখানে থাকত তাহলে বোধ হয় হাসত তোমার কথা শুনে। আমাদের কথা না-হয় বাদই দিলাম কিন্তু নিজের ছেলের সামনে তোমার একটু লজ্জা করে না ?

কোন কথা নেই দাদার মুখে। একবার শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে ঘড়ি দেখে। আর আমি তাকিয়ে থাকি বাবার দিকে। বুঝতে পারি না উনি শেষ অবধি কী আদেশ দেবেন দাদাকে। একটা সাংঘাতিক কিছু করবার জন্যেই যে বাবা এ সময় নিচে নেমে এসেছেন সেকথা বুঝতে পেরেছি বলেই আমার ভয় করে।

শোন বিজু, যেমন করে হোক, বৌমাকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি জানতে চাই—পারবে কি-না ?

মা গজগজ করেন, এসব কথা হাটের মাঝে না বলে এক সময় ওকে ঘরে ডেকে নিয়ে বললেই তো হত—

না,হত না, ভারী গলায় বাবা বলেন মাকে, যা জানবার সকলেই জানে। এবার আমিও তাদের জানাতে চাই যে তোমার গুণধর ছেলের কাজে আমার কোন সায় নেই। তাদের ধারণা যে বাড়ি থেকে বাধা পায় না বলে ও যা খুশি তা করে যায়, দাদার দিকে ফিরে বাবা জিজ্ঞেস করেন, আমার কথার উত্তর দাও ?

মাথা ঝাঁকিয়ে এক মিনিটে একটা বোঝা যেন ঘাড় থেকে দাদা নামিয়ে দিতে চায়, আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আর নেই।

কিন্তু তা ভাঙল কে ?

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই নি।

তোমার সে-ক্ষমতা নেই। বৌমাকে এখানে রেখে তুমি যদি সত্যি যেতে পারতে তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না হত না—বুঝলে?

আপনি বললে আমিও চলে যেতে পারি—

বৌমা কারুর বলার অপেক্ষা রাখে নি—

আমি তাকে বলেছিলাম।

খুব বাহাদুরী করেছিলে শয়তান কোথাকার! সেকথা আবার আমাদের সামনে শোনাতে তোমার লজ্জা করছে না?

দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মা ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, বিজুর অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। সব কথা পরে হবে। এখন থাক।

বাবা বলেন, পরে আর কথা বলবার দরকার নেই। বৌমাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। আমি জানতে চাই তুমি পারবে কি না?

আমি পারব না।

কড়া চোখে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকেন বাবা, তোমাকে পারতেই হবে।

এবার দাদারও মেজাজ ঠিক থাকে না, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করতে পারব না। আমি এখান থেকে চলে যাব। তারপর আপনাদের যা খুশি আপনারা তাই করবেন—আর একবার ঘড়ি দেখে গটগট করে দাদা অফিসে বেরিয়ে যায়।

রাগে চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে বাবার। হিংস্র দৃষ্টিতে মা এবার দেখেন বাবাকে। কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াবার ইচ্ছে হয় না আমার। আমি চলে আসি বাবার ঘরে ঝন্টুর কাছে। সে তখন একমনে ছবির বই দেখছে। আমাকে চোখ তুলে দেখে না। ও নিজের মনে ভুলে আছে বলে আমি কথা বলে ওর ধ্যান ভাঙাই না। বাবার ঘরের পাশে সরু বারান্দায় এসে দাঁড়াই।

তা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি এখন। এ বাড়ির কোন

ঘরে আমার যাবার উপায় নেই। প্রত্যেক ঘরে যন্ত্রণার ছাপ—প্রত্যেক ঘরে অশান্তির কাঁটা।

আমার ঘরে অশরীরীর মতো তোমার আনাগোনা। দাদার ঘরে শূন্যতার হিম। আর মা-বাবার মধ্যেও এবার চলবে মান-অভিমান কথা কাটাকাটি। কাজেই কোথায় যাব আমি? কার কাছে যাব! একটা জীবন্ত মানুষ শুধু আমারই জন্যে কোথায় খুঁজে বেড়াব! না, একান্ত আমার বলে কেউ নেই এ পৃথিবীতে।

কিন্তু অন্য কারুর কথা নয়, আমার নিজের ভাবনা আমি নিজেই এখন ভাবতে পারি না বেশিক্ষণ। আমার সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে দাদা আর বৌদির কথাই আমার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে।

বাবার শাসন ব্যর্থ হবে। দাদা এখন বৌদিকে ফিরিয়ে আনবার আর কোন চেষ্টাই করবে না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে জয়াকে ঘরে না দেখতে পেয়ে আর সে এ বাড়িতে আর নেই সেকথা ভেবে অনুতাপের যে আগুন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছিল দাদার মনে, বাবার শাসনে তা দপ করে একেবারেই নিভে গেছে। এখন স্বাভাবিক বেদনা বোধের চেয়ে দাদার কাছে নিজের জেদটাই বড় হয়ে উঠবে। ইচ্ছে থাকলেও বৌদির কাছে হার স্বীকার করে দাদা আর তাকে ফিরিয়ে আনতে যাবে না।

অল্প অল্প রোদ উঠছে। বাঁশি বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সেই পুরনো বুড়ো বেলুনওলা। হেঁকে যাচ্ছে ফলওলা। ঝন্টু ঘরের ভেতর এখনও বই দেখে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করে ওকে নিয়ে সব ভুলে থাকি। কিন্তু এখন ঝন্টু ফিরেও দেখে না আমার দিকে।

আজ ওকে নিয়ে আবার আমার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে! একদিনের ঝড়েই ম্লান হয়ে গেছে চিড়িয়াখানার স্মৃতি। মনে হয় যেন কতদিন আগে সেখানে গিয়েছিলাম—কতদিন আগে দেখা হয়েছিল শৈলেনের সঙ্গে!

বারান্দায় একা-একা দাঁড়িয়ে আমার শৈলেনের কথাই মনে পড়ে বার বার। আমাকে আর ঝণ্টুকে ও এ বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যাক দূরে কোথাও—সব ভুলিয়ে দিক। হালকা কথায় আর হাসিতে ভাসিয়ে দিক সব কলহের ঝাঁজ—ভেঙে দিক সংকীর্ণ সংসারের নড়বড়ে বেড়া। এখানে থাকতে হলে আমি শুকিয়ে-শুকিয়ে শেষ হয়ে যাব একদিন।

কিন্তু ঝাঁজে আর উত্তাপে আমার অলস মন হঠাৎ যেন গতির সন্ধান পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এক-একটা ঘর গম্ভীর ভ্রূকুটি করে আমাকে কেবলই বাইরে ঠেলে দিচ্ছে—যেখানে আছে অনেক মানুষের ভিড়—চঞ্চল কোলাহল আর স্বাধীনতার অবাধ আনন্দ।

হঠাৎ বই ফেলে ঝণ্টুও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ইচ্ছে করেই বোধহয় ও আমাকে দেখে না। তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। এক-একটা ট্যাক্সি কিম্বা গাড়ি এলে ঝুঁকে-ঝুঁকে দেখে। তারপর ঘাড় হেলিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝগড়া-তর্ক নয়, কোন সমস্যার সমাধান কিম্বা নির্জন কান্নার কথাও নয়—হালকা সহজ কথায় শীতের সব জড়তা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে আমি নিজেই এসে দাঁড়াই ঝণ্টুর পাশে। ওর মাথায় আমার একটা হাত রাখি।

আজ বেড়াতে যাবে না ঝণ্টু?

এক মুহূর্তেই চেহারাটা বদলে যায় ঝণ্টুর, কোথায়?

তুমি বল কোথায় যাবে?

একবার মাথায় হাত দেয়, একবার নাক চুলকোয় ঝণ্টু। কোথায় যাবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। তারপর সরে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মাথা তুলে তাকায় আমার দিকে। যেন আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই ও যাবে—বাড়ির বাইরে যেখানেই হোক।

কালকের সেই কাকুটাকে তোমার মনে আছে ঝণ্টু?

হ্যাঁ, আমাকে চানাচুর দিয়েছিল, হয়তো চানাচুরের লোভেই ও বলে, আজ আবার চিড়িয়াখা... যাবে পিসি ?

আমি হেসে বলি, আজ তো কাকু সেখানে যাবে না ঝণ্টু।

কোথায় যাবে কাকু ? আমরাও সেখানে যাব পিসি।

কাকু আমাদের বাড়িতে আসবে। তখন আমরা কাকুকে জিজ্ঞেস করব যে কাকুটা কোথায় যাবে। তারপর আমরা সকলে সেখানে যাব।

কাকু কখন আস... ...মরা যেখানে যাব সেখানে চানাচুর পাওয়া যায় ?

ঝণ্টুর সব কথা... ...য়ে শুধু বলি, কত জিনিস পাওয়া যায় ! কাকু তোম... ...দেবে।

খুশিতে জ্বল জ্ব... ...র চোখ। আর এখন বোধ হয় রেলিঙে ঝুঁকে ও ওর ... কি-না দেখে না—হয়তো ভাবে যে শৈলেনও এসে পড়তে... ...। আর এই নিঃঝুম বাড়ি থেকে ওকে এমন এক জায়... ...যাবার ক্ষমতা আছে শৈলেনের যেখানে ওর মনের মতো ... পাওয়া যায়।

ঠাণ্ডা ভিজে রোদ কাঁ... ...তাপ নেই কিন্তু কী মিষ্টি এই রোদ ! আমি মাথা ... আকাশে হঠাৎ ঘুম ভাঙা সূর্যকে দেখি। আর এ... ...মনে কাল তুপুরের দেখা সব দৃশ্যগুলো কাঁপা-কাঁপা ...ট ওঠে।

আর তখন আমিও এ... ...টার মতো বিশাল হয়ে উঠতে চাই। সদ্য ঘুম ভ... ...আর কণিকা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দিতে চাই পৃথিবী... ...তোই বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক দূরে চোখ ফেলে ... করি।

এখন তার কথা ভ... ...রে না। বুক কাঁপে না। সব কিছুর মধ্যে এক ... ...য়ের মতো আমি যেন দৈবের নির্দেশ খুঁজে পা... ...হই—অধীর হই আমার

দুর্ভাগ্যের বোঝা নামিয়ে জীবনের সহজ আলোয় নিজেকে ভুলে ধরবার জন্যে।

কে আমাকে কাল চিড়িয়াখানায় ... নিয়ে গেল? কে আমার সামনে এনে দাঁড় করাল শৈলেনকে? কে আজ বার বার আমাকে বলে দিচ্ছে যে শুধু ঝণ্টুকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে নয়—আমাকেও এই হঠাৎ জটিল হয়ে ওঠা সংসার থেকে, অসংখ্য মানুষের করুণা থেকে আর মনের এই তুষার ঝরা অবসাদ থেকে এক মাত্র শৈলেনই মুক্তি দিতে পারে—ফিরিয়ে দিতে পারে অসময়... য়ে যাওয়া কৃষ্ণচূড়া জ্বলা দিন... —আবার প্রথম থেকে ... মেলে ধরবার সুযোগ একমাত্র ... দিতে পারে আমাকে।

শৈলেন বেঁচে আছে। এখন ... পর দিন ও ঘোরা-ফেরা করবে আমার চোখের সামনে ... ওকে দেখব। আর দেখতে দেখতে নিজের মনে ... আমার সঙ্গে।

আর একটু এদিক-ওদিক ... গাড়িটা যে একেবারে অন্য রকম হত। আমাকে ... কাঁদাতে হত না - মৃত্যুর ছায়ায়-ছায়ায় বিচরণ করে ... নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত না প্রেতচ্ছায়া ... মতো—এ... ... নায় সারা রাত ভুলিয়ে রাখতে হত না। মনকে—...

কিন্তু যা হবার তা হবে ... ভুলোনো খেলাও ফুরিয়েছে আমার। দাদা-বৌদি ... সংসারে শান্তি নেই বলে আমি হঠাৎ খুশি হয়ে ... ল দেয়ালে শান্তির ছায়া খেলবে, আমি কি এত ... লেনকে আমন্ত্রণ জানাতে পারতাম!

না। তাহলে ... এত কথা এমন করে আমি কোন কথা আমাকে বলে ... ভয়ে কুঁকড়ে-কুঁকড়ে ফাল্গুনের হলুদ সোনা রোদের মতো ... যেতাম। আর স্থবির আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। ... র চারপাশের পৃথিবীর

দুঃখ যন্ত্রণা আনন্দ আর কত রঙ! স্বাদ গ্রহণ করবার কিম্বা ভাগ নেবার কোন অবকাশ আমি আর এ জীবনে পেতাম না।

একদিকে ঝণ্টু। আর একদিকে আমি। দুজনেই চুপ। বেলা বাড়তে থাকে। রোদের তেজও। হয়তো নিচে এতক্ষণ মা বাবাকে বকছেন—দাদাকে সকাল বেলা রূঢ় ভাষায় গালাগাল করবার জন্যে শাসাচ্ছেন। কিন্তু আমরা কেউই রাখিনা সে খবর। একটি মানুষের কথা মনে করে আমরা দুজনেই যেন প্রতিদিনের ছোট তুচ্ছ সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে অনেক ওপরে উঠে গেছি।

ইচ্ছে হলেও আমি কথা বলি না ঝণ্টুর সঙ্গে। ও আনন্দ পাক ওর নতুন কাকুর কথা ভেবে। মা-বাবার কথা ভুলে যাক। ওর কচি মনেও ফুটে উঠুক কালকের টুকরো-টুকরো স্মৃতি।

আর আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সাহসে বুক বাঁধি। শৈলেনকে গ্রহণ করবার জন্যে সব দ্বিধা ঠেলে উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করি।

রে না। বুক কাঁপে ...

নয়ের মতো আমি যেন

হই—অধীর হই আমার

॥ পাঁচ ॥

একটা কঠিন অসুখ থেকে হঠাৎ যদি কেউ সেরে ওঠে তাহলে তার মনের অবস্থা যেমন হয় প্রথম-প্রথম—সব মিলিয়ে আমার অবস্থাও এখন ঠিক তেমনি। আবার উঠে বসেছি। আবার চলাফেরা করছি। আবার সহজ হয়ে উঠেছি। আর সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সুস্থ মানুষের মতোই সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও যেন লাভ করেছি আমি।

আমার মনে আকাশ-ঢালা খুশির জোয়ার এসেছে বলে এখন এ সংসারের কোন দৈন্য, কোন কার্পণ্য, কোন অশান্তি আমার শিরায়-আর অশান্তি আনতে পারে না। এখন সারাদিন আমি শুধু শৈলে-নের প্রতীক্ষা করি।

ও আসে। যদিও এসেই দাদার খোঁজ করে প্রথমে—কিন্তু আমি জানি, ও আমাকে দেখতেই আসে। কারণ একদিনও দাদার দেখা না পেলে ফিরে যায় না শৈলেন। আমার সঙ্গে গল্প করে। কৌশলে সান্ত্বনা দেয়। ভুলিয়ে দিতে চায় আমার অতীত।

হয় তো নিষ্ঠুরের মতো প্রেমাংশুকে একেবারে অস্বীকার করাতে চায় না ও, শুধু আমার জীবনের বিপর্যয় মুছে দিতে চায়। কিন্তু ও বুঝতে পারে না যে দিনের পর দিন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মরে-মরে আজ আমার গোটা অতীতটাই একেবারে উড়িয়ে দিয়ে আমি বাঁচবার জন্যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছি। আর একটি দিন একটি রাত একটি মুহূর্ত ব্যর্থ করার ক্ষীণতম ইচ্ছে আমার নেই। কেন এখনও একেবারে স্পষ্ট করে কোন কথা আমাকে বলে না শৈলেন! কেন নিজেও এই ফাল্গুনের হলুদ সোনা রোদের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা আমার কাছে। আমি ধৈর্য ধরতে পারি না।

দুঃখ যন্ত্রণা আর কেমন করে! অনেক—অনেকদিন রোগ ভোগের ক্লান্তি আমাকে যেন পঙ্গু অক্ষম করে রেখেছিল। আমি দেখতে পারিনি শীতের ভোরে ঘাসের ওপর সারা রাত ঝরা শিশিরের টলোমলো মুক্ত বিন্দু। আমি পড়তে পারিনি মধ্যাহ্নের আকাশের বিলিয়ে দেবার ভাষা। সন্ধ্যার কুয়াশা, রাতের অন্ধকার কোন সঙ্কেত পাঠাতে পারেনি আমার কাছে।

তাই আজ ফাল্গুনের এক-একটি মুহূর্ত আমাকে শুধু চঞ্চল করে আর প্রতীক্ষা কাতর করে তোলে—কখন শৈলেন আসবে। কিন্তু ও আসে দিন শেষ হয়ে গেলে—ও আসে হালকা অন্ধকারে প্রথম আলোর মতো। তখন হাওয়ায় শীত শীত স্পর্শ থাকে। তখন দূরের পার্কে আলো জ্বলে উঠলেও কুয়াশার কাটা-কাটা জাল বিছানো থাকে এখানে ওখানে।

বিকেল হতে না হতেই ঝন্টু দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে। এ বাড়ির আর কেউ জানুক বা না জানুক, একমাত্র ও ই জানে—আমি না বললেও, ছোট্ট মানুষটি যেন কেমন করে বুঝে নেয় যে শৈলেন এসেছে—এ খবর আমাকে ছুটে এসে দিতে পারলে আমি সব চেয়ে বেশি খুশি হই। আর আমিও ওকে প্রশ্রয় দি। আমি যে খুশি হয়েছি সেকথা ওকে বোঝাবার প্রচুর সুযোগ দি ভাবে-ভঙ্গিতে।

আজ বিকেল থেকে আকাশের যত দূর আমার সরু বারান্দা থেকে দেখা যায় তত দূর অদ্ভুত ভিজে-ভিজে মনে হচ্ছিল। ফাল্গুনের মিঠে রোদ বিকেল ফুরোবার অনেক আগেই মুছে গেছে। বাতাস যেন অনেক দূর থেকে জলের ঝাপটায় ভারী হয়ে ছুটে আসছে।

কিন্তু এখন কিছুতেই যেন বৃষ্টি না আসে। আগে এসে পড়ুক শৈলেন—তারপর ভারী জল নামুক। আকাশ ভেঙে পড়ুক। তাহলে এখান থেকে ফিরে যাবার কোন উপায় থাকবে না ওর। একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপন মনেই হাসলাম।

আমাকে হাসতে দেখলেন মা। আমি তখন আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে দেখছি মুখে বেশি মাত্রায় পাউডার পড়েছে কি-না। মা-ও হাসলেন। আমার হাসির অর্থ বুঝতে পেরেছেন বলেই হয় তো হাসলেন, কারণ উনি আজকাল রোজই আমাকে ঠিক সময় একজন বিশেষ মানুষের জন্যে প্রস্তুত হতে দেখেন।

মা বলেন, একদিন শৈলেনকে খেতে বল দীপা। রোজ-রোজ কষ্ট করে এতদূর আসে মানুষটা—

মাকে বাধা দিয়ে বলি, একদিন বললেই হবে। এত ব্যস্ত হবার দরকার কী।

মাকে তাড়াতাড়ি আমি থামিয়ে দি। আর ঠিক এ সময় উনি আমাকে লক্ষ্য করেছেন ভেবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রথম কৈশোর-কাঁপা একজন মেয়ের মতো ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আমাকেও ভীরু লাজুক করে তোলে। আমি এখন মাকে এড়াতে চাই।

জানিস দীপা, হঠাৎ মা যেন সহজ হয়ে ওঠেন আমার কাছে, শৈলেনের কিন্তু তোকে বরাবরই খুব পছন্দ। ও তখন বিজুর কাছে প্রায়ই আসত এ বাড়িতে—

মার কথা শেষ হয় না। দুপ দুপ করে ঝন্টু ছুটে এসে জোরে জোরে বলে, পিসি, ও পিসি, কাকু এসেছে—আমার হাত ধরে ও টানে।

আমি ঝন্টুর হাত ছাড়িয়ে বলি, তুমি একটু গল্প কর—আমি আসছি—

আমার কথা শেষ হবার আগেই আবার ছুটে চলে যায় ঝন্টু। কারুর দিকে তাকায় না।

এখনও মা আছেন এ ঘরে। আর আমি আজ যেন ওঁর কাছে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে গেছি। প্রসাধন সম্পূর্ণ করতে সঙ্কোচ হয় আমার। আর আজ প্রথম আমি মার সামনে দিয়ে শৈলেনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না।

যা দীপা।

তুমি যাবে না মা ?

তুই যা-না। তোর বাবার শরীরটা আজ একেবারেই ভাল নেই। যদি পারি তো পরে যাব—

মা এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

এতক্ষণ মনটা বেশ ভাল ছিল আমার। একা-একা নির্জনে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলাম। আমার মনের খবর কেউ রাখে না ভেবেই নিজে-নিজে একটা স্বেচ্ছাচারণের জগৎ গড়ে নিয়ে তৃপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু মা যেন আমার সেই জগতে হঠাৎ প্রবেশ করে মুঠো-মুঠো অন্ধকার ছড়িয়ে দিলেন। আর তাঁর কথা শুনে আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। মা আমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

কোন বাধা নেই—কোন প্রতিবন্ধক নেই আমায় সামনে এগিয়ে যাবার। আমার মান-অভিমান নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ—সকলে শৈলেনের প্রশংসা করবে—আমার একটা গতি করে দিয়েছে বলে তাকে মহৎ বলবে। আর তখন নারীত্বের কোন দম্ভ নিয়ে তার সামনে দাঁড়াব আমি! একবার ভাবলাম, ও ফিরে যাক। কিম্বা ওপরে এসে মা-বাবার সঙ্গে গল্প করুক যতক্ষণ খুশি। আমার কাঙালপনা নিয়ে কেউ যেন কোনদিনও আমাকে বিদ্রূপ করবার সুযোগ না পায়। আমি থাকি যেমন আছি তেমন।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ কী ভয়ঙ্কর দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি! আমার মেয়েলি দম্ভকেও বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিতে পারি না। সব ভুলে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এসে শৈলেনের সামনে দাঁড়াই।

কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা বলবার অবসর পায় না শৈলেন। প্রশ্নে-প্রশ্নে ঝন্টু ওকে মাতিয়ে রেখেছে। হাতীরা জঙ্গলে কী খায়? ঘোড়ারা বসে না কেন? আমরাও সত্যি কি আগে বাঁদর ছিলাম? ওর প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিয়ে যায় শৈলেন। আর মুখ তুলে আমাকে দেখে শুধু হাসে।

আজ বেড়াতে যাবে কাকু? এখন এখানে বসে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। পিসি, চল না, আমরা কাকুর সঙ্গে বেড়িয়ে আসি? ঝণ্টু আমার কাছে এসে আর একবার বলে, চল?

ওর কথার উত্তর দিতে বেশ দেরি হয় আমার। এখন বাইরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি। যেকথা এখনও আমাকে বলে নি শৈলেন সেকথা এখানে বসে যত সহজে হঠাৎ এক সময় বলতে পারবে, বাইরে লোকের কোলাহলে তা বলা অনেক কঠিন। এখন ঝণ্টুর উপদ্রব ভাল লাগছে না আমার। ও সরে গেলে আমি যেন শৈলেনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি।

যাবে? শৈলেন মুখে অল্প-অল্প হাসি ফুটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে।

আমি ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে বলি, আজ বৃষ্টি আসতে পারে ঝণ্টু। আজ থাক।

আমরা আর একদিন যাব ঝণ্টু, মিষ্টি সুরে শৈলেন বলে, কেমন আছ দীপা?

কাল তো দেখে গেলেন।

তা বলে আজ খবর নেব না কেন? আজ কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি কালকের চেয়ে অনেক ভাল আছ।

বিমর্ষ হয়ে বসে আছে ঝণ্টু। অল্প-অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অন্ধকার নেমেছে এখন। কিন্তু শৈলেনের স্বরে সমবেদনার রেশ হঠাৎ আমাকে যেন নিভিয়ে দেয়। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দি আমি। সঙ্কোচের ভারে কুঁকড়ে বসে থাকি চুপচাপ। যেন আমি একটা বিরাট অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছি—যা করবার আমার অধিকার নেই তা করবার জন্যে নির্লজ্জের মতো এগিয়ে চলেছি। আমি তাকাতে পারি না শৈলেনের দিকে—ঝণ্টুকে নিজের কাছে টেনে রাখি। কিন্তু ও এখন থাকতে চায় না আমার কাছে। ছটফট করে। তারপর আস্তে আস্তে এ ঘর থেকে বেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

আমি এতদিন এলাম, এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন একটা কৈফিয়ৎ চায় শৈলেন, একদিনও বিজনের সঙ্গে দেখা হল না, একটু থেমে ও বলে, ও জানে না যে আমি প্রায়ই আসি এখানে?

হ্যাঁ, আমি বলেছি।

কি বলে বিজন?

জিজ্ঞেস করে আপনাকে কেমন করে আবিষ্কার করলাম। কিন্তু —শৈলেনের সঙ্গে পারিবারিক আলোচনার সূত্র ধরে আরও ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছায় আমি বলি, মনে হয় দাদা বোধ হয় আপনাকে এড়িয়ে যেতে চায়।

চমকে ওঠে শৈলেন, আমাকে? কেন বল তো দীপা?

শুধু আপনাকে নয়, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আমি বলি, আমাদের সকলকেই দাদা আজকাল এড়িয়ে চলতে চায়।

কিন্তু কেন?

বৌদি এখান থেকে চলে গেছে। দাদা মুখে যদিও কিছু বলে না, কিন্তু আমি ওকে দেখলে বুঝতে পারি যে ওর মনে একটুও শান্তি নেই।

তারপর আমি আস্তে আস্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাদা আর বৌদির ব্যাপারটা শোনাই শৈলেনকে। আর কথা শেষ করে ও কি বলে সব শুনে তার অপেক্ষা করি। কিন্তু অনেকক্ষণ কোন কথা বলে না শৈলেন। অদ্ভুত চেহারা করে বসে থাকে চুপচাপ। যেন সব ব্যাপারটার জন্যে সে-ই দায়ী।

একটু পরে হেসে ওঠে শৈলেন। সমবেদনার স্বাভাবিক হাসি নয়—শ্লেষের হাসি। বন্ধুর বিপক্ষে একটা কথাও বলে না শৈলেন, ও যেন বিদ্রূপ করে জয়াকে। আর তখন, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ও আমার মন থেকে দূরে চলে যায়।

আমি বিজনের স্ত্রীকে দেখি নি, শৈলেন বলে, হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হবে না। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, আমি বুঝতে পারি না, চলে গিয়ে কী তিনি পাবেন।

আমিও মাত্র কয়েক দিন আগে ঠিক এমন কথাই ভেবেছি। কিন্তু আজ শৈলেনের কথায় সায় না দিয়ে আমি মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানাই. কিন্তু যেখানে তার কোন সমাদব নেই সেখানে থেকেই বা সে কী পেত বলতে পারেন?

ছেলে না থাকলে হয় তো আমাব কিছুই বলবার থাকত না কিন্তু ঝণ্টু যখন আছে তখন তাকে নিয়েই তো তিনি সব তুচ্ছ করতে পারতেন। ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যেতে পারলেন না—পালিয়ে গেলেন।

ছেলেকে ছেড়ে যখন গেছে তখন বুঝতে পারছেন না কী ভীষণ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তাকে যেতে হয়েছে?

বুঝতে পারব না কেন দীপা—আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এই ভাঙন আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না; আমি হলে চোখ কান বন্ধ করেই থাকতাম—নিজেকে সরিয়ে নিতাম কিন্তু সংসার ছেড়ে যেতাম না।

আর দাদা? সে একটু নরম হলেই তো সব দিক রক্ষা হত। তার বেলায় একটা কথাও তো বলেন না আপনারা।

এবার শান্ত হাসি হেসে শৈলেন বলে. ঘর সাজায় কারা? ছেলেরা না মেয়েরা?

কিন্তু ঘরই যদি না থাকে তাহলে কার জন্যে কী সাজাবে মেয়েরা! আর কেউ না জানুক, আমি জানি যে বৌদি ঘর সাজাবার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই বসেছিল।

পরের ব্যাপারে বেশি কথা বলা উচিত নয় ভেবে শৈলেন থেমে যায়। আমিও নিজেকে সংযত করি। কিন্তু এখন আমার এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। ঝণ্টুর কথা শুনে যেন বেরিয়ে গেলেই ভাল হত তখন। এসব টুকরো-টুকরো ঘরোয়া কথার চাপে তাহলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত না—আমাকে অন্য কথা শোনাতে পারত শৈলেন। একবার ভাবলাম ওপরে গিয়ে জোর

করে মাকে নিচে টেনে আনি—শৈলেনের সামনে বসিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দি।

কিন্তু মা কারুর সামনে আসতে চান না আজকাল। সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকেন পাছে দাদা-বৌদির কথা উঠে পড়ে। এ যেন একটা কলঙ্ক আর তার জন্যে সমস্ত লজ্জাই মার একার প্রাপ্য।

সকলেরই হয় তো অল্প-অল্প ভয় আছে—সঙ্কোচ আছে—শুধু আমার কিছু নেই। যত বড় বিপর্যয় নেমে আসুক সংসারে—কোন বিশ্বাস না থাকলেও শুধু একটি বিশ্বাস আমার মনে সব চেয়ে প্রধান হয়ে আছে যে কোন কিছুই কারুর জীবন আমার মতো শুষ্ক রিক্ত অসহায় করে তুলতে পারে না। সে-লজ্জা—সে-সঙ্কোচ যখন আমি নিজে জয় করতে পেরেছি তখন সকলেই সব কিছু অতিক্রম করতে পারবে।

বিনা প্রয়োজনে জয়ার সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করে ফেলেছে ভেবে হয় তো মনে মনে লজ্জা পায় শৈলেন। তাই একটু পরে আবার সে-কথাই অনেক নরম স্বরে তোলে। কিন্তু কে এসব কথা শুনতে চায়? কে বুঝতে চায় সংসার-পরিচালনার গভীর তথ্যের কথা? হঠাৎ বৃষ্টির ছোঁয়া লাগা ফাল্গুনের সন্ধ্যায় এসব তথ্য কথা শোনবার জন্যেই কি আমি বসেছি আমার প্রথম যৌবনের এক পুরনো বন্ধুর সামনে? এই সহজ কথাটা বোঝবার মতো বুদ্ধি ওর নেই কেন! হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ওকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে আমার।

খুব আস্তে আস্তে শৈলেন কথা বলে, কিছু মনে কর না দীপা, এসব ব্যাপারে আমার কোন কথা বলবার অধিকার নেই। তবে আজকাল ঘরে-ঘরে এসব ঘটছে বলে আমি মনে মনে মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত ধরনের পীড়া অনুভব করি।

কেন? এই তথ্য কথা উড়িয়ে দেবার জন্যে আমি হালকা স্বরে হেসে বলি, এসব কথা নিয়ে ভাবনা করবারও তো কোন

অধিকার নেই আপনার। নিজে তো ঘর সাজাবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না এখনও—

আমার দিকে এক দৃষ্টিতে দু-এক মিনিট তাকিয়ে থাকে শৈলেন, কিন্তু ব্যবস্থা করিনি বলেই তো আজ বোধহয় জীবনের এক জটিল দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা এড়িয়ে তোমার সামনে এসে বসতে পেরেছি।

ওর কথায় একটা নরম-নরম স্পর্শ আছে। যদিও আমার কাছে ওর কথা একেবারে স্পষ্ট হয় না তবুও ইঙ্গিত পাই ওর মনের। নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছি বলেই আমার মনে হয় যে এতদিন বিয়ে করে নি বলেই আজ অসঙ্কোচে শৈলেন আমার কাছে আসতে পেরেছে। কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও আরও কথা বলবে—আরও মন খুলবে—আর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমার কাছে।

হয় তো আজই আমি যে কথা শুনতে চাই তা শুনতে পেতাম। তারপর রাতের নির্জনতায় একা-একা বিছানায় শুয়ে কল্পনা করে নিতে পারতাম আমার আর এক নতুন জগৎ। একটা নিষ্ঠুর বন্য আনন্দে ভরে উঠত আমার মন। আর আপনমনেই আমি স্বাদ পেতাম একটা রক্ত-মাংসের মানুষের। কিন্তু সে-জগৎ রচনা করা হলনা আমার।

হয়তো ঝন্টুই আজ জোর করে মাকে নিয়ে আসে এ ঘরে। উঠে দাঁড়ায় শৈলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে মাকে অনুরোধ করে বসতে। কিন্তু মা বসেন না। শৈলেনের দিকে তাকিয়ে শুধু ম্লান হাসেন।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে শৈলেন, কেমন আছেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মা, তুমি কেমন আছ বাবা?

ভালই। এবার কিন্তু আপনাদের সকলকে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে একদিন, শৈলেন হেসে বলে, আশ্চর্য, বিজনের সঙ্গে এখনও দেখা হল না আমার—

দাদার কথা উঠতেই বিচলিত হয়ে মা বলেন, ও একটু দেরি করে ফেরে কি-না আজকাল—আচ্ছা, আমি তোমার কথা ওকে বলব। এই দীপা, কী মেয়ে তুই! একটু চায়ের ব্যবস্থা করলি না এখনও শৈলেনের জন্যে?

আমি উঠে দাঁড়াতেই শৈলেন বাধা দেয়, রোজই তো চা খাই এখানে। কিন্তু আজ না। আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি উঠব।

আমি আস্তে বলি, বসুন না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন! আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলেন, তবু তুমি আস বলে আজকাল দীপার মুখে হাসি দেখতে পাই। সবই তো শুনেছ। আর কী বলব! এখন তুমি ওকে সব ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা কর। তাহলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

আবার মার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে আমি শুনতে পাই না। কিন্তু শৈলেন মাকে কোন আশ্বাস দেবার আগেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ঝণ্টুকেও নিয়ে যান সঙ্গে করে। শুধু সে-ঘরে আমরা দুজন বসে থাকি চুপচাপ।

এখন আমার সম্পর্কে শৈলেনের কী মনে হচ্ছে তা ভেবে আমি যেন ঝিমিয়ে থাকি। তার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না আমার আর কোন কথা বলবার ক্ষমতাও যেন থাকে না। এ কী করলেন মা! কেন এমন করে আমাকে এক সর্বহারা অসহায় মেয়ের মতো ছোট করলেন ওর কাছে! এমন করে শৈলেনের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে আমি কোনদিনও চাইনি।

এই বয়সে মার হয়তো বোঝবার ক্ষমতা নেই যে আমি আমার বাইরের অবস্থার কথা ভেবে শুধু একটা অবলম্বন হিসেবে কারুর কাছে আশ্রয় চাই না। এক ভয়ঙ্কর আগুনের দাহে দিশাহারা হয়েই আবার নতুন করে বাঁচতে চাই। হয় তো সে-আগুনের কথা প্রকাশ করলে লোকে আমার নিন্দা করবে কিন্তু কৃপা করবে না।

আর মা যেমন করে আজ শৈলেনকে সব বললেন তা শুনে কী মনে হবে তার! সে আমার নিন্দা করবে না কিন্তু করুণা করবে আমাকে। মা বুঝতে পারেন না যে এমন করুণার চেয়ে নিন্দা অনেক ভাল লাগে আমার। আজই আমি সুযোগ হলে শৈলেনকে বুঝিয়ে দেব যে সে যদি রোজ শুধু করুণা জানাবার জন্যেই আমার কাছে আসে তাহলে এই যেন তার শেষ আসা হয়।

সব বাড়িটা, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছাড়া-ছাড়া স্বরে শৈলেন বলে, বড় ঝিমিয়ে গেছে দীপা—

প্রতিবাদ জানাবার সুরে আমি জিজ্ঞেস করি, কেন?

অল্প হেসে শৈলেন বলে, আগে যখন আসতাম তখন এই বাড়ির চারপাশ যেন একেবারে অন্য রকম ছিল।

কী রকম?

হা-হা করে কথায়-কথায় হাসত বিজন। আর তুমি আমাকে দেখে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতে। তোমার বাবা এ ঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াতেন—কত কথা বলতেন মা!

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বলি, সব কিছুরই তো বয়স বাড়ে সেকথা ভুললে চলবে কেন!

তা বটে, একটু ইতস্তত করে শৈলেন বলে, তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার সেকথা মনে হয় কিন্তু চেহারা দেখে মনেই হয়না যে বয়স বেড়েছে। তুমি ঠিক তেমনি আছ দীপা।

না, আমার স্বরে কোন দরদ নেই, অনেক বদল হয়েছে আমার—

বাধা দিয়ে শৈলেন বলে, শুধু শোক তোমাকে ভাঙতে পারে নি, একটু চুপ করে থেকে ও আবার বলে, তা পারবেই বা কেন—কিন্তু এখন কী করবে ঠিক করেছ?

আমি যেন ইচ্ছে করেই বিদ্রূপ করে উঠি শৈলেনকে, আমি তো ভেবে-ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি নি। আপনি বলুন না কী করব?

কী করতে ইচ্ছে করে তোমার ?

কিছু না।

অমন মনে হয় বটে। তারপর হঠাৎ এক সময় দেখবে সব কিছু সহজ হয়ে গেছে, একটু ভেবে শৈলেন বলে, দরকার না থাকলেও এখন কোথাও একটা কাজ নিলে সব দিক থেকে তোমার পক্ষে ভাল হত।

কিন্তু আমার বিদ্যার দৌড় তো আপনি জানেন—কে আর আমায় কাজ দেবে বলুন ?

সত্যি কাজ করবে দীপা ?

আমি যেন শৈলেনের প্রশ্নে ঝলসে উঠে বলি, নিশ্চয়ই। আপনি বুঝতে পারছেন না—একটা কিছু নিয়ে মেতে না উঠলে আমি বেঁচে থাকতে পারব না।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম না—দেখতে পারলাম না। এর চেয়ে আরও স্পষ্ট করে আমি ওর কাছে আমার দৈন্য তুলে ধরতে পারব না। আমি ভাবলাম এবার শৈলেন উঠে দাঁড়াবে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসবে আমার কাছে। এই নির্জন ঘরে আমি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাব। ও আমার কাছে এসে একটা হাত ধরে কিম্বা গা স্পর্শ করে বলবে, আমি আছি—বেঁচে থাকতে পারবে না কেন দীপা ? আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলব !

কিন্তু না। এ সে-মানুষ নয়। শৈলেন এগিয়ে এল না আমার কাছে। আমাকে স্পর্শ করে কোন প্রতিশ্রুতি দিতেও সাহস পেল না। দূর থেকেই এক বয়স্ক অভিভাবকের মতো শুধু বলল, আমি খুব চেষ্টা করব দীপা তোমার একটা চাকরি ঠিক করে দিতে। শুধু বার বার তোমাকে বলি, তুমি অধীর হয়োনা। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে বই কি।

মনে মনে জ্বলে গেলেও এই নিষ্ঠুর লোকটাকে আমি মাথা তুলে বলি, হ্যাঁ, আমিও এগিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এখন শৈলেনের সঙ্গে আর একটাও কথা বলতে ইচ্ছে করে না আমার। ওকে আমি কেমন করে বোঝাব যে ভাগ্যকে মেনে নিলে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় না—নিজের দুঃখ সম্বল করে শুধু পিছিয়ে পড়তে হয়। আর নিজেকে উপবাসী রেখে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে কোন মানুষ! কিন্তু এই কঠোর মানুষটাকে যুক্তি-তর্কের জালে বেঁধে এসব কথা বুঝিয়ে শেষ অবধি কী আদায় করব আমি? কিছুনা। তার চেয়ে ও বলে যাক যা খুশি আর আমি চুপ করে তাই শুনি।

আর কথা বলে না শৈলেন। আমিও বসে থাকি মুখ বুজে। একটা তিক্ত স্বাদ যেন আমার চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে তুলেছে। এখন শৈলেন উঠে গেলেই আমি যেন বেঁচে যাই। ঝণ্টুর সঙ্গে আজে বাজে কথা বলে আর ছুটোছুটি করে শরীর-মন হালকা করতে পারি।

হঠাৎ আমার সমস্ত মন প্রাণ যেন ঝণ্টুকে নিয়ে মেতে ওঠে। এইটুকু একটা ছেলে শুধু আমার স্নেহ সম্বল করেই তো মাকে ভুলে আছে। এখন আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ওকে দেখবে কে! চিৎকার করে আমার ঝণ্টুকে এ ঘরে ডাকতে ইচ্ছে করে।

হয়তো ডাকতাম কিন্তু ঘরের বাইরে হঠাৎ খস খস পায়ের শব্দ পেয়ে আমরা দুজনেই চমকে উঠি। আর এ সময় দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হই। আমি কিছু বলবার আগেই শৈলেন লাফিয়ে উঠে দাদার ঘাড় ঝাঁকিয়ে দিয়ে জোর গলায় বলে, বিজন!

আজও কোন পরিবর্তন নেই দাদার চেহারার। চোখ দুটো লাল। চুল উস্কো খুস্কো। কিন্তু বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। তবে ক্লান্তি মুছে ফেলে দাদা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

আরে শৈলেন! দাদাও গলার স্বর তুলে বলে, দীপুর মুখে তোমার খবর পাই—কিন্তু একদিনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, তাই আজ তোমাকে ধরবার জন্যেই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম,

শৈলেন কিছু বলবার আগেই স্বর নামিয়ে দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করে, ঝণ্টু কোথায় রে ?

মা-বাবার কাছে। ডাকব ?

না না। তারপর শৈলেন ; তোমার সঙ্গে আমার অনেক—অনেক কথা আছে। আজ আর সহজে ছাড়া পাচ্ছ না—

না বিজন, আজ আর কোন কথা নয়। আমাকে এখুনি যেতে হবে। কাল আমি আবার আসব।

না না শৈলেন। কাল নয়। আজই। কী তোমার কাজ যে এখুনি যেতে হবে ? এত দিন পর আমার সঙ্গে দেখা হল—মদের উগ্র গন্ধে ঘর ভরে যায় আর দাদা জোর করে আবার শৈলেনকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

এবার আমার এখান থেকে চলে যাবার পালা। যত খুশি কথা বলুক দুই বন্ধু—আমার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে—আমি ঝণ্টুকে খুঁজে বের করি। কিন্তু এ ঘর থেকে বাইরে যাবার অবসর পেলাম না আমি। বাবার গলা পেয়ে ঝণ্টু পর্দা সরিয়ে ভয়ে-ভয়ে উঁকি দিচ্ছে। আমি ওকে ধরবার ভান করে উঠে যাই।

আমাকে আড়ালে পেয়ে ম্লান মুখে ঝণ্টু জিজ্ঞেস করে, মা আসে নি ?

ওর একটি ছোট প্রশ্ন আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। কী উত্তর দেব বুঝতে পারি না। শুধু ওকে বুকে তুলে নিয়ে বলি, আসবে—আসবে—ঠিক আসবে ঝণ্টু।

ও আমার বুকে মাথা রাখে। কী যেন ভাবে এক মনে। তারপর মাথা তুলে করুণ ভিজে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি মরে যাব পিসি।

ঝণ্টু ! ওকে ধমক দিয়ে বলি, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

কিন্তু আমি কথা বলি বা না বলি তাতে যেন কিছু এসে যায় না

এমন ভাব চোখে ফুটিয়ে ঝণ্টু ওপরে তাকিয়ে থাকে। আর দৃষ্টি থেকেই যেন আমি তার কচি মনটাকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাই। অভাব জানাবার মতো ভাষা হয় তো ওর নেই—যেমন করে বলতে চায় তেমন করে বলতে পারে না আর বড় হয়েছে বলে লজ্জায় হাঁ হাঁ করে কাঁদতেও পারে না। তা ছাড়া এই ছাড়াছাড়ির জন্যে কে দায়ী—তার মা না বাবা—সেকথাটাও ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না বলে ও ভয় পায় আমাদের ওর কান্না শোনাতে। তাই মুখ বুজে ভেতরে-ভেতরে পুড়ে যায়। আমি সব বুঝি।

আমি ঝণ্টুকে আদর করি। ওর ছলোছলো চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, আমি মিথ্যা কথা বলি ঝণ্টু? বল?

না।

তবে কেন তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না?

কি কথা পিসি?

তোমার মা ঠিক আসবে। একদিন তোমার বাবা আর আমি গিয়ে ওকে আবার নিয়ে আসব—

হঠাৎ হাসতে শুরু করে ঝণ্টু, আমি না গেলে মা কখখনো আসবে না পিসি। তোমরা আমাকে নিয়ে যাবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেও নিয়ে যাব।

কবে নিয়ে যাবে পিসি?

ওকে নিয়ে দোতলায় মা বাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলি, খুব তাড়াতাড়ি যাব।

মা-বাবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তর তর করে ঝণ্টু এগিয়ে গিয়ে বলে, দিদা—ও দিদা, বাবা এসেছে—একটা অবিশ্বাস্য খবরের মতো সে একথা শোনায় ওঁদের। আমি হঠাৎ ঝণ্টুর উচ্ছ্বাসের কারণ খুঁজে পাই না।

মার চোখ দুটো খুশিতে জ্বল জ্বল করে, বিজু সত্যি এসেছে নাকি রে?

ঈষৎ রূঢ় স্বরে বাবা বলেন, এসেছে তো এত খুশি হবার কী আছে। না এসে যাবে কোথায়? একটু থেমে বাবা বলেন, টাকা পয়সা একটু সাবধানে রেখ—

মা বলে ওঠেন, আঃ, কী বলছ!

আরও কঠিন স্বরে বাবা বলেন, ও বিনা মতলবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে নি। আমার কথা ঠিক কি-না একটু পরেই তোমরা বুঝতে পারবে।

বেশ, বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে মার কপালে। কিন্তু বাবার সঙ্গে আর কথা বলেন না তিনি। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, বিজু কী করছে রে? শৈলেনের সঙ্গে গল্প করছে বুঝি?

আমি মাথা হেলিয়ে বলি, হ্যাঁ।

আমি জানতাম সব ঠিক হয়ে যাবে, আমাকে লক্ষ্য করে মা বলেন, বিজু আমার তেমন ছেলেই নয়—

বাবা তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠেন, সব দোষ তোমার বৌমার না?

সেকথা তোমাকে কতবার বলব আনি? ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলেন, এই যে কচি ছেলেটা—কী হাল হয়েছে ওর দেখেছ?

ওর বাপ দেখেছে? এখনও ভাবে ওর কথা? একদিনও ওকে নতুন ইস্কুলে ভর্তি করবার কথা বলেছে?

সেসব কি বিজুর করবার কথা?

কে করবে তাহলে? বৌমা? মার দিকে তাকিয়ে জোরে হাসেন বাবা, হয় তো করব যদি তার কথা ভেবে তোমার ছেলেকে এখান থেকে বিদায় করে দিতে—

তার মানে?

মানে—আমি তাই চেয়েছিলাম। তোমার ছেলে যাবে। বৌমা থাকবে। সে চলে গেলে আমি নিজে গিয়ে বৌমাকে ফিরিয়ে নিয়ে

আসতাম। কিন্তু কই? লম্পঝম্পই সার। শেষ অবধি এ বাড়ি ছেড়ে গেল তোমার ছেলে? আমি জানি, সব তছনছ করা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই ওর।

কথা বলতে-বলতে বিছানার ওপর উঠে বসেছিলেন বাবা। ওঁর মুখ দেখে মনে হয় উনি এ উত্তেজনা সহ্য করতে পারছেন না। আমি আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে ওঁকে আবার শুইয়ে দিই। আর মাকে ইশারায় থেমে যেতে বলি। বাবার শরীর খারাপ। কদিন ধরে এত বেশি খারাপ যে কখন কী হয় বলা যায় না।

বাবা কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেন না। আবার বলতে শুরু করেন, বৌমার বিরুদ্ধে কথা বল তুমি? কিন্তু আমার কাছ থেকে শোন—কোন দোষ তার নেই। আমি যখন বিজুর বিরুদ্ধে কথা বলি তুমি অসন্তুষ্ট হও না আমার ওপর?

কেন হব না?

এই জন্যেই যদি অসন্তুষ্ট হও তাহলে তোমাকে যখন-তখন সকলের সামনে অপমান করলে কী করতে তুমি?

মা বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করেন, সংসার ছেড়ে চলে যেতাম নাকি?

আজকের মেয়ে হলে নিশ্চয়ই যেতে। বসে-বসে যে মার খায় সে সারা জীবন শুধু মারই খায়। আর কিছু পায় না।

মা আবার কী বলতে যান কিন্তু আমি বলে উঠি, এসব কথায় আর কাজ কী মা। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আর যা হবার তা আপনিই হবে। আমাদের কথা যখন কেউই শুনবে না তখন কোন কথা না বলাই তো ভাল।

অল্প হেসে বাবা বলেন, ঠিক ঠিক। ও দাদু—দাদু, কী ভাবছিস রে?

এতক্ষণ চুপ করেছিল ঝন্টু। এবার ওর ঠোঁট কাঁপে। চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। আমি ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলে আসি। অন্য কথা বলে ওকে এসব ঝগড়া মারামারির কথা

ভুলিয়ে দিতে চাই। কিন্তু ঝণ্টু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে অনেকক্ষণ।

আজ মা-বাবার সামনে অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি। এত কথা ওদের সামনে আমি কখনও বলি না। কিন্তু প্রথম-প্রথম দাদা-বৌদির ব্যাপারে আমি যেমন খুশি হয়েছিলাম—বিচলিত হয়েছিলাম আজ তেমন কোন অনুভূতিই আমার নেই। আবার যেন একটা জড় পদার্থের মতো আমি পড়ে আছি চুপচাপ। শৈলেনের কাছ থেকে আর কিছু আশা করি না আমি—আশা করতে পারি না। তাই হঠাৎ আমার একাকীত্ব আবার ভয়ঙ্কর রকম সজীব হয়ে ওঠে।

হয় তো আমি নিজে ভেঙে গিয়েছিলাম বলে প্রথম-প্রথম দাদা বৌদির ভাঙনের মধ্যে উত্তাপের কড়া স্বাদ অনুভব করে খুশি হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু এক হিম-শীতল ব্যর্থতায় আজ হঠাৎ আবার সব আশ্চর্য ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমার ভাল লাগছে না মা-বাবার মন কষাকষি, ঝণ্টুর কান্না, শৈলেনের গুরু গম্ভীর উপদেশ আর নিজের বেঁচে ওঠার নির্লজ্জ ইচ্ছা।

ঝণ্টুর মাথায় আস্তে আস্তে আমি হাত বুলিয়ে দিতে থাকি। ওকে অবলম্বন করেই আমি বাঁচব। আমি ওকে দেখব—লেখাপড়া শেখাব—ওকে বুকে নিয়ে সব ভুলে যাব—সকলকে ভুলব। আর কোন মানুষকে আমার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মা যতই তর্ক করুন বাবার সঙ্গে—ওঁর কথা শুনতেই আমার ভাল লাগে কারণ শুধু নিজের সুবিধার কথা ভেবে উনি দর্শনের কিম্বা জীবনের বড় বড় বুলি আওড়ান না।

তবুও হয়তো বাবার কথাগুলো আমি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি না বলে অনেক সময় আমার সন্দেহ জাগে—ওগুলো সত্যি ওঁর মনের কথা কিনা। হয় তো নয়। সব দিক ভেবে আজ হৃদয়ের দাবীর চেয়ে যুক্তির দাবীই প্রধান হয়ে ওঠে। আর আপন মনে যুদ্ধ করে-করে ওঁর শরীর ভেঙে যায়।

এসব ভাবনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি ম্লান ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করি, ভাত খাবে এখন?

চোখ বড় করে আমাকে দেখে ও। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, মাকে—আমার মাকে এনে দাও পিসি। কেন মা আসছে না এখনও?

ঠিক আসবে। তোমার জন্যে অনেক জিনিস নিয়ে আসবে।

আমি কিচ্ছু চাই না। কেন মা আসেনা আমার কাছে? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে ঝণ্টু বলে, পিসি, মাকে না এনে দিলে জান আমি কী করব?

কী?

তোমরা সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন দরজা খুলে একা-একা অন্ধকারে চলে যাব।

কোথায়?

মাকে খুঁজতে। আমিও মা'র মতো চলে যাব পিসি—হারিয়ে যাব।

কৃত্রিম অভিমান করে বলি, তুমি আমাকে ভালবাসনা ঝণ্টু?

বাসি।

তাহলে কেন চলে যাবে? তোমার মা ঠিক আসবে।

কী মনে হয় ঝণ্টুর কে জানে। ও চাপা স্বরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে, না পিসি, মা আর কখখনো আসবে না।

আমি রাগের ভান করে ঝণ্টুকে থামিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই ক্লান্ত পা ফেলে-ফেলে দাদা এসে ঢোকে আমার ঘরে। বিষণ্ণ দিশাহারা দৃষ্টিতে দেখে এদিক-ওদিক। ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে ওর বাবাকে এ ঘরে আসতে দেখে ও মোটেই খুশি হয় নি—অস্বস্তিতে ছটফট করছে—ভয় লাগছে ওর। কাউকে কিছু না বলে এক সময় ও আবার ওপরে মা-বাবার ঘরে চলে যায়।

আমি বাধা দিতে পারি নি ঝণ্টুকে। আমি দাদাকে দেখে বিব্রত হয়ে উঠেছিলাম। বেতের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ততক্ষণে বসে পড়েছে দাদা। মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও বোধ হয় শুনতে পেলাম।

একটু আগে বাবা মাকে বলছিলেন যে দাদা বিনা মতলবে বাড়ি আসেনি। এখন ওর চেহারা দেখে আমারও ঠিক সেকথাই মনে হচ্ছে। হয়তো দাদা আবার টাকা চাইবে আমার কাছে। তারপর আবার চলে যাবে বাইরে। রোজকার মতো ফিরে আসবে অনেক রাত্তিরে।

শৈলেন আবার কাল আসবে দীপু, লাল-লাল চোখ তুলে দাদা বলে, কাল আমার ছুটি। আমরা সকলে একসঙ্গে বেড়াতে যাব—

আমি কোন কথা বলি না। শৈলেন আসুক বা না আসুক তাতে যেন আমার আর কিছু যায় আসেনা। কোথায় কী ঘটে গেছে আমি জানি না কিন্তু আবার আস্তে আস্তে একাকীত্বের যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসছে। কিন্তু এবার আমি আর কোন অবলম্বন খুঁজব না—ঘর খালি হয়ে গেলে অন্ধকারের নির্জনতায় আমি আবার অনুভব করব তোমাকে।

এতদিন আমার চোখে পড়েনি—আজ হঠাৎ দেখি এ ঘরের দেয়ালে তোমার যে সুন্দর ছবিটা টাঙানো আছে ধুলোয়-ধুলোয় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে সেটা। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শে আমার শরীর ঝিম ঝিম করে। গ্লানির খোঁচায় আমি যেন অনেক ছোট হয়ে যাই।

এদিক-ওদিক সাবধানে তাকিয়ে চেয়ারটা আমার আরও কাছে টেনে এনে ফিস ফিস করে দাদা বলে, কাউকে বলিস না দীপু, একটা মুশকিল হয়েছে—

আমি চমকে মাথা তুলে বলি, কী?

কিন্তু আসল কথাটা সহজে ভাঙে না দাদা। দাঁতে দাঁত চেপে

আক্রোশের ঝাঁজে মুখ বেঁকিয়ে বলে, আচ্ছা দেখা যাক কতদূর যায়! আমিও চালাকী বের করব ওর। ভেবেছে ভয় দেখিয়ে আমাকে জব্দ করবে। আরে, ভয় পাবার লোক নাকি আমি! ঝণ্টুকে দেবার জন্যে বসে আছি।

কথাগুলো তেজের—দম্ভের। কিন্তু দাদার স্বরে এখন যেন আক্রমণের দাপট নেই। ও যেন আমাকে শুনিয়ে পাখির বুলির মতো শুধু কথাগুলো এক সুরে গড় গড় করে বলে যায়। আমি বুঝতে পারি বৌদিকে লক্ষ্য করেই এসব কথা দাদা বলে কিন্তু হঠাৎ ওর এই ঠাণ্ডা আস্ফালনের কারণ ধরতে পারি না।

বৌদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল নাকি?

মাথা ঝাঁকিয়ে দাদা বলে, না না, দেখা হবে কেন? ও আবার ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে তাকিয়ে নেয়, শোন, মা-বাবাকে এখন কিছু বলিস না কিন্তু—

দাদাকে ইতস্তত করতে দেখে আমি বিচলিত হয়ে বলি, কী হয়েছে?

উকিলের চিঠি দিয়ে আমাকে শাসিয়েছে—কেস্ করেছে আমার নামে—

এত বড় কথা হঠাৎ আমি যেন বিশ্বাস করতে পারিনা, সে কী?

হ্যাঁ, হা-হা করে হেসে ওঠে দাদা, অনেক মিথ্যা কথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমার নামে। আমি নাকি ওকে মারতে-মারতে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি—অন্য মেয়ের সঙ্গে যা-তা কাণ্ড করে বেড়াই। আর ঝণ্টুকেও ও নিজের কাছে রাখবে—

দাদা কথা বলে যায় কিন্তু আমার কানে যায় না কিছু। আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ওর কথা—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না জয়ার এই কঠোর জেদের কথা। এতদিন দেখেছি ওকে আমার পাশে-পাশে কিন্তু একদিনও কল্পনা করতে পারিনি যে প্রয়োজন হলে সব কিছু ও এমন কর

পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারে। এখন আমার ভাল লাগেনা জয়াকে। ওর এই মূর্তি আমি দেখতে চাইনা মনে মনে।

কিন্তু দাদার কথা শুনে আমি খুব সহজেই ওর মনের প্রতিক্রিয়া ধরে নিতে পারি। যতই আস্ফালন করুক দাদা, যত জোরেই হাসুক সব আক্রমণ উড়িয়ে দেবার ভান করে—আমি যেন একটা পরাজিত অসহায় মানুষকে আমার চোখের সামনে বসে থাকতে দেখি।

ওদের মধ্যে যতই ঝগড়া তর্ক হোক আর তার ঝাঁজে দুজন ছিটকে যাক দুদিকে—আমার যেমন বিশ্বাস ছিল ওরা দুজনেই বেঁচে আছে বলে আর মাঝখানে ঝণ্টু আছে বলে হয়তো আবার একদিন সব ঝাঁজ জুড়িয়ে যাবে। ঝণ্টুর টানেই সব তুচ্ছ করে ফিরে আসবে জয়া। হয়তো দাদার মনেও ঠিক এই ধরনের একটা কাঁপা কাঁপা আশা ছিল। কিন্তু বিচ্ছেদের মামলার চিঠি পেয়ে ওর যেমন আঘাত লেগেছে তেমন আঘাত জয়া চলে গেছে শুনেও হয় তো লাগে নি। এখন আমার কাছে গলার স্বর ঝাঁজালো করে তোলার ভান করে সে-আঘাত দাদা বোধ হয় ঢেকে রাখতে চায়। আর এই হারের কথাটা মা-বাবার কাছেও গোপন রাখতে চায়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দাদা আরও জোর দিয়ে বলে, ভেবেছে কেস্ করলেই ভয়ে আমার হাত-পা গুটিয়ে যাবে—আমি কেঁচো হয়ে ও যা চাইবে তাই দিয়ে দেব—

আমি আস্তে জিজ্ঞেস করি, তুমি কী করবে ঠিক করেছ?

কী করব মানে? যতদূর যেতে হয় ততদূর যাব। দু-একদিনের মধ্যেই শৈলেন বলেছে আমাকে একটা ভাল উকিলের কাছে নিয়ে যাবে।

ওকে এসব কথা বলেছ নাকি?

বলেছি।

যদিও আমি নিজেই এসব কথা কিছু-কিছু বলেছি শৈলেনকে তবুও এখন হয় তো ও আমার মন থেকে দূরে চলে গেছে বলে আমি

থেমে-থেমে বলি, এত তাড়াতাড়ি ঘরের কথা বাইরের লোককে জানাবার দরকার কী!

ও নিজে বলে বেড়াচ্ছে না? মাটিতে পা ঠুকে চীৎকার করে ওঠে দাদা, আমি চুপ করে থাকলে আরও সাহস পাবে আর লোকে ভাববে সব দোষ আমার।

কার দোষ সে-বিচার তো কোর্টেই হবে।

হঠাৎ মাথা তুলে দাদা দেখে আমাকে। আমার কথা শুনে হয় তো ভাবে যে আমি জয়াকে টেনে কথা বলছি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে, যে ছেলেকে ছেড়ে এমন করে চলে যেতে পারে সে সব করতে পারে। এখন হয় তো একটা লোক জুটেছে—তাই সাহস বেড়েছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দাদা বলে যায়, দেখা যাক কে শেষ অবধি জেতে। কিন্তু তুই কী করবি দীপু? কোর্টে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বসবি না তো?

দাদা, আমি ভাবছি বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করব।

দাদার মুখ এক মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার কাছে তা জোর করে গোপন করবার জন্যে ও কর্কশ স্বরে বলে, না, তা করতে যাস না তুই। তাহলে ও আরও বাড়াবাড়ি আরম্ভ করবে। ভাববে যে আমরা ভয় পেয়ে ওকে সাধাসাধি করতে এসেছি, একটু থেমে মাথায় হাত বুলিয়ে দাদা জিজ্ঞেস করে, তোর সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছে নাকি রে?

না। আমি বৌদির কোন খবরই রাখি না।

আশ্চর্য, সেই পুরনো কথাই বলে দাদা, ছেলেটার কথাও ওর একবার মনে পড়ে না।

মনে পড়ে বলেই তো ওকে নিজের কাছে রাখতে চায়।

নাঃ, দাদা যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, তোরা সকলেই জয়ার দিকে। যেন সব দোষ আমার—

দাদা থেমে যায়। হয়তো ভাবে যে আমি প্রতিবাদ করব। কিন্তু কোন কথাই বার হয় না আমার মুখ দিয়ে। শুধু ভাবি যে এইবার বাধা পেয়েছে দাদা। এবার ওকে ফিরে দাঁড়াতেই হবে। এতদিন পর ওর বহুদিনের আঁকড়ে ধরা বিশ্বাস ভেঙে গেছে! ও বুঝেছে যে জয়ার ওপর ওর আর কোন অধিকার নেই। তাই চুপে চুপে আমার কাছে উষ্মা প্রকাশ করে নিজের অসহায় অবস্থার কথাই জানায়।

দাদা চলে যায় নিজের ঘরে। যন্ত্রের মতো আমিও ঝণ্টুকে খাইয়ে দিই। আর আজ একটু তাড়াতাড়ি নিজেও খাওয়া সেরে গড়িয়ে পড়ি বিছানায়। ঝণ্টুর সঙ্গে আজেবাজে বকতে আমার ইচ্ছে করে না। সে-ও কোন কথা বলে না আমার সঙ্গে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকে।

মনের মধ্যে কথা জমে আছে অনেক। কিন্তু বলবার মানুষ নেই একটিও। এদের কথা নয়—আমার নিজের কথা। এরা মামলা করবে। হারবে—জিতবে। মিথ্যা অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে মনকে পিষে দুজনে দুজনকে ছোট করবার চেষ্টায় বিব্রত থাকবে তবু সত্যি কথাটা প্রকাশ করে প্রেমকে প্রধান করবে না নিজেদের জীবনে—করতে পারবে না। একজন মানলেও আর একজন মানবে না—একজন শুনলেও আর একজন শুনবে না।

কিন্তু আজ আবার আমি তোমাকেই ডাকব। হ্যাঁ, আমি আশ্রয় খুঁজব মৃত্যুর ছায়ায়—আমি জোর করে নিজেকে মিশিয়ে দেব হারিয়ে যাওয়ার মূক অন্ধকারে। মেয়েলি দম্ভ ঘুচিয়ে আর কোনদিন নির্লজ্জ কাঙালের মতো আমি বাঁচবার চেষ্টা করব না। জীবন আমার জন্যে নয়। উত্তাপ আমার জন্যে নয়। এখন থেকে আমি নিজেকে মারব। তারপর এক হয়ে যাব তোমার সঙ্গে।

কোন বিশ্বাস নেই আমার। কোন ব্যক্তিত্ব নেই। আমি ভগবানের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারি না। আমি গড়ে তুলতে পারি না স্মৃতির এক সুন্দর জগৎ। শুধু স্থূল স্বার্থ প্রধান হয়ে ওঠে

আমার চলা-ফেরায় ভাবনায় ভঙ্গিতে। এবার নিজেকে সংশোধন করব আমি।

বৃষ্টি থেমে গেছে এখন। থেকে থেকে জোর হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে মশার ভোঁ ভোঁ শুনি। মশারির মধ্যে থেকে অল্প-অল্প অন্ধকারে আমি তোমার ছবিটার দিকে তাকাই কিন্তু কিছু দেখা যায় না। ঝাপসা। অস্পষ্ট। আমার চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে ওঠে হঠাৎ। আমি তোমাকে টেনে আনতে চাই আমার বুকের ওপর। আমি আবার আগেকার মতো ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে মুছে দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই।

কিন্তু কেন আসনা তুমি? কেন সাড়া দাওনা আমার ডাকে? আমারই ক্লান্ত হাত এসে পড়ে আমার বুকের ওপর। কোন উত্তেজনা নেই। কোন স্পর্শ নেই। এই অন্ধকারে আমি শুধু একাই জেগে থাকি।

কী হবে এখন? তুমি আর আসবে না আমার কাছে। তোমাকে নিয়ে একা-একা আমার জগতে আর তৃপ্তি পাবনা আমি। বেশ। তবে তাই হোক। তুমি যদি সত্যি সাড়া না দাও আমার ডাকে— এমন করে দূরে সরে যাও তাহলে রাতের অন্ধকারে আবার কল্পনার জীবন্ত জগৎ সৃষ্টি করে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করব না আমি। জীবন বিমুখতার কঠিন আবরণ দিয়ে আমিই এগিয়ে যাব তোমার কাছে। এখন থেকে তা ছাড়া আমার আর অন্য কোন কাজ নেই। মৃত্যুর তুষার-শূন্যতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্যে আমি মনে মনে প্রস্তুত হই।

একা একা অন্ধকারে যে ভাবনা আমাকে সরিয়ে নেয় চঞ্চল জগৎ থেকে—যে-মন আমাকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর ছায়ায়—দিনের আলো এক-একটা রূঢ় আঘাতে আমি যেন আবার ফিরে-ফিরে আসি

যারা বেঁচে আছে তাদের কাছে। তর্ক করি, অভিমান করি, বাঁকা কথা বলে মানুষকে আঘাত দিতেও ইতস্তত করি না।

এখন শুধু আমার চোখের সামনে থাকে শৈলেন। দাদার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে সে রোজ সন্ধ্যায় আসে আমাদের বাড়িতে। বৌদিকে সমর্থন করে না। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে কথা বলে তার বিরুদ্ধে। দাদাও বোধহয় ওর কথা শুনে খুশি হয়—মনে মনে জোর পায় হার-জিতের খেলা খেলবার জন্যে। আর তখন ওরা আমাকেও ডাকে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে এসব আলোচনা করবার আমার কোনই উৎসাহ থাকে না আজকাল। এখন আমার অনেক কাজ। বাবার শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছে বলে মা ওপরেই থাকেন সব সময়। ঝণ্টু ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমিই ওকে পড়াই।

সকাল থেকে রাত অবধি একটা নীরব যন্ত্রের মতো আমি নিজেকে ঠেলে-ঠেলে দি নিজের ঘর থেকে রান্নাঘরে। রান্নাঘর থেকে মা-বাবার ঘরে। তারপর দেখি ঝণ্টুর চান খাওয়া পড়াশুনো। অফিসে বার হবার আগে দাদার সব কিছু হাতের কাছে গুছিয়ে দি। আর আশ্চর্য, তখন মৃত্যুর হিমগুহায় আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়ার কথাটা আমার মনেও থাকে না।

আমি এত কাজের মাঝে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে থেকেও লক্ষ্য করি দাদার পরিবর্তন। অফিস থেকে ও আজকাল সোজা বাড়ি ফিরে আসে। ঝণ্টুকে আদর করে। মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে বেড়াতেও যায়—জিনিস কিনে দেয়।

কিন্তু ওর বাবার কাছে সহজ হতে পারে না ঝণ্টু। ভয় পায়। শুকনো মুখে বাইরে বার হয় দাদার হাত ধরে। আর জয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে বোধহয় সাহস পায় না। ঝণ্টুর এই শুকিয়ে যাওয়া ভাল লাগে না আমার। তখন আমি ওকে গল্পে-গল্পে ভুলিয়ে রাখি। তাই কেমন করে আমার চোখের সামনে থেকে সুখ-দুঃখ-ব্যথা গম

গম করা একটা জ্বলন্ত সংসারকে একেবারে অস্বীকার করে নিজেকে সরিয়ে নেব !

চৈত্র এসেছে কয়েক দিন আগে। অপরাহ্নের ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি দেখে চোখ বন্ধ করে রাখলেও আমি বুঝি ঋতুর পরিবর্তন। কিন্তু কোন সাড়া নেই আর আমার মনে। বাইরের তাপ যত বাড়ে, আমার ক্লান্তি বাড়ে ততই। চোখের সামনে ক্লান্ত গাছ। রাস্তা দিয়ে আসে যায় এক-একটি পরিশ্রান্ত মানুষ। মুখ দেখে মনে হয় ওরাও যেন আমার মতো ফুরিয়ে যেতে বসেছে। কোন জীবন্ত কিছু যেন আর নেই পৃথিবীর কোথাও। ক্লান্তিতে-ক্লান্তিতে শেষ হয়ে গেছে সব।

তবু কোন-কোন সন্ধ্যায় দাদা আমাকে জোর করে বাইরের ঘরে শৈলেনের সামনে এনে বসিয়ে দেয়। আর প্রমাণ করবার চেষ্টা করে ওর মহত্ত্ব। নিজের সব কাজ তুচ্ছ করে ওই একটি মাত্র বন্ধুই শুধু দাদাকে সাহায্য করছে। বৌদির অন্যায়ের প্রশ্রয় কিছুতেই দেয়া হবে না বলে দাদাকে উকিলের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা পাকা-পাকি করে ফেলেছে শৈলেন। যেন এখন আর কোন ভাবনা নেই দাদার।

আমার দিকে তাকিয়ে চাপা অহঙ্কারের হাসি হাসে শৈলেন, দরকার হলে সাক্ষী দেবে তো দীপা ?

দিতে তো হবেই। কিন্তু এখন থেকে তা নিয়ে এত ব্যস্ত হবার কী দরকার ?

আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকার দরকার আছে বৈকি ! একটু এদিক-ওদিক হলে কেস্ যে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।

শৈলেনের কথা শুনে আমি হেসে বলি, কী আর হবে। শুধু বৌদি ঝণ্টুকে নিয়ে নেবে—এই তো ? ছেলে যদি তার মার কাছে থাকে তাহলে ক্ষতি কী ?

বাঃ, আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যায় শৈলেন, তাহলে তে

আরও চাপ দেবে। ছেলের খরচের নাম করে টাকা নিয়ে নিজে যা খুশি তা করে বেড়াবে।

আপনারা সকলেই তো তা করে বেড়ান। তার মা যা খুশি তা করুক, আমার মনে হয় ঝণ্টু তার মার কাছেই অনেক ভাল থাকবে।

আমার কথা শুনে দাদা বলে ওঠে, জান শৈলেন, মা ছাড়া এ বাড়ির কেউ আমার হয়ে কথা বলবে না।

শৈলেন হাসে, তুমি ঘাবড়ে যেও না বিজন। দীপা কখনও তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না।

দৃঢ় স্বরে আমি বলি, না। কারণ বৌদির পক্ষে দাঁড়াবার সুযোগ হয় তো আমার হবে না।

শৈলেন চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মাথার ওপর জোরে পাখা চলছে। আলোটা হঠাৎ একবার দপ্ করে ওঠে। শৈলেন বুঝতে পারে না যে এখন এসব ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই। শুধু শৈলেনের মত আমি যে মানি না সে কথাটা তাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দি।

তুমি কী হলে খুশি হও দীপা?

তা জেনে কার কী লাভ বলুন? কারণ এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে কেউ কাউকে খুশি করবার জন্যে কিছু করবে না বলেই তো আদালতের সাহায্য নিয়েছে।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শৈলেন বলে, কিন্তু আদালতের সাহায্য নিয়ে জয়ার কী লাভ হবে বলতে পার?

তার অধিকার সে জোর করে প্রতিষ্ঠা করবে।

যদি হেরে যান?

তাহলে কী করবে আমি জানি না।

জিতলেই বা কী হবে?

তার জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। সে ছেলেকে পাবে। মুক্ত হবে। ইচ্ছে হলে আবার একটা বিয়েও করতে পারে—

শৈলেনের হাসির তোড়ে আমার কথা ডুবে যায়, অত সোজা নয় দীপা। ইচ্ছে হলেই মানুষ তার জীবনকে নিজের মনের মতো করে সাজাতে পারে না। ভাগ্য যেখানে ঠেলে দেয় তাকে সেখানে যেতেই হয়—

শৈলেনকে বাধা দিয়ে একটু কঠিন স্বরেই আমি বলে ফেলি, অনেকে আছে যারা ভাগ্য মানে—ভাগ্যকে শ্রদ্ধা করে। যেমন আপনি। আবার অনেকে আছে যারা তা মানে না—ভাগ্য গড়ে নেয়। যেমন বৌদি। ভাগ্যকে মেনে কেঁদে কেঁদে জীবন কাটিয়ে কী তিনি পেতেন?

কী পেতেন? আমার জেরার তাপে শৈলেনের স্বর যেন থিতিয়ে যায়। দু-একবার চেয়ারের হাতলে হাত ঘষে ও বলে, একটা কিছু হয়তো পেতেন যা তিনি হাজারবার মামলা করেও পাবেন না। মানুষের কান্না কখনও বিফল হয় না।

কথাগুলো বড় পুরনো। বড় ভারী। কিন্তু ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে। আমি মনে মনে হাসি। আর শৈলেনকে দেখতে দেখতে মনে হয় যেন একটা বুড়ো মানুষ বসে আছে আমার সামনে। হঠাৎ বিরক্তি আসে আমার।

তবে এবার ঠাণ্ডা গলায় আমি বলি, আপনার মত মেনে ভাগ্যকে মানলে কান্না ছাড়া আর কিছুই থাকে না মানুষের।

না থাক, তবু কান্নাটা তো থাকে। কিন্তু ভাগ্যকে অগ্রাহ্য করে জোর দিয়ে কিছু পাবার চেষ্টা করলে তাও থাকে না।

আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, মানুষ ইচ্ছে করলে ভাগ্য ফেরাতে পারে। আর যারা কাজের মানুষ তারা তাই করে, শৈলেনকে আজ আমি দাবিয়ে দেবই—এমন এক তীব্র ইচ্ছার জোরে বলি, যদি জয়া জেতে—দাদাকে অবাক হয়ে দূরে বসে থাকতে দেখে কয়েক মিনিট ইতস্তত করে বলি, আর যদি সে আবার একটা বিয়ে করে—তাহলে আপনি কি বলতে চান ঘরে বসে কান্নার চেয়ে তা ওর জীবনের পক্ষে অনেক ভাল নয়?

না। কারণ বিয়ে করলেই তার সব অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হবে না। পিছনে থাকবে একটা জটিল অতীত আর মাঝে মাঝে তার হাতছানি তাকে কিছুতেই সুখী হতে দেবে না।

এবার যেন একটা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে শৈলেন আমার মুখ বন্ধ করে দেয়। আমি চমকে উঠি। শিউরে উঠি। ও আমাকে ইচ্ছে করে আঘাত করে কি না কে জানে। সাবধানে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি আমি। ওরা কেউই যেন তার শব্দ শুনতে না পায়।

আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি আমার ভাগ্যের কথাই ভাবি। আমি বেঁচে গেছি। শৈলেনের কথা ভেবে মাত্র কয়েকদিন আগে নিজেকে জড়িয়ে যা গড়তে শুরু করেছিলাম তা ও জানতে পারে নি বলেই আমার শান্তি। জানতে পারলে হয় তো এমন কাটা-কাটা কথায় উপদেশ দিয়ে আমার মাথায় চাপিয়ে দিত বিরাট এক লজ্জার বোঝা। তখন মুখ লুকোবার জায়গা থাকত না আমার।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বোধহয় উৎসাহ পায় শৈলেন। আর এক বয়স্ক মোড়লের মতো ভারী স্বরে বলে, যে ভাঙে সে আর কখনও গড়তে পারে না। আমরা তো দেখি আজকাল এমন কাণ্ড ঘরে-ঘরে হয়—কিন্তু সম্ভব হলে খবর নিয়ে দেখ কজন সুখী হয়।

এবার আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। শৈলেনের সব যুক্তি ধূলিসাৎ করবার জন্যে বলি, কিন্তু ঘরে বসে কাঁদলেও তারা সুখী হয় না—

তবু তারা ঘর নিয়ে—সংসার নিয়ে সব ভুলে থাকতে পারে। পরে আর ঘর গড়া যায় না বলেই তারা উৎকট যন্ত্রণায় শুধু ছুটে মরে। আজকের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায় আমাদের পূর্ব-পুরুষের জীবন কত সুখের ছিল।

আবার আমি প্রতিবাদ করি শৈলেনের কথার, তখন এত সমস্যাও ছিল না আর জীবন যাত্রার ধরনের পরিবর্তন তো দিনে-দিনে হবেই। আপনি শুধু কথা বলে সে পরিবর্তন বন্ধ করতে

পারবেন না। সব কিছুর রূপ রঙ—সমস্ত চেহারাটাই যখন বদলে যাচ্ছে তখন যে চোখ বন্ধ করে থাকে, ক্ষতি শুধু তারই হয়।

আমি জানি। তবু দেখা যায় শেষ অবধি ভাগ্যকে মানতেই হয়।

এতক্ষণ এক মনে দাদা আমার আর শৈলেনের তর্ক শুনছিল। ও বোধহয় বুঝতেই পারছিল না কেন আমরা এত কথা বলছি। কিন্তু আমি যে জয়াকেই সমর্থন করি এ বিষয় এখনও হয় তো নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তাই দাদা বলে, থাক—থাক। এসব কথা বলে আর লাভ নেই। যার যা খুশি তাই করবে। আমি যদি বুঝি সব দোষ আমার তাহলে যে কোন শাস্তি পেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। চল শৈলেন, মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শৈলেন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যাবে নাকি দীপা?

আমি ম্লান হেসে বলি, আপনারা যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

ওরা চলে যায় মা-বাবার ঘরে ওপরে। মুখে বললাম বটে আমিও যাব, কিন্তু এখন এখান থেকে নড়বার ক্ষমতা আমার নেই। পক্ষাঘাতের রুগির মতো আমি বিমূঢ় হয়ে সেই চেয়ারেই বসে থাকি। এতক্ষণ শৈলেনের সঙ্গে সমানে তর্ক করে গেলেও ও চলে যাবার পর আমার মনে হয়, আমি যেন ভীষণ ভাবে হেরে গেছি। ওর প্রত্যেকটি কথাই অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি।

হ্যাঁ, আমাকেও ভাগ্যকে মানতে হবে। আবার নতুন করে কিছু গড়বার ক্ষমতা আমারও নেই। আমি যতই নতুন করে নিজেকে সাজাবার চেষ্টা করি না কেন, আমার অতীত হঠাৎ এক সময় সব কিছু বিস্বাদ করে তুলবে। আর তখন আমি না পারব সামনে এগিয়ে যেতে—না পারব পিছনে তাকাতে।

কিন্তু এমন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার নামই হয় তো মৃত্যু

মনে মনে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলেও জীবনের এক-একটি প্রয়োজন প্রায়ই তো মৃত্যুকে আবার সরিয়ে দেয় সামনে থেকে। আর তখন আমি একটা বিশ্বাসের প্রতীক খুঁজি—জীবনের একটা প্রতীক যা আমার সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ভাগ্যকে মুছে দিয়ে একটা সহজ সত্যকে তুলে ধরবে আমার সামনে।

শৈলেন সে-মানুষ নয়।

কিন্তু কোথায় সেই মানুষ!

॥ ছয় ॥

মাঝে মাঝে হাঁ-হাঁ করে কাঁদে ঝণ্টু। ওকে কিছুতেই থামান যায় না। বাবা তখন দাদাকে দাঁত চেপে গালাগাল করেন। মা অভিশাপ দেন বৌদিকে। আর আমি ঝণ্টুকে কাছে টেনে নি। ভোলাই। দাদা নিজে অনেক খেলনা কিনে আনে ওর জন্যে। কিন্তু ঝণ্টু ভোলে না।

এমনি করেই ওর ছোট্ট বুকে আগুন চেপে রেখে হয় তো হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে যাবে ছেলেটা। আর সকলে নিজেদের মান-অভিমান নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে ওর শেষ হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমি এমন করে আর শুনতে পারি না ঝণ্টুর কান্না।

শৈলেন রোজ এসে দাদাকে উৎসাহ দিলেও আজকাল চেহারা দেখে মনে হয়, দাদা যেন একটু ঝিমিয়ে গেছে। দশজনের সামনে জয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার ওর আর যেন ইচ্ছে নেই। কিন্তু এসব কথায় আমার কাজ নেই। এসব থেকে মুক্তি নিয়ে আমি এবার ফুরিয়ে যেতে চাই। নিজেকে পীড়ন করে-করে চলে যেতে চাই তোমার কাছে।

কিন্তু এখন দেখি তোমার দরজাও আমার জন্যে বন্ধ। আমি ডেকে-ডেকে সাড়া পাইনা তোমার। আমার স্বার্থের নির্লজ্জ প্রকাশ দেখে তুমিও দূরে সরিয়ে দিয়েছ আমায়। তবু আমি তোমাকেই ডাকব। তোমাকেই ডাকব। আর কাউকেই নয়।

আজকাল এ বাড়ির সকলের মন দাদা-বৌদির ব্যাপারে জ্বলে যাচ্ছে বলে আমাকে কেউ লক্ষ্যই করে না। চোখ ফিরিয়ে তাকালেই

ওরা দেখতে পেত যে প্রসাধনে আর কোন রুচি নেই আমার। খাওয়া দাওয়ায়ও নেই। আমি আগের চেয়েও অনেক বেশি কঠিন দিন এখন কাটাই। আর তোমাকেই জোর করে আমার মনের মধ্যে ধরে রাখি সারাক্ষণ।

কোর্টে যাবার তু-চারদিন আগে দাদা আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে যায়। ও দেখে না আমাকে কিন্তু আমি দেখি ওর শুকনো মুখ। বসে যাওয়া চোখ। আর মনের অদ্ভুত যন্ত্রণায় একটা এলো-মেলো শরীব। কী একটা কথা আমাকে বলতে চায় দাদা। হঠাৎ বলতে পারে না। ইতস্তত করে। সাবধানে চারপাশে তাকিয়ে নেয়। সিগ্রেট ধরায়। দাদার রকম দেখে অস্বস্তি পাকিয়ে উঠতে থাকে আমার মনে।

আমি ভাবি যে দাদা আবার টাকা চাইবে আমার কাছে। ওর টাকা আছে কি-না আমি জানি না। কিন্তু বৌদি যে দাদার নামে নালিশ করেছে সে কথা এখনও মা-বাবা জানেন না। তাই তাঁদের কাছে টাকা চাইতে পারবে না দাদা। একমাত্র আমারই কাছে ও চাইবে।

আমার আর একটু কাছে সরে আসে দাদা। ঘন ঘন সিগ্রেটে টান দিয়ে হঠাৎ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বলে, দীপু, তুই যাবি না?

কোথায় যাব বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাব দাদা?

আবার ইতস্তত করে দাদা। তারপর যেন অনেক কষ্ট করে বলে, তুই যে বলেছিলি জয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবি?

আমি অবাক হয়ে দেখি দাদাকে। ওর কথা আমি হঠাৎ যেন বুঝতে পারি না। জয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা আমি হয়তো কিছু না ভেবেই বলেছিলাম। তার সঙ্গে দেখা করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু সব বিদ্বেষ ছাড়িয়ে, শৈলেনের এত উপদেশ তুচ্ছ

করে দাদার কথায় আজ যেন একটা করুণ মিনতি ফুটে ওঠে।

আমি দাদাকে এবার উল্টে প্রশ্ন করি, যাব না কি?

না না, বিচলিত হয়ে দাদা বলে, আমি তোকে যেতে বলছি না। তুই বলছিলি কিনা তাই—

আমি হেসে বলি, তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ নাকি দাদা?

আরে দূর, ঘাবড়াব কেন? একটু চুপ করে থেকে দাদা বলে, ঘাবড়াবার কী আছে। শুধু ঝণ্টু বেচারার জন্যে কষ্ট হয়—আজ ও না থাকলে আমি দেখে নিতাম।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে হাসতে হয় দাদার কথা ভেবে। ওর মনে কী আছে সে-খবর রাখার প্রয়োজন নেই আমার। তবে বুঝতে পারি যে একটা অনেক দিনের নিয়ম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বলে ঠেলা খেতে খেতে দাদা এদিক-ওদিক যাচ্ছে কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়াবার একটা বিশেষ জায়গা ঠিক করতে পারছে না।

দাদার দিকে ফিরে বললাম, হ্যাঁ, ঝণ্টুর ছোট বুক পুড়ে-পুড়ে যাচ্ছে। ও লেখাপড়া করে। ইস্কুলে যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখি চুপ করে বসে ও কী যেন ভাবে।

জোরে নিশ্বাস ফেলে দাদা বলে, কিন্তু কে ভাবে ওর কথা! এতদিনেও কোন খোঁজ নিল না, মাটিতে পা ঘষে দাদা বলে, ওর জন্যেই সব দিক ভেবে আমি বলছিলাম—

ঝণ্টুকে নিয়ে যাব নাকি?

না না, দাদা যেন ভয় পেয়ে বলে, ওকে ঠিক ধরে রাখবে তাহলে।

রাখুক না। মার কাছে ঝণ্টু তো ভালই থাকবে?

না-না, মাথা নেড়ে-নেড়ে দাদা বলে, তাহলে ভাববে আমরা ভয় পেয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর, ভাল থাকবে মানে? জয়া এখন কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে-খবর রাখিস?

কী? তুমি খবর রাখ নাকি?

খবর কি আর ইচ্ছে করে রাখি? এখান-ওখান থেকে নানা কথা কানে আসে। ঝণ্টুকে ওর কাছে রাখলেই হয়েছে আর কী!

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কী করে বেড়ায় বৌদি?

আমার প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দাদা দিতে পারে না! জ্বলন্ত সিগ্রেটটা আঙুলের ফাঁকে চেপে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তারপর ভেঙে-ভেঙে বলে, যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সিনেমা রেস্তোরাঁ পার্ক—সব জায়গায় নাকি তাকে আজকাল দেখা যায়। ঝণ্টুকে ও দেখবার সময় পাবে কখন?

তাহলে বৌদির সঙ্গে দেখা করে কী বলব আমি?

দাদা বোধ হয় ভাবে নি যে আমি ওকে হঠাৎ একথা বলব। কিন্তু আমার কথা শুনে আরও করুণ হয়ে ওঠে ওর মুখ। ভেতরে ভেতরে যেন কঠিন একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। তবু ও কিছুতেই ওর মনের আসল কথাটা বলে ফেলতে পারে না আমাকে।

কী বলবি বল তো?

সকলের কথাই বলব। ঝণ্টুর কষ্ট হচ্ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে। মা-বাবার কষ্ট হচ্ছে—

না। এসব কথা বলবার কোন দরকার নেই। যে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে তার কাছে এমন করে কাঁদুনি গাইলে—

আবার সেই পুরনো কথা একে-একে উঠে পড়বে বলে আমি তাড়াতাড়ি দাদাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, ঝণ্টুর কথা ছাড়া আর কারুর কথাই বলব না। আমি বৌদি কেমন আছে—শুধু সেকথা জানতেই যাব।

সেই ভাল, দাদা বলে, তবে একটু তাড়াতাড়ি করিস দীপু, কোর্টে যাবার দিন তো এসে গেল।

কাল রবিবার। আমি কালই যাব।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দাদা চলে যায়। কিন্তু এখন আর ছাদে

পায় না আমার। আমি যেন ওকে আবার নতুন করে ঈর্ষা করি। যতই কলহ করুক ওরা—মুখ দেখাদেখি বন্ধ হোক—মামলা করুক তবু এখনও ওরা ইচ্ছে করলেই এক কথায় ঘুরিয়ে দিতে পারে ওদের ভাগ্যের চাকা।

আর আমি ?

কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার।

আজ আমার সঙ্গে ঝন্টু নেই। এমন করে একা-একা রাস্তায় আমি অনেকদিন বার হইনি। ভোর-ভোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেও এর মধ্যেই রোদের তাপ বেড়ে গেছে। হাওয়ার স্পর্শ পাবার জন্যে অনেকে ট্র্যামের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আন্দাজে বুঝে নেয় যে বসলেই ঘামতে হবে।

দাদা আমাকে বলেছিল একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিতে। যাবার সময়—ফেরবার সময়ও। নিজের কি আমার সুবিধার কথা ভেবে দাদা ট্যাক্সি নিতে বলেছিল ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এটুকু বুঝতে পারি যে ওর আর ধৈর্য নেই। জয়া কী বলে তা শোনবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। তাই ও চায় আমি যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসি।

আমি বেরোবার আগে-আগে ঝন্টু এসে দাঁড়িয়েছিল আমার কাছে। ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না দেখে অভিমান করেছিল প্রথমে কথা বলে নি। ছলোছলো চোখে আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ।

আমি এখুনি ফিরে আসব ঝন্টবাবু। একটা বই কিনে আনব তোমার জন্যে।

ও ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, চাই না।

আমি হেসে বলেছিলাম, কী চাও বল ? যা চাও তাই আনব।

বাইরে তাকিয়ে ও বলেছিল, আমাকে মার কাছে নিয়ে চল।

একবার ভেবেছিলাম ওকে বলি যে আমি তোমার মাকে ফিরিয়ে আনতেই যাচ্ছি। কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলাম। আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে পারলে কিছুতেই ওকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না। ও জোর করেই আসত আমার সঙ্গে।

কিন্তু এখন ট্র্যামে বসে-বসে আমি ভাবছি ওকে সঙ্গে নিয়ে এলেই যেন ভাল হত। অন্তত তাহলে জয়ার সঙ্গে আলাপ করা সহজ হত আমার পক্ষে। ওকে বলা যেত যে আজ ঝণ্টুই আমাকে জোর করে টেনে এনেছে তোমার কাছে।

কিন্তু একা-একা গিয়ে জয়াকে হঠাৎ কী অবস্থায় দেখব আমি জানি না। আর আসলে কী প্রয়োজনে যাচ্ছি ওর কাছে তাও আমার কাছে একেবারে স্পষ্ট নয়। উকিলের চিঠি পেয়েও নিজের অধিকার ভুলতে পারে নি দাদা। এখনও মনে মনে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে নি। তাই হয় তো ভাবছে আমাকে দেখেই মাঝের কালো অধ্যায়টা জয়া মুছে ফেলতে পারে মন থেকে। আর ঝণ্টুর কথা ভেবে দাদার ওপর সব আক্রোশ ভুলে যেতে পারে।

ট্র্যামের গতি আমার ভাল লাগছে। একটা কাজের ভার নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পেরেছি বলে নিজের ওপর বিশ্বাসও যেন বেড়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের জোরও বেড়ে যায়। কড়া রোদের তাপে, গতির ঝাপটায় আর আশে পাশে অনেক অচেনা মুখ দেখতে-দেখতে দাদা-বৌদির এই বিচ্ছেদের অভিনয় আমার কাছে একেবারে তুচ্ছ মনে হয়।

জয়া এ নিয়ে এত কাণ্ড না করলেই তো পারত। তবে আমার মনে হয় এখন ওদের এই গোলমাল আমি যেন ঘুচিয়ে দিতে পারি। শুধু জয়া যদি এবার একটু নরম হয় তাহলে আর কোন বাধা থাকে না ওদের পুনর্মিলনের।

এলগিন রোডের মোড়ে ট্র্যাম থেকে নেমে আমি বাঁ দিকে এগিয়ে

যাই। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট ধরে বেশ অনেকটা গেলে জয়ার বাড়ি। আমি ছোট একটা কাগজের টুকরো চোখের সামনে তুলে নম্বরটা ভাল করে দেখে নি।

ইচ্ছে করেই আমি আস্তে আস্তে হাঁটি। একটা চিঠি লিখে এলেই যেন ভাল হত। কী ভাববে জয়া আমাকে দেখলে হঠাৎ। কাদের সঙ্গে ও কী ভাবে থাকে তা-ও আমি জানি না। আবার মনে হয় খবর দিয়ে এলেই যেন ভাল হত।

ঠিক নম্বরটা খুঁজে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পুরনো দোতলা বাড়ি। একটা পিছনের দরজাও আছে। কী করব? ফিরে যাব না ভেতরে যাব ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকি। ডাকাডাকি করতেও সাহস হয় না আমার। হঠাৎ চেনা গলার স্বর শুনে মাথা তুলে ওপরে তাকাই। জানলায় দাঁড়িয়ে জয়া। আমাকে দেখে হাসছে।

দীপু, এদিকে কোথায়?

তোমার কাছেই এলাম। কোনদিক দিয়ে ওপরে যাব?

এক মিনিট দাঁড়াও আমি আসছি, তর তর করে নিচে নেমে আসে জয়া, কতদিন পর দেখা! এস—এস ওপরে, ও এক রকম হাত ধরেই আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

জয়ার সহজ আন্তরিকতায় আমার সব জড়তা কেটে যায়। ওর ব্যবহার দেখে মনে হয় ও যেন পথ চেয়ে বসেছিল আমার আশায়। যদিও এখনও কোন আলোচনা করবার সুযোগ হয় নি আমাদের তবুও জয়ার মুখ দেখে আমার আশা অনেক বেড়ে যায়।

হয় তো নিজের সংসার ছেড়ে উত্তেজনার তোড়ে বেরিয়ে এসেছিল জয়া আর এতদিন অন্যের ওপর নির্ভর করে ক্লান্তি এসেছে তার জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। এখন সে আবার তার নিজের সংসারেই ফিরে যেতে চায়। আর অন্য পক্ষ থেকে কোন অনুরোধ আসেনি বলে

সে ভেবেছিল এই বিচ্ছেদ আর একজনের সয়ে গেছে। তাই একটা নাড়া দেবার জন্যেই নালিশ করেছিল। জয়ার একটা ধারণা নিশ্চয়ই ছিল যে তাহলে ও বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসবেই।

আমি ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। বিশেষ কিছুই নেই। একটা আলনা। খুব সাধারণ একটা খাট। গোটা দুই বেতের চেয়ার আর ছোট টেবিলের ওপর গোটা কয়েক বই।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার কৌতূহল জাগে জয়ার সম্পর্কে। এটা আসলে কাদের বাড়ি? জয়ার সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সূত্র কী? আর সব চেয়ে বড় কথা জয়ার এখন চলছে কেমন করে?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা অশোভন। জয়া আমাকে সন্দেহ করছে কি-না কে জানে। ও হয় তো ভাবছে যে আমি হঠাৎ এখানে বেড়াতে আসি নি—নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে আমার। তাই নিজেও বোধহয় প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে বসে আছে। জয়ার দিকে তাকিয়ে আমি শুধু অল্প-অল্প হাসি।

কেমন আছ বৌদি?

জয়া মাথা নাড়ল, আমাকে নাম ধরেই ডেক দীপু—বোবা দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে ও খুব স্পষ্ট করেই কথাগুলো বলে।

কিন্তু জয়ার কথাগুলো কড়া আদেশের মতো শোনালেও একটুও আঘাত লাগে না আমার। আমি খুশি হই ওর এই উগ্র প্রকাশে। ও যেন ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার আলোচনা করবার মস্ত সুযোগ দিল আমাকে। আমি তো সেকথাই জানতে এসেছি এখানে আজ।

আমি হেসে বললাম, অভ্যাসের দোষ। কিছু মনে করনা। আমি তো জানি এখন তোমার সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। মানে, দুদিন পর সব সম্পর্ক ছিন্ন হবে।

এবার জয়াও হাসে, তোমার সঙ্গে, মা-বাবার সঙ্গে, একটু থেমে ও বলে, আর ঝণ্টুর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক হয় তো কোনদিনও

ঢুকে যাবে না। শুধু একটা বিশেষ সম্পর্কের জের আমি কাউকে কোন ভাবেই আর টানতে দেব না বলেই তোমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে বললাম—তুমিও কিছু মনে কর না দীপু। সবই তো বোঝ।

এবার কী বলব হঠাৎ ঠিক করতে না পেরে মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আর এখানে হঠাৎ এসে পড়েছি বলে একটা ভারী সঙ্কোচও অনুভব করছিলাম। আসলে কী কারণে আমি আজ এখানে এসেছি জয়াকে দেখতে দেখতে সেকথা যেন এখন আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে না।

কিন্তু আমার মুখ দেখে বোধহয় আন্দাজে কিছু একটা বুঝে নিয়ে জয়া আমার খুব কাছে সরে এসে বলে, তুমি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলে না দীপু—

মাথা হেলিয়ে বললাম, বুঝেছি।

জয়া হেসে বলে, তাহলে তোমার চেহারা হঠাৎ একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল কেন?

ও কিছু না। গরমে এতটা রাস্তা এলাম তো তাই—

যাক, এবার জয়া হেসে বলে, আমি জানি, আর কেউ আমাকে না বুঝুক, তুমি ঠিক বুঝবে—

সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে আমিও এবার হাসি, তাই তো এলাম এখানে।

নিশ্চয়ই আসবে, একটু চুপ করে থেকে জয়া বলে, মা বাবা কেমন আছেন?

মা ভালই আছেন। বাবার শরীর খুবই খারাপ।

হঠাৎ করুণ হয়ে ওঠে জয়ার মুখ। আর এক জনের কথা জিজ্ঞেস করবার আগে সে যেন প্রস্তুত হয়ে নেয় মনে মনে। তারপর অনেক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, আর ঝণ্টু?

জয়ার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, ওকে আজ এখানে নিয়ে আসব ভেবেছিলাম—

না না, দৃঢ়স্বরে জয়া বলে, ওকে দেখতে চাই না আমি—

কিন্তু ও তো তোমাকে দেখতে চায়। তার কী হবে?

নির্লজ্জ স্পষ্ট উত্তর দেয় জয়া, যা হয় হবে। আমিই বা কী করতে পারি ওর জন্যে? বোধহয় বড় একটা নিশ্বাস জোর করে চেপে জয়া আবার বলে, হয়তো অন্য কারণে রেগে ওর ওপর মেজাজ দেখাতাম।

জয়া নিজেই একে-একে কথা তুলছে বলে আমি বলি, ঝণ্টু না থাকলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু ও যখন আছে তখন থেকে-থেকে অশান্তির আগুনে তোমার মন যে জ্বলবে সে তো জানা কথাই—

বাধা দিয়ে জয়া বলে, দু'দিন জ্বলবে। কিন্তু তিন'দিনের দিন আগুন ঠিক নিভে যাবে। কত লোকের ছেলে মেয়েরা তো বিদেশে থেকে পড়াশুনো করে, ঠোঁট টিপে হেসে ও বলে, সেই সব মা-বাবার মতো আমি নিজেই মনে মনে এক অহঙ্কার সৃষ্টি করে খুশি থাকব।

কিন্তু ঝণ্টু কী সৃষ্টি করবে?

ওর জন্যে তুমি আছ—তোমরা সকলে আছ। আর, একজন না থাকলে কারুর কিছু আটকায় না। ঝণ্টু দুদিন মা-মা করবে তারপর ও নিজেই সব ভুলে যাবে। বাইরে থেকে আজকালকার ছেলেমেয়েরা এত বেশি পায় যে ঘরে কি পেল না পেল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ওদের থাকে না।

জয়ার কথা বোঝা সহজ। তীক্ষ্ণ। স্পষ্ট। অনুকম্পার ছায়া নেই ওর কথায়—এক ফোঁটা কান্না নেই। কঠিন পাথরের মতো যুক্তির সারি দিয়ে সাজানো ওর মনের প্রকাশ। ওর এই রূপান্তর শুধু বিস্ময়ই জাগায় আমার মনে। আমি ওকে কিছু বলতে পারি না।

জয়া বলে যায়, আমি যা চেয়েছিলাম এখন তা পেয়েছি। নিজের সম্মান বজায় রেখে শান্তিতে ঘোরাফেরা করছি, ও নিজেই

বলে এবার, তুমি নিশ্চয়ই জান তোমার দাদার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্যে আমি আদালতের সাহায্য নিয়েছি—

জানি। কিন্তু—দু-এক মিনিট ভাবি বলব কি বলব না। তারপর চাপা স্বরে বলি, ঝণ্টু না থাকলে আমার বলবার কিছুই থাকত না। ওর ভাবনা—তুমি যা-ই কর, যেখানেই থাক, তোমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে।

সে-কাঁটা জোর করে উপড়ে না ফেললে আমাকে জ্বলতে হবেই, হঠাৎ সুর বদলে অল্প হেসে জয়া বলে, আর দু-একটা কাঁটা না বিঁধে থাকলে জীবনও একঘেয়ে হয়ে পড়ে। কাঁটা আছে বলেই তো তা তুলে ফেলবার জন্যে আমি কাজের মানুষ হয়ে উঠেছি।

কোথায় চাকরি কর তুমি?

সে একটা ছোটখাট চাকরি। বলবার মতো কিছু নয়। হয়তো বেশিদিন আমাকে এ কাজ করতে হবে না—আমি আরও ভাল একটা কাজ জোগাড় করতে পারব।

তারপর কী করবে?

এখন অত ভেবে রাখবার মতো মনের অবস্থা আমার নয় মামলা-আদালত চুকে যাক। তারপর দেখা যাবে।

তোমার বাহাদুরী আছে জয়া, সতর্ক হয়ে এবার আমি ওর না ধরেই কথা বললাম, তোমাকে আমার হিংসে হয়।

জয়া হেসে বলে, না না, আমার হিংসে করার মতো কিছু নেই একটু পরেই শুকনো গম্ভীর হয়ে যায় ওর মুখ, এমন করে যে কাউকেই শাস্তি পেতে না হয়। আমি চাইনা আমার মতো অবস্থা কেউ কখনও পড়ে। এত বড় অপমান যেন পৃথিবীর কোন মেয়েরে কখনও না সহ্য করতে হয়।

জয়ার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবার আমি অন্য কথা শোনাই ওকে, কিন্তু ক্ষমা করে নিতে পারলেই তো অপমান মুছে নেয়া যায়। তুমি দাদাকে মনে মনে ক্ষমা করতে পারলে না কেন?

।ণ্ডা স্বরে থেমে থেমে জয়া বলে, প্রথমত আমি দেবী নই। আর, দ্বিতীয়ত, সত্যিই যদি আমি তোমার দাদার টাকার কাঙাল হতাম তাহলে তোমাদের সংসার থেকে এমন করে বেরিয়ে আসতে পারতাম না।

হালকা স্বরে আমি বলি, বেরিয়ে আসা সোজা। সকলেই বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সংসারে থেকে তুমি দাদাকে জব্দ করতে পারলে না কেন?

উত্তেজনার কোন রেখা ফুটে ওঠে না জয়ার চোখে-মুখে কিম্বা কপালে, সে-ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। আমার নিজের কথা ভেবে আমি নিজেই মাঝে মাঝে ভীষণ অবাক হয়ে যাই দীপু, জানলা দিয়ে জয়া একবার বাইরে তাকায়, একটা জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ একদিন আমার মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!

কিন্তু তোমার ছেলে? তার কথা ভেবে তুমি একটা যন্ত্রের মতো হয়েও আমাদের সংসারে থাকলে না কেন? আমরা ঝণ্টুর জন্যে যতই করি—তার মার মতো কে তার জন্যে করতে পারবে?

জয়া আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে এগিয়ে যায়। হাত দিয়ে পর্দা অল্প সরিয়ে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। সে দিকে তাকিয়েই জোরে-জোরে আমাকে বলে, আমি জানি দীপু, মার কাছে ছেলের চেয়ে বড় কেউ নয়—কিছু নয়। কিন্তু তবুও আমি তোমাদের ওখানে থাকতে পারলাম না। ছেলের চেয়েও বড় কিছু—অদ্ভুত এক নিরাসক্তি তোমাদের সংসার থেকে ঠেলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, আমার দিকে ফিরে ও এবার বলে, একটু আগে তুমি আমাকে তোমার দাদাকে জব্দ করবার কথা বলছিলে না?

মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ। নিজের সংসার ছেড়ে তোমার পালিয়ে আসার কথা আমি এখনও ভাবতে পারি না—

পালিয়ে আসা নয় দীপু, জয়ার স্বর এবার বেশ রূঢ় শোনায় আমার কানে, এক কথায়, আমি শুধু বাড়ি বদলেছি। তোমার দাদার

কোন বিশেষ অস্তিত্ব আর আমার মনে নেই। তাই তাকে জব্দ করবার কথাও আমার মনে আসে না, যেন একটা বই খুলে তার অংশ জয়া এক সুরে পড়ে যায়, আমি নালিশ করেছি ওকে জব্দ করবার জন্যে নয়, আমার মুক্তির জন্যে—

কিন্তু দাদা যদি তোমার কাছে ক্ষমা চায়? তোমাকে আবার ফিরে যেতে বলে?

তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আমি ভুলে গেছি। ক্ষমা-অপমান-অভিমান স্বামী কিম্বা স্ত্রী—এসব কথা কেউ আমাকে বোঝাতে গেলেও আমার মাথায় আর ঢুকবে না।

সেকথা এতক্ষণে আমিও বুঝতে পেরেছি। আমি দাদার সম্বন্ধে কোন কথাই আর বলতে পারব না জয়াকে। ফিরে গিয়ে দাদাকে কী বলব তাই ভাবি। জয়া এখন যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। আমার মতের সঙ্গে তার মতের প্রভেদ অনেক। এখন এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই ভাল। মনে মনে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। রোদের কড়া তাপে পাখার হাওয়া গায়ে লাগছে না। গলাও যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়াতেই জয়া বাধা দেয়, সে কী, এখুনি যাচ্ছ যে? বাঃ, তা কি হয়। আর একটু বস—

ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বলি, না না, এখন চায়ের হাঙ্গাম করতে যেও না। আমি তো বাড়ি চিনে গেলাম। আর একদিন না হয়—

মিষ্টি হেসে জয়া বলে, এক মিনিট। ও চলে যায় সে-ঘর থেকে।

বসবার আর ইচ্ছে নেই আমার। তবু ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমাকে বসে থাকতে হয় চুপচাপ। বসে-বসে আমি জয়ার কথা ভাবি। হয়তো ও অনেক মিথ্যা কথা বলেছে আমাকে। ও বলেছে, ওর মন থেকে গোটা অতীতটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা হয় নি। ওর অতীত একটা অস্বাভাবিক দাহ হয়ে ওকে জ্বালাচ্ছে বলেই ও কাজের ছলে নিজেকে ভুলিয়ে

রাখছে। আর সেই এক কারণেই মামলা করেছে দাদার নামে। ওর মনের আর একটা বৃত্তি অর্থাৎ নিরাসক্তি যদি সত্যিই প্রধান হয়ে উঠত তাহলে ও এত তাড়াতাড়ি দাদার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হত না। যা হয় হোক—এমন একটা ভাব নিয়ে চলা-ফেরা করত সহজ মানুষের মতোই—আমাকেও আদেশের স্বরে তার নাম ধরে ডাকতে বলত না।

কিন্তু আমার ভাবনা ছিন্ন করে এক টুকরো খুশির মতো আবার জয়া এসে দাঁড়ায় এ ঘরে। ওর হাতে একটা ছোট ট্রে—তাতে মিষ্টির ছোট একটা প্লেট আর একটা সরবতের গ্লাস।

আমি কিছু বলবার আগেই জয়া হেসে বলে, কোন কথা না বলে খেয়ে নাও।

কোন কথা বলি না আমি। আস্তে আস্তে সরবতের গ্লাসে চুমুক দি। এখন আমার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা নেই। কী কারণে জানিনা, মনটা হঠাৎ ঝিমিয়ে গেছে। বানিয়ে-বানিয়ে কোন গল্প বলব ঝণ্টুকে ভেবে পাই না।

বাইরে হঠাৎ জুতোর খস খস শব্দ হয়। আর সে আওয়াজ শুনে দ্রুত পায়ে জয়া এগিয়ে যায় দরজার কাছে। তারপরই ওর সঙ্গে ঘরে আসে এক সুদর্শন মানুষ। সরবতের গ্লাস টেবিলের ওপর রেখে আমি ওকে দেখি। মনে হয় আমাকে দেখে—মানে একজন অচেনাকে ঘরের ভেতর বসে থাকতে দেখে প্রথমটায় আগন্তুক চমকে ওঠে। জয়া তাকে বসতে বলে।

বসুন শিশিরবাবু, আমার সঙ্গে জয়া তার আলাপ করিয়ে দেয়, আমার বন্ধু দীপা—আর ইনি আমাদের আপিসের মিস্টার শিশির ব্যানার্জি।

দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসি। আর আমি জোর করে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করি আমার মনের বিস্ময়ের ভার। কিন্তু এখন এখান থেকে অবিলম্বে আমার চলে যাওয়া দরকার।

সব কিছুই হঠাৎ আমার অপরিচিত মনে হয় আর জয়াকেও মনে হয় দূরের মানুষ।

এবার জয়া আমাকে আর বাধা দেয় না। হাসিমুখে চলে যাবার অনুমতি দেয়। পৌঁছে দিয়ে আসে রাস্তা অবধি। শিশিরবাবু উঠে দাঁড়ায়। আমি তার দিকে আর একবার তাকিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই।

আশ্চর্য, রাস্তায় নেমে আমার গরম লাগে না। আমার খেয়াল থাকে না যে পিচ গলছে, মাটি পুড়ছে আর ধরিত্রীর তপ্ত নিশ্বাসের মতো এক একবার ছুটে আসছে হাওয়ার ঝলক। আমি শুধু মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাতে পারি না। মাটির দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যাই। সামনেই ট্র্যাম লাইন।

চলতে চলতে আপন মনেই আমি হাসি। দাদার কথা ভেবেই আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জয়াকে সন্দেহ করবার আমার কোনই কারণ নেই। খুশি মতো চলা ফেরা করবার তার অবাধ অধিকার। কিন্তু দাদা যেন ওর সব খবরই রাখে এখনও। দাদা বোধহয় ওকে এই শিশির বাবুর সঙ্গেই দেখেছে কোথাও না কোথাও। আর দেখেছে বলেই সুপ্ত ঈর্ষার খোঁচায় আজ আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

তাই দাদার কথা ভেবে আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে—জয়ার কথা ভেবেও। ওরা মুখে পরস্পরের যতই দোষ খুঁজে বেড়াক তবু এখনও একজন আর একজনের কাছে একেবারে মৃত নয়। দাদার কাছে তো নয়ই, আর জয়া দাদার সম্পর্কে এখনও এত বেশি সচেতন যে ইচ্ছে করেই ওর সম্পর্কে তার উদাসীনতার কথা জানাতে চায়।

হঠাৎ আমার মনে হয় যে দাদাকে যদি সত্যি মন থেকে মুছে ফেলতে পারত জয়া তাহলে এখনই এত ঘটা করে মামলা করতে যেত না। আর আমি তাকে যে নামেই ডাকিনা

কেন, তা নিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ করে দাদাকে প্রধান করে তুলত না।

কিন্তু রাস্তা পার হতে গিয়ে আকস্মিক এক চমকে—ভয়ের হিম-ছোঁয়ায় আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। আমার খেয়াল রইল না যে প্রখর গ্রীষ্মের পিচ ঢালা রাস্তায় আমি একা দাঁড়িয়ে আছি।

এ সেই মানুষ। একে চিনতে আমার ভুল হয় নি। ভুল হবে না। যে মানুষ এসেছিল এক বর্ষার দুপুরে আমাকে প্রেমাংশুর মুছে যাওয়ার খবর শোনাতে—যে মানুষ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত করে দিয়েছিল আমার চৈতন্য—আজ আবার বৈশাখের উষ্ণ বাতাসে আমি কেন দেখলাম তাকে। একটা জীবন্ত দুর্লক্ষণের মতো সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু হঠাৎ একটা উগ্র কাঠিন্য আমার দেহকে যেন সোজা করে দেয়। ভীতির সামান্য রেশ থাকে না মনের কোথাও। ও এগিয়ে আসুক। ওকে ভয় কি আমার। আর কী আছে আমার হারাবার। তবু আমি ওর দিকে তাকাই কঠিন চোখে। যেন আমার সর্বনাশের জন্যে নীরব ভর্ৎসনায় ওকে শাসন করি।

আমি আপনাকে দেখেই এলাম, কোন সঙ্কোচ নেই, স্পষ্ট বিনীত স্বরে ও বলে, আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন না। মোটে একদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে—

আমি চিনতে পেরেছি।

দেখুন, সে-খবর আপনাকে দেবার পর একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমাকে কাটাতে হয়েছে, মানে, ক্ষমা করবেন, দুর্ঘটনা হয়তো আমার কাছে খুব একটা বড় ব্যাপার নয়, আমরা কলকাতার রাস্তায় অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখি। কিন্তু আপনার অবস্থা দেখে সেদিন—আমি জানতাম না যে আপনারই নাম দীপা—

আমি ওর দিকে তাকাতে পারি না। এতদিন পর আমার মনে

এমন প্রতিক্রিয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার শ্রবণ যেন বিকল হয়ে গেছে হঠাৎ—আমার দৃষ্টি অন্ধ। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না—কিছু শুনতে পাচ্ছি না। এমন কি, যে মানুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ভারী স্বরে কথা বলে যাচ্ছে আমি যেন তার অস্তিত্বও অনুভব করতে পারছি না। কিন্তু এমন করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। এমন করে এসব কথা কতক্ষণ আর শোনা যায়। তবুও এখান থেকে সরে যাবার ক্ষমতাও যেন আমার নেই।

ও কথা বলে যাচ্ছে, তারপর, আমি ভেবেছিলাম একদিন না একদিন যেন কোন একটা সুখবর আপনাকে দেবার আমি সুযোগ পাই। কিন্তু তা কী হয়।…যদি আগে থেকে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ থাকত তাহলে হয় তো আমি এত বিচলিত হতাম না—ঠিক বলতে পারি না—

এবার আমি যেন একটা ঘোরে কথা বলে যাই, আপনি কী করবেন, তবু আপনি খবর দিয়েছিলেন বলেই—

এ খবর যে কেউ দিতে পারত। আমি এ কাজ এড়িয়ে যেতে পারতাম, ও একটু থেমে বলে, শুধু একটি মাত্র কারণে আমাকে আপনার কাছে যেতে হয়েছিল—

কী কারণ?

কথা বলতে চায় না ও এবার। ইতস্তত করে। অন্য দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর বলে, ওসব কথা থাক। ওসব কথায় আর কাজ কী। আপনাকে এখন দেখে মনে হয়—

কী?

আপনি সামলে উঠেছেন। নতুন করে পুরনো শোকের কথা তুলে লাভ নেই। আপনাকে একদিন মর্মান্তিক দুঃখের খবর দিয়েছিলাম আর কিছু বলে এতদিন পর আবার আপনাকে বিষণ্ণ করে তুলব না।

খুব আস্তে কথা বললেও আমি বুঝতে পারি আমার স্বরে কেমন

একটা কৌতূহল ফুটে ওঠে, আর বোধহয় আমি ভেঙে পড়ব না। আপনি বলুন ?

ও বলতে চায় না তবুও। অন্য কথা বলে আমাকে প্রেমাংশুর কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যেই. কিন্তু আমি আপনাদের বাড়ির আশে পাশে অনেকদিন গেছি, হয় তো আপনার অবস্থা জানবার জন্যে—আপনার খবর নেবার জন্যে। কিন্তু আপনি বোধহয় সে-ঘটনার পর-পর ও বাড়ি ছেড়ে দেন—

হ্যাঁ। আমি আমার বাবার বাড়িতে চলে যাই—হিন্দুস্থান পার্কে।

আমি ইচ্ছে করেই পাড়ার কাউকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করি নি, পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে হাতের মুঠোয় রেখে ও বলে, সাহস হয় নি।

কেন ? হঠাৎ যেন আমার মুখ ফসকে ছোট একটা অবান্তর প্রশ্ন ছুটে যায়।

কেন ঠিক বলতে পারি না। বোধহয় স্বাভাবিক সঙ্কোচ। তা ছাড়া আমি আপনার স্বামীকে চিনতাম না। আপনাকেও—

গ্রীষ্মের কড়া রোদে দাঁড়িয়ে এখানে আর কথা চালানো যায় না। কিন্তু এখান থেকে এখন সরে যেতেও ইচ্ছে করে না আমার। পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোন বনভূমি থেকে আজ আবার আমার সামনে দাঁড়িয়েছে এই মানুষ। যখন আমার মনেও প্রেমাংশু এক টুকরো স্মৃতির সজল ঝলক ছাড়া আর কিছু নয়—যখন তার সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যেতে বসেছে সকলের কাছে—তখন এ মানুষ যেন রূঢ় স্মরণের মতো সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্বরে জানায়, এখনও আছে প্রেমাংশু। তাই বিমূঢ় বিস্ময়ে রোদে জ্বলা প্রশস্ত রাস্তার ওপর এই লোকের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি মূক একটা পুতুলের মতো প্রেমাংশুর আরও কথা শোনবার উত্তেজিত আগ্রহে। কেন এ মানুষ নিজেই এল আমাকে সে-খবর শোনাতে তা জানবার জন্যে আমি হঠাৎ চলে

যেতে পারি না এখান থেকে। আর ওকে আবার স্পষ্ট প্রশ্ন করতেও পারি না।

যাক, কোথায় যাবেন এখন? আপনি ভাল আছেন দেখে খুশি হলাম। আর আমার কোন অস্বস্তি নেই। একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?

আমি কিছু বলতে পারি না তাকে। আমি যে একটুও ভাল নেই সেকথাটা ওকে না জানালে আমার চলবে না। কিন্তু আমি তা জানাব কেমন করে। আমার সব দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা এত অল্প সময়ের মধ্যে ওকে জানিয়ে এখুনি বুঝিয়ে দেয়া যায় না আমার বর্তমান অবস্থা।

হাত বাড়িয়ে একটা হঠাৎ-আসা ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে ও আমাকে বলে, উঠুন?

আপনি কোন দিকে থাকেন?

আমি? প্রতাপাদিত্য রোডে—

তাহলে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই?

ও বলে, না না, আমিই বরং আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই—

হ্যাঁ, ও চলুক আমার সঙ্গে। প্রেমাংশুর বনভূমির মানুষ। ওকে আমি এত তাড়াতাড়ি হারাতে চাই না। আজ না হলেও একদিন ওরই মুখ থেকে আমি সব কথা শুনে নেব—প্রেমাংশুর চৈতন্য হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তের সব কথা আমি আবার নতুন করে শুনব। আর, ওকে জানাব অল্প-অল্প করে আমার রঙীন শাড়ি আর প্রসাধন আর হাসি-হাসি মুখের আড়ালে কত কান্না জমে আছে প্রেমাংশুর জন্যে। আমি ভাল নেই—ভাল নেই।

আজ অনেকদিন পর—প্রেমাংশু হারিয়ে যাবার পর বোধহয় এই প্রথম আমার ভাল লাগছে ট্যাক্সি—ভাল লাগছে এই দ্রুত গতি। আমি যেন এইমাত্র জানতে পারলাম, প্রেমাংশু মুছে যায় নি—হারিয়ে যায় নি। এই মানুষের মতো সে-ও বেঁচে আছে।

কিন্তু কতটুকুই বা পথ? আর একটা কথা বলবার সুযোগ

হয় না আমার। ঝণ্টুর জন্যে যা হোক একটা কিছু কিনে নেবার কথাও খেয়াল থাকে না। বাড়ি এসে যায়।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। এখুনি এই ট্যাক্সিটাই ওকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। হয়তো আমার সঙ্গে আর কখনই ওর দেখাই হবে না। আর অন্তিম মুহূর্তে যদি কোন কথা বলে থাকে প্রেমাংশু তা-ও শোনা হবে না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে ও বলে, আমি যাই?

আবার আসবেন তো? আশা করি এখন আসতে আপনার আর কোন সঙ্কোচ হবে না।

না, হবে না। তবে আসবার তেমন আগ্রহও হয় তো আমার হবে না—

ওর কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠি, কেন?

দেখা তো হল। বুঝে গেলাম আপনি ভাল আছেন। আমি এখন নিশ্চিন্ত।

ত্রস্ত ব্যাকুল স্বরে তাড়াতাড়ি বলি, তবুও আসবেন। ঠিক?

আমাকে দেখতে দেখতে কথা বললেও ওর দৃষ্টি যেন চলে যায় অনেক দূরে। বেশ জোর দিয়েই যেন বলে, আসব।

ট্যাক্সি চলে যায়। আমি ইচ্ছে করেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। পেট্রলের গন্ধ, এঞ্জিনের গুঞ্জন আমার যেন ভাল লাগে আজ। কোন কোনদিন যখন বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে অফিস যেত প্রেমাংশু তখন আমি ঠিক এমন করেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।

কতক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ দরজা খুলে দাদা এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। আর আমি দাদাকে দেখে চমকে উঠি—যেন আমি যে প্রেমাংশুর খবর পেয়েছি সেকথা জেনে ফেলেছে ও। অসহায় একটা মানুষের মতো আমি তাকিয়ে থাকি দাদার দিকে আর এতক্ষণ পর আমার মনে পড়ে যে ওর জন্যেই আমি আজ সকালবেলা বেরিয়েছিলাম।

এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস, বোধহয় আমার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে দাদা বলে, দেখা হয়েছিল ?

আমি ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলি, হ্যাঁ।

কে তোকে পৌঁছে দিয়ে গেল ? জয়ার বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল নাকি ?

না।

তাহলে ও কে ? তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?

একটা মিথ্যা যেন সহজ সত্যের মতো বেরিয়ে আসে আমার মুখ থেকে, প্রেমাংশুর এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল—

দাদাও আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ও বোধহয় ভাবে যে আমি এবার ওকে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে জয়ার সব কথা শোনাব। কিন্তু আশ্চর্য, ওসব কথা আমার মনেই থাকে না। আমি শুধু ভাবি কী নাম সেই মানুষের। এত কথা হল আমার কিন্তু তার নামটা জানবার কোনই সুযোগ হল না।

আমি কোন কথা বলি না দেখে দাদা বোধহয় হতাশ হয় মনে মনে। ও ভাবে, জয়া আমার সঙ্গে হয়তো ভাল করে কথা বলেনি কিম্বা কঠিন কথা শুনিয়ে আমাকে বিদায় করে দিয়েছে।

আমার ঘরে আসে দাদা। আমি কিছু বলবার আগেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। কী একটা কল্পনা করে ওর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু আমি কিছু বলতে পারি না তাকে। মনে হয় যেন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রেমাংশুর সঙ্গে আমার মিলনের অসহ মুহূর্তের ঠিক আগে একজন বাইরের লোক বাধার মত দাঁড়িয়ে আছে দুজনের মাঝখানে। দাদাকে এখন আমার ভাল লাগে না। ঝগড়া-তর্ক মান-অভিমানের কথা তুলে এক মুহূর্তও নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। ঝণ্টুও এখন না এলে ভাল হয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দাদা আর ধৈর্য ধরতে পারে

না। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে চেপে-চেপে বলে, খুব মেজাজ দেখিয়েছে তোর কাছে না?

আমি ছোট্ট উত্তর দি, না।

তবে কী বলেছে?

তোমার ওপর তার কোন টান নেই। তার কাছে তুমি পাড়ার একটা লোকের মতো। তার নতুন বন্ধুও হয়েছে—

জানি আমি সব—জানি। কোর্টে গিয়ে আমাদের কেচ্ছা করে ও জিতবে। জিতুক। দেখি ও কেমন করে ঝণ্টুকে নেয়। আমি ঝণ্টুকে মেরে ফেলব তাও ওকে দেব না—

অন্য সময় হলে দাদার হিংস্র প্রবৃত্তির কথা শুনে হয় তো আমি চীৎকার করে ওকে থামিয়ে দিতাম। কিন্তু এসব কথায় এখন কোন প্রতিক্রিয়া হয় না আমার মনে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে একা থাকতে চাই। কাজ দিয়ে এখন আর আমার নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার দরকার নেই—ভোলবার মতো কোন ব্যথা আর বোধহয় আমার নেই।

তুই চুপ করে আছিস দীপু, আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছিস না, যেন মনে মনে একটা পাল্টা আক্রমণ করবার জন্যে তৈরি হয়ে দাদা বলে, আর কী বলেছে ও তোকে?

তোমার নামও করে নি। তবে তার বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আর, 'বৌদি' বলে ডাকতে আমাকে বারণ করে দিয়েছে—

কেন তুই ডাকতে গেলি ওকে 'বৌদি' বলে? ওখানে যাওয়া তোর খুব ভুল হয়ে গেছে দীপু। আর কখনও যাস না—

আমার যে সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল না আর দাদাই আমাকে পাঠিয়েছিল জোর করে সেকথা এখন আমার মাথায় আসে না। কিন্তু জয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ভেবে বুকজোড়া খুশি আমাকে পেয়ে বসে। আর হারানো একটা মানুষকে হঠাৎ

ফিরে পাওয়ার আনন্দে আর সকলের দুঃখ-যন্ত্রণা তুচ্ছ হয়ে যায় আমার কাছে। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের সুখ নিয়ে আমি বিভোর হয়ে থাকি। বারবার একটা কথাই শুধু মনে হয়, কেন—কেন সে মানুষ নিজেই এসেছিল দুর্ঘটনার খবর আমাকে শোনাতে—আবার কখন এসে সে স্পষ্ট করে তুলবে আমার কাছে সব ?

আমি জয়ার বাড়িতে আর যাব না। নতুন কোন কাজ নিয়ে আর আমার নিজেকে ভুলিয়ে রাখার দরকার নেই বলেই আমি ইচ্ছে করে দাদাকে নিরাশ করি। এসব ব্যাপারে থেকে আমার নির্জনতার বিঘ্ন বারবার ঘটাব না বলেই সব কাজের দায় চুকিয়ে আমি দাদাকে সরিয়ে দিতে চাই। কিন্তু এখনও আমার ঘর থেকে যায়না দাদা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঝণ্টু। আমাকে দেখছে। দাদা আমার ঘরে বসে আছে বলে ও আসতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু এখন ওকে ডেকে ওর মার কথা শোনাবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার। হঠাৎ আমার এই পরিবর্তনের কথা ভেবে প্রেমাংশুর ছবির দিকে তাকিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই।

শোকের জগৎ থেকে আমি তো বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম এদেরই জন্যে ; কিন্তু আজ আমার আনন্দের জগতে প্রবেশ করতে পেরে কী নিষ্ঠুর অবহেলায় আমি এদেরই সরিয়ে দিতে চাই আমার চোখের সামনে থেকে।

দাদা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দেখা যাক—একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ও কেমন করে আমাদের সকলকে জব্দ করে—

দাদাকে থামিয়ে দেবার জন্যে বলি, আগে দেখ শেষ অবধি কী হয়। আগে থেকে এত মাথা গরম করলে চলবে কেন—

পেছনে কোন লোক না থাকলে ওর কিছুতেই এত সাহস হত না, দাঁত চেপে দাদা বলে, এমন বদমাশ লোকগুলোকে গুলি করে মারতে হয়।

দাদার আস্ফালন দেখে এতক্ষণ পর হাসি পায় আমার, ওসব

করতে যেও না দাদা—তাহলে আবার আর এক 'কেসে' জড়িয়ে পড়বে—

ওদের খুন করে ফাঁসি যেতেও আমি রাজি। যারা ভদ্রলোক তারা কখনও যে মেয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করে না—

জয়াকে সত্যি-সত্যি কেউ সাহায্য করছে কি-না তুমি জাননা—দাদার কথা-বার্তা চেহারা একেবারেই ভাল লাগছে না আমার এখন। তাই ওকে একটু খোঁচা মারবার জন্যেই বলি, তোমাকেও তো শৈলেনবাবু সাহায্য করছে—

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দাদা বলে, শৈলেনকে তুই আজকের কোন কথা বলিস না।

তার সঙ্গে বেশি কথা বলাবলির সম্পর্ক আমার নয় দাদা, আমি চুল খুলতে খুলতে স্নানের জন্যে তৈরি হই। দাদাকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে আমি নিজেই এবার বেরিয়ে যাব এ ঘর থেকে। আমি একা থাকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি।

কিন্তু হঠাৎ এই কথা কাটাকাটির দূষিত আবহাওয়ায় আমি যেন হারিয়ে ফেলি আমার আনন্দের জগৎ। দাদাকে আমার ঠিক শৈলেনের মতোই মনে হয়। ওর কথায় আমি যেন কোন শ্লীলতা খুঁজে পাই না। এই বয়সেও কেন ও একটা কথা কিছুতেই বুঝতে চায় না, যে মেয়ে অপমানে জ্বলে-জ্বলে সব ঠেলে ফেলে চলে যায়, ভয় দেখিয়ে কিম্বা আরও অপমান করে তার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। তার সামান্য শ্রদ্ধা পেতে হলে কিম্বা তাকে নতুন করে জয় করতে হলে নিজেকে হার স্বীকার করতেই হয়। শুধু জয়ার কাছে নয়, শৈলেনের কথা শুনে শুনে দাদা আমার কাছেও নিজেকে ছোট করে তুলেছে।

দাদা আস্তে আস্তে চলে যায় আমার ঘর থেকে। আর আমি স্নান করতে যাবার আগেই বিমর্ষ মুখে ঝণ্ট আমার পাশে এসে

দাঁড়ায়। বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টায় আমি হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নি।

আজ তো ইস্কুল নেই। তুপুরবেলা একটু ঘুমতো হয়। তুমি এখনও ঘুমোওনি কেন ঝণ্টু বাবু?

আমার কথার ঠিকমতো উত্তর না দিয়ে ও বলে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে পিসি? আমাকে নিয়ে যাওনি কেন?

তু-এক মিনিট চুপ করে থাকি। হঠাৎ মিথ্যা কথা বলতে বেধে যায়। কিন্তু সব দিক ভেবে ঝণ্টুর গালে হাত বুলিয়ে বলি, যা রোদ্দুর—বার হলে তোমার ঠিক অসুখ করত—

চোখ বড় করে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঝণ্টু বলে, মা আসবে না পিসি?

আমি চমকে উঠলেও আজ তাকে কোন আশ্বাস দিতে পারি না। আস্তে শুধু বলি, আমি তোমাকে শিগগিরই একদিন তোমার মার কাছে নিয়ে যাব ঝণ্ট—

বাবা যে বারণ করল? তুমি তো আর কখনও মার কাছে যাবে না—

যাব। একদিন আমি তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব।

কাঁদে না ঝণ্টু। ঠোঁট ফোলায়। ওকে দেখে আমি বুঝতে পারি আমার সামনে ও কাঁদতে চায় না! কান্না চাপবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা করলেও টপটপ জল পড়ে ওর চোখ থেকে।

সান্ত্বনার একটা কথাও আমি বলতে পারি না—ইচ্ছেও করে না। এদের সকলের ওপর রুদ্ধ এক আক্রোশে আমার কথা যেন বন্ধ হয়ে যায়। আমি ঝণ্টুর চোখ মুছিয়ে ওকে আদর করি। কিন্তু এবার ও আমাকে স্পর্শ করতে দেয়না ওর ছোট্ট দেহ। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

যাক। এক-এক করে সকলেই চলে যাক। আর কাউকে দরকার নেই আমার—কারুর ভাবনায়ও দরকার নেই। একটা

নিবিড় একাকীত্ব কখন থেকে অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে! তার বিশাল অরণ্যে আমি ছোট একটা সবুজ পাখির মতো নিখোঁজ হয়ে যেতে চাই।

ভেবেছিলাম আজ বিকেলে কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি একা-একা ঘুরে বেড়াব রাস্তায়। সারা দুপুর—যদিও আমি ঘুমিয়ে নেব ভেবেছিলাম—কিন্তু উত্তেজনার এক-এক শিহরে ঘুমের অল্প ঘোরও লাগতে পারেনি আমার চোখের পাতায়।

আমি জেগেই ছিলাম কিন্তু তবুও আমার আশেপাশে কী ঘটছে—রোদের রেখা জানলার ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আলমারীর ওপরে দেয়ালের গায়ে কাঁপছে কি না, ঝি ঠাণ্ডা জলের কুঁজোটা ভরে রাখবার জন্যে এসেছিল কি-না, ঝণ্টু, আমার গায়ের ওপর একবারও হাত রেখেছিল কি-না—এসব কিছুই আমি জানিনা। চোখ খোলা থাকলেও আমার দৃষ্টি আজ দুপুর বেলা এসব ধরবার জন্যে যেন প্রস্তুত ছিল না।

আমি জানি আমার মনের এই প্রতিক্রিয়া একটা অবোধ বিলাস—স্মৃতির আর একটা উষ্ণ স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি জানি, একটা মানুষ যে প্রেমাংশুর মাত্র শেষ কয়েকটি মুহূর্তের সাক্ষী—তার আগমন প্রেমাংশুর পুনর্জন্ম নয়—আমার কাছে সে চিরকালের মতো মৃত।

তবু আজ সারা দুপুর—বিকেলবেলা রোদ পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেন একটা অলৌকিক আবেশে প্রেমাংশুকে জীবন্তই অনুভব করেছি। আর তারপর একটি-একটি করে ঘরের জানলা দরজা খুলতে খুলতে আমার অনুভূতি নাড়া খেয়েছে বটে কিন্তু সেই মানুষ—আমি যার নামও জানিনা—যাকে আমি এতদিনে শুধু দু বারই দেখেছি—সে প্রেমাংশুর স্মৃতি দিয়ে—তার কথা শুনিয়েই

একটা দুর্বার আকর্ষণে সজাগ উন্মুখ করে তুলেছে আমার শ্রবণ দৃষ্টি ঘ্রাণ—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়। ওই একটি মানুষই—এখন ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো আমার মনে হয়, প্রেমাংশুর সঙ্গে আমার—মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের স্বাভাবিক যোগাযোগের একটা দৃঢ় সেতু তৈরি করে দিতে পারে।

আর, এই নির্মাণের ইঙ্গিত, এই যোগাযোগের প্রখর আভাস, যা গ্রীষ্মের কড়া রোদের মতোই ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, তা-ই আমাকে এখন স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকতে দেয় না। এই বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর জীবন-মৃত্যুর আর কল্পনা-বাস্তবের একটা গুঞ্জন আমাকে দাঁড় করাতে চায় যেখানে এ সংসারের কোন ছায়া নেই! কোন কাজ নেই। যেখানে আমি আমাকে নিয়ে—আমার ভাবনা নিয়ে আর সকলকে মুছে ফেলতে পারি।

মা-বাবা আর দাদার জন্যে চা করে, ঝণ্টুর জন্যে দুধের ব্যবস্থা করে আমি তৈরি হয়ে নি বাইরে বার হবার জন্যে। কোথাও যাবনা—এখান থেকে ট্র্যাম নিয়ে চৌরঙ্গী অবধি যাব। রাস্তায় অনেক মানুষ, দোকান আর গ্রীষ্মের অপরূপ বিকেল দেখতে দেখতে ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই যদি অনেক দূর অবধি আকাশে মেঘের লাল পাতলা রঙ স্থির হয়ে থাকে—আমি ট্র্যাম থেকে নেমে পড়ব। নামবই।

তারপর একটা আশায়—একটা হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার ব্যাকুলতায় আমি তাকাব প্রত্যেক মানুষের মুখের দিকে। তারা যা খুশি ভাবুক। আমি একজনকেই খুঁজব অন্ধকার ঘন না হওয়া অবধি। আর তাকে দেখতে না পেলেও, একটা অনুভূতি, খোঁজার থরোথরো আবেগ, কি নরম—খুব নরম, তুলোর মতো একটা আমেজ আমাকে, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যে, অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আমি কাকে খুঁজব? প্রেমাংশুকে? সে কোথায় আমি জানি না। যে সবুজ—ঘন সবুজ বনভূমির রঙ আজ আমাকে স্পর্শ

করে গেছে আর যে মানুষ এসেছিল, সে কি আমাকেও নিয়ে যেতে পারে না প্রেমাংশুর কাছে? আমি কি তাকে খোঁজার আশায় যে-কোন সবুজ প্রান্তরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারি না? একটা কথা শুধুই যে মনে হয়, কী তার নাম? সে-মানুষ কোথায়!

গ্রীষ্মের আশ্চর্য বিকেল, অপরূপ মন্থরতায় গড়িয়ে-গড়িয়ে শেষ হতে যায়—শেষ করে দেয় আমাকেও আকাশ-ঢালা মিষ্টি ক্লান্তিতে। ঘরে বসেই বুকের মধ্যে ধরতে পারি বিশাল—অতি বিশাল এক সবুজ প্রান্তর। একা-একা ট্র্যামে চড়ে দূরে যাওয়া আর না যাওয়া, হঠাৎ আমার মনে হয়, দুই-ই যেন এক।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখি ঝন্টুর হাত ধরে দাদা বেরিয়ে যায়। যাবার আগে আজ কোন কথা বলেনি আমার সঙ্গে। আমার ওপর ওর রাগের কী কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

তবু যাক ওরা। একবার বাবাকে দেখে এসেছিলাম ওপরে গিয়ে। বেশি কথা বলছেন না আজ। চোখ দুটো ক্লান্ত কিন্তু সেখানে স্পষ্ট উষ্মার ছায়া। মা একবারও আজ বাবার ঘর ছেড়ে বার হচ্ছেন না। বাবাও বোধহয় শুধু তাঁকেই কাছে রাখতে চাইছেন।

মা-ও কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। মুখ নামিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে কথা বলছেন না একটাও। মাঝে মাঝে মাথা তুলে শুধু তাঁকে দেখছেন। বোধহয় এখনও, পরস্পরের এই কঠিন নীরবতায় একজন মনে মনে দোষ দিচ্ছেন দাদাকে, আর একজন জয়াকে। আর এই মতান্তরে ওঁরা দুজন, এই বয়সেও, রোগশয্যায়ও, কেউ কারুর কাছে সহজ হতে পারছেন না। তাই একই ঘরে দুজন পাশাপাশি বসে আছেন চুপচাপ। যেন করুণার কণামাত্র নেই কোথাও।

মা-বাবার ঘরে এই নিরানন্দের ছায়া, এই মূক মান-অভিমান

আমাকে আবার বেদনা দেয়, হতাশার বেদনা। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না ওঁদের ঘরে। কথাও বলতে পারি না। নিচে চলে আসি। আমার ঘরের পাশে বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। অনেকক্ষণ।

তবু, একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েও অনেক দূরের একটা সবুজ প্রান্তরকে কাছে টেনে আনি। চোখের সামনে থেকে বুকের মধ্যে। বেদনা থেকে আনন্দে। আর একটা মানুষের সঙ্গে, যে-কোন একটা জীবন্ত মানুষের সঙ্গে, যে কোন কথা বলার উদ্দাম আগ্রহে আমার শরীরটা হঠাৎ যেন অনেক ওপর থেকে ঝরে পড়া পাখির পালকের মতো হালকা মনে হয়।

কিন্তু কোন মানুষ নেই এখন। যারা আছে, রাস্তায় দেখি যে মানুষগুলির ভিড়, যাদের এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জাপানী পুতুলের মতো মনে হয়, তারা হেঁটে যায় কোনদিকে না তাকিয়ে। এক-একটা ছেলে। এক-একটা মেয়ে। এক-একটা যন্ত্রের মতো। ওরা যেন তুষারে-তুষারে সব উত্তাপ হারিয়ে ফেলেছে। আমি ওদের দেখতে-দেখতে হাসি। কোন মিল আজ খুঁজে পাইনা ওদের সঙ্গে।

গ্রীষ্মের আশ্চর্য রঙ, মন্থর আকাশে চিকন আলোর ঝিলিক আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসে। আর, আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যায় সাদা বকের সারি, ছোট ছোট পাখির দল উড়ে যায়—হারিয়ে যায় অন্ধকারের সঙ্কেত পেয়ে। কিন্তু এখনও অন্ধকার হতে অনেক দেরি।

এখন, ভরা গ্রীষ্মের অপরাহ্নের সবুজ-শ্যামল আভায় একটা প্রতীক্ষা কাঁপে। আর আমার দাঁড়িয়ে থাকতেও ইচ্ছে করে না, ঘরে ঢুকতেও মন চায় না। স্পষ্ট করে বোঝা না গেলেও, সেই প্রতীক্ষার অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখি অল্পে-অল্পে আলোর ডুবে যাওয়া।

এখুনি ফুটে উঠবে রহস্যের আর একটা জগৎ। ঘুম-নির্জনতায় অনেক দরজা, যা বন্ধ থাকে আলো আর কোলাহলের জগতে—তা

খুলে যাবে একটু-একটু করে। অন্ধকারের আগে আগে কাঁপা-কাঁপা হাতের মৃদু করাঘাত প্রায়ই যেন আমার কানে এসে বাজে। কিন্তু তারপর আর কিছু না। ঝাপসা অস্পষ্ট—একটা উত্তাল সমুদ্রে শুধু ঢেউএর পর ঢেউ।

প্রায় ডুবে আসা আলোয়, আমি এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শৈলেনের চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাই। ও এগিয়ে আসছে এদিকে। মাথা তুলে হঠাৎ দূর থেকে আমাকে দেখতে পায় ও। আর মনে হয়, ইচ্ছে করেই ও চলার গতি একটু শ্লথ করে দেয়।

আজ, ওখান থেকে শৈলেন দেখতে পায় না, ওকে দেখে শ্লেষের হাসির একটা রেখা ফুটে ওঠে আমার ঠোঁটে। আমি ওকে বিদ্রূপ করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হই। ওরই এক-একটা কথা, যা আমার মনে বিষাদের এক হিম-প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল, আজ আত্ম-বিশ্বাসের স্থির দীপ্তিতে আমার মনে হয়, কেন মনে হয় আমি জানিনা যে তার কথাগুলো ভুল আর ওকে ওরই এক-একটি কথার রূঢ় উত্তর দিয়ে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, কোন মূল্য নেই তার কথার। কোন সত্য নেই—যুক্তি নেই।

শৈলেনকে আজ অন্ধকারের আগে আগে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে হিংস্র বন্য আনন্দের কড়া ঝাঁজে আমার চেহারাটাই বুঝি অন্যরকম হয়ে যায়। বারান্দায় স্থির হয়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসি।

কিন্তু আমার এই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দরজা খুলে শৈলেনকে অভ্যর্থনা করার আসল কারণ সে বুঝতে পারে না। তার মুখ দেখে বুঝতে পারি, সে ভেবেছে, আমি যেন তাকে দেখতে পেয়েই এক পুরানো বন্ধুকে হঠাৎ-পাওয়ার আনন্দে নিচে নেমে এলাম।

আমাকে দেখে শৈলেন বলে, গ্রীষ্মের বিকেলে এমন করে ঘরে বসে থাক কেন, দীপা? কাছাকাছি কোথাও বিজন কিম্বা ঝণ্টুর সঙ্গে—

ওরা বেরিয়ে গেছে—

তুমি গেলে না যে ?

আমি হঠাৎ হেসে বলি, তাহলে তো আপনাকে এসে ফিরে যেতে হত। আপনি কার সঙ্গে কথা বলতেন ?

আমার কথা বলার ধরন দেখে শৈলেন আজ বোধ হয় একটু অবাক হয়। কিন্তু নিজের বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে ওর দেরি লাগে না। আর, ও হাসে। বসবার ঘরে এসে রোজ যে চেয়ারে ও বসে আজও তার কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে আমাকে বলে, বস দীপা।

আজ একটা উল্লাসের কড়া স্বাদে আমার মন ভরে আছে। আর শৈলেনকে দেখে আমি আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি, সে উল্লাস শুধু রিমঝিম ধ্বনি তুলে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে দেয় না, ঘুম ছুটিয়ে দেয়। আর, আরও আশ্চর্য, তার সঙ্গে একটা জ্বালাও যেন মিশে থাকে—শৈলেনকে রূঢ় আঘাতে বোবা করে দেবার জন্যে যেন আমার মনে এক ভয়ঙ্কর ঈর্ষা জমে ওঠে। তাই আজ ওর সঙ্গে প্রথমেই আমি হালকা আপোষ করে নি। বোধ হয় শৈলেনকে আমার আর একেবারেই প্রয়োজন নেই বলে তাকে আজ আমি তীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর রকম তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দিয়ে আপন মনে একা-একা হেসে উঠতে চাই। কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারি না যে কার আশ্বাসে, কোন অবলম্বনের জোরে, আমার মনে কোন মানুষের ছায়ার প্রভাবে আমি শৈলেনের কাছে কঠিন হিংস্র হয়ে উঠতে চাই।

যাক, ভালই হল, আমার পাশে বসে শৈলেন হঠাৎ কথা বলে ওঠে, ভালই হল আজ বিজন বাড়িতে নেই। তোমার সঙ্গে আজকাল একেবারেই তো কথা বলতে পারি না—

হয় তো ভূমিকা বেশ দীর্ঘ করে তুলত শৈলেন, কিন্তু সে কথা শেষ করবার আগেই আমি কৃত্রিম অভিযোগের সুরে বলে উঠি,

কোনদিনই বা বলতেন! আর আপনার কথাগুলো বোধহয় ঠিক আমার জন্যে নয়—

হঠাৎ চমক লাগার ভঙ্গিতে ঘাড় সোজা করে শৈলেন জিজ্ঞেস করে, কেন?

কারণ আপনি যে কথা বলেন, যা ভাবেন তা আমার মতের সঙ্গে একেবারেই মেলে না—

শৈলেন আমাকে দেখে, ওর চোখে অদ্ভুত এক আবেশ, গ্রীষ্মের ফুরিয়ে যাওয়া বিকেলের গেরুয়া আভায় এই চার দেয়ালের ঘরে শৈলেনের দৃষ্টির অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শৈলেন বলে, মতামতের মিল-অমিলের প্রশ্ন কেন ওঠে দীপা? তোমার সঙ্গে তো আমার কোন কথাই হয় নি—একটু থেমে ও আবার বলে, তুমি তো জান, জীবনের প্রথম থেকেই আমি তোমাকে দেখছি—

আমি হালকা স্বরেই বলি, কিন্তু আমি তখন জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, এখন অল্প অল্প জানি বলেই বুঝতে পারি আপনি এখনও বোধহয় আমাকে শুধু চোখ দিয়েই দেখেন আর তখনও, মানে যখন আমার জীবনে কোন বিপর্যয় ঘটে নি—

শৈলেন বাধা দিয়ে বলে, ওকথা থাক দীপা।

কিন্তু ও কথা বাদ দিলে কোন কথাই থাকে না। আজ আমি যদি এমন অবস্থায় এসে না দাঁড়াতাম তাহলে, বলুন, গ্রীষ্মের বিকেলে এমন করে, ঘরে এখন কেউ নেই, কেউ বাধা দেবে না—আপনার সঙ্গে, আমার যতক্ষণ খুশি কথা বলতে পারতাম কী?

দু-চার মিনিট শৈলেন চুপ করে বসে থাকে। চুপ করে বসে থাকলেও, আমি বুঝতে পারি, ওর চোখ কথা বলে, ওর দেহ চঞ্চল হয়ে ওঠে আর শৈলেনকে দেখতে-দেখতে আমার মনে হয়, ঠিক এই মুহূর্তে হয় তো এক অদ্ভুত উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওর মনে সংস্কারের বেড়াটাও নড়ে যায়। আর আজ প্রথম, যখন আমার মনে ওর জন্যে

আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তখন ও এসে শক্ত করে, খুব বেশি শক্ত করে বোধহয় ওর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়েই আমার দুটো হাত চেপে ধরে।

শৈলেনের এই উত্তেজনার জন্যে আজ বিকেলে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমার মনে হয়, উত্তেজনার ঘোরেই অল্প পরে মনে হয়, ওকে বাধা দিতে হবে—দিতেই হবে। না হলে, ওর মনে হবে, ওকে, ওর ইচ্ছাকে, কামনাকে, নির্জন ঘরে ওর মনে হঠাৎ-আসা পৌরুষের এক আবেগকে আমি যেন প্রশ্রয় দিচ্ছি।

হয় তো দিতাম। আজ যদি আর একজনের সঙ্গে আমার দেখা না হয়ে যেত আর তাকে যদি মনে না হত প্রেমাংশুর বনভূমির মানুষ, যদি প্রেমাংশু আবার আজ থেকে বেঁচে না উঠত আমার মনে নতুন করে তাহলে হয় তো এখন যৌবনেরই এক ভয়ঙ্কর নেশার দাহে আমিও ভুলতে পারতাম শৈলেনের সংকীর্ণ মনের কথা—আমি ওকে বাধা দিতাম না। আজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে হয় তো একটা পুরুষের স্পর্শেই আমি সুস্থ হয়ে উঠতাম। এতদিন, যে আদিম ইচ্ছা আমাকে পীড়িত করেছে, পুড়িয়েছে, কোন কাজে ভাল করে মন দিতে দেয় নি, আজ হয় তো তা পূর্ণ হত আর আমি যেন এক ভয়ঙ্কর অসুখ থেকে হয়তো সেরে ওঠার একটা সঙ্কেত পেতাম আর কয়েক মুহূর্ত হয় তো এই ঘরে এই দেয়ালের আড়ালে একেবারে আমার জন্যেই নেমে আসত। কিন্তু তা হয় না। আমার কয়েক মুহূর্ত মানে একটা স্পষ্ট প্রশ্রয়—একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ। আজ আমি শৈলেনের মতো মানুষের কাছে খুব অল্প সময়ের জন্যেও আমার দুর্বলতাকে মেলে ধরতে পারি না—কিছুতেই না। এই সুযোগে আমি ওকে জানিয়ে দিতে চাই—রূঢ় কঠিন একটা আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই—যেন তারই মতে মত মিলিয়ে বলে উঠতে চাই, আমিও মানি ভাগ্যকে। আমার পিছনে একটা শূন্যতা, একটা করুণ

অতীত আছে বলে আমি তোমাকে প্রশ্রয় দেব না—ভবিষ্যতে আমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে কোন আঘাত করবার অবসর আমি তোমাকে দেব না।

আমি এই ভাবনা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোর করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, ছেড়ে দিন!

আমার হাত ছেড়ে দিতে হয় শৈলেনকে কিন্তু ও দূরে সরে যায় না, সঙ্কোচে মুখ বন্ধ করেও দাঁড়িয়ে থাকে না, ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলে যায়, যেদিন আবার অনেক পর তোমার সঙ্গে দেখা হল, আমি আবার এ বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করলাম—

ওসব কথা থাক।

কিন্তু কেন? একটা কথা তুমি তো খুব সহজেই বুঝতে পার যে তোমার জন্যেই আমি আবার—

এসব কথা বলবেন না। এসব কথা শোনবার জন্যে আমি প্রস্তুত নই—

এবার পিছিয়ে যায় শৈলেন। চেয়ারে বসে পড়ে। নিজেকে সংযত করে থেমে-থেমে বলে, আমি তোমাকে অসম্মান করছি না দীপা। কিন্তু এমন করে আমিও দিনের পর দিন মুখ বন্ধ করে থাকতে পারব না। তুমি আমার কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও শুধু এইটুকু তুমি জেনে রাখ আমি তো আগেকার কথা মনে করেই এ বাড়িতে আসি—

কিন্তু আমি আর আগেকার মানুষ নেই। আপনি জানেন না, আমার একটা অতীত আছে?

আর ভবিষ্যৎ কি নেই?

আপনার কাছে নেই। একটা কথা, ভবিষ্যতের ভাবনা আজ আমার কাছে বড় নয়, এতক্ষণ পর আমি যেন শৈলেনকে আঘাত করার একটা সুযোগ পাই, আমার ভবিষ্যৎ, হয় তো আপনি মনে-মনে ভাবছেন, আপনি নিজে। আর আমার অতীত—প্রেমাংশু।

আপনার চেয়ে প্রেমাংশু আমার কাছে অনেক বড়। আমার অতীতই আমার ভবিষ্যৎ, আমি শৈলেনের দিকে তাকিয়ে এত কথা একবারে বলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি।

যে উত্তেজনায়, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, দেহের যে দাবীতে সে আমাকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিল, ওর দিকে এখন না তাকালেও অন্য দিকে তাকিয়ে আমার বুঝতে দেরি হয় না, আমার কয়েকটা কথায় তা একেবারে নিভে গেছে। এবার, এখানে বসে-বসেই দেহের কথা ভুলে যাবে শৈলেন। আর মনের কথাই বলবে।

একটা কথা ভেবে আমি মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যাই—আজকাল কত সহজে মানুষ চিনতে পারি!

দীপা, খুব আস্তে কথা বলে শৈলেন, ভয়ে-ভয়ে একটা মানুষের মতো যে এইমাত্র একটা সাংঘাতিক অন্যায় করেছে, তুমি কিছু মনে কর না। যেকথা আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, তা এমন করে বলা যায় না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—

কী?

তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

আমি সব বুঝেছি।

কিন্তু বোধহয় আজ প্রথম, কথা বলতে-বলতে যেন শৈলেনের গলাটা ধরে আসে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমার একটা অতীত আছে, প্রেমাংশু আছে—

আমি তা ভুলি না, ভুলতে পারি না আর, আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলি, আপনি তা ভুলিয়ে দিতেও পারেন নি—পারবেন না। যদি আজ কিছুক্ষণের জন্যে আপনি নিজে সেকথা ভুলে থাকেন আবার একটু পরেই সেকথা—আমার অতীতের কথা আপনার মনে পড়বে—তখন কী হবে?

আর কিছু হবে না দীপা, আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শৈলেন উত্তর দেয়, তোমার কথা শুনে আজ থেকে তোমার ওপর

আমার শ্রদ্ধা অনেক—অনেক বেড়ে গেল। আমি আর কখনও এমন করে প্রেমাংশুকে—তোমার অতীতকে ভুলব না।

এরপর শৈলেনকে আমার বলবার কিছু নেই। সে আমাকে শ্রদ্ধা করবে। আর আমি দূর থেকে নিঃশব্দে শুধু ওর শ্রদ্ধা গ্রহণ করব। আমার শোক, আমার ব্যর্থতা, জীবনের এই আকস্মিক ছন্দপতন—সব জড়িয়ে আমার করুণ অতীত শৈলেন আমার চোখের সামনে ওর নীরব উপস্থিতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলবে। আর আজ যখন ও এখান থেকে চলে যাবে, কাছাকাছি কেউ থাকবে না তখন হয় তো আবার আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত যন্ত্রণা শুরু হবে—একটি-একটি করে ঝরবে দীর্ঘশ্বাস আর আমি একা-একা বসে ভাবব, এমন শ্রদ্ধা গ্রহণ করে তৃপ্ত থাকার মতো মনের অবস্থা আজ আমার আছে কি-না!

কিন্তু একদিন, প্রেমাংশুকে হারাবার পর প্রথম-প্রথম, যেদিন আমি নিজেই আমার শোক নিয়ে, শুধু স্মৃতি নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম সেদিন একটি লোকও আমাকে এমন শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এগিয়ে আসে নি। সেদিন কোথায় ছিল শৈলেন!

আমি যা বলেছি আজ শৈলেনকে, প্রথমে আঘাত করার ইচ্ছায়, পরে আমার মনে হয়, আমি যেন আমাকেই আঘাত করলাম। এ শ্রদ্ধা গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই। আমি ভুলে গেছি প্রেমাংশুকে। চিড়িয়াখানায় শৈলেনের সঙ্গে দেখা হবার পর, কেন আমি খুশি হয়েছিলান—কেন ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম?

আজ এ ঘরে বসে বসেই হঠাৎ আবার মনে হয়, আমার বয়স যেন আমাকে সব সময় প্রতারণা করে চলেছে। আমাকে অস্থির করে তুলছে। আমার জীবনে যে-কারণে এত বড় বিপর্যয়ের কথাও আমি ভুলে যাই। যদি এমন কেউ থাকত আমার চোখের সামনে, প্রেমাংশুর বংশধর একটি ছেলে কি মেয়ে, যে আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দিত আমার বয়সের কথা, তাহলে আমার কামনা-বাসনা হয় তো আমাকে এমন অদ্ভুত যন্ত্রণা দিত না সারাদিন—সারারাত।

আমি প্রেমাংশুকে, আমার প্রেমকে দেহের দাবীর জন্যে ভুলতে পারতাম না।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে এক সময় ভিজে ঠাণ্ডা স্বরে আমি শৈলেনকে বলি, আপনিও কিছু মনে করবেন না। আমিও সব বুঝতে পারি। আপনাকে আমি ভুল বুঝি নি।

আমি জানি, অনেক পরে শৈলেন বলে, তুমি সুখী হও, ও উঠে দাঁড়ায়।

এখনই যাচ্ছেন কেন ?

আজ যাই—

আবার আসবেন তো ?

আসব, শৈলেন হেসে বলে, হয় তো আরও বেশি আসব, আমাকে দেখতে-দেখতেই ও বলে, তোমাকে আমার স্থূল স্বার্থের কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যেই আমাকে ঘন ঘন আসতে হবে দীপা—

আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন—আমি সত্যি-সত্যিই আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাই শৈলেনকে। ও আসুক। সতর্ক প্রহরীর মতো আমাকে পাহারা দিয়ে চলুক—যেন কোনদিন আমি আমার মন থেকে প্রেমাংশুকে মুছে ফেলে শুধু যৌবনে আঁকড়ে না ধরি। শৈলেনের শ্রদ্ধার ভারে আমি যেন আমার বয়সের ক্ষুধা জয় করে নিতে পারি।

শৈলেন চলে যায়। আমি আর তাকাই না ওর দিকে—তাকাতে পারি না। একটু আগে বেঁচে ওঠার যে আনন্দ আমার দেহকে হালকা করে তুলেছিল তা হঠাৎ আবার মিলিয়ে যায়। শুধু মনে হয়, আজ থেকে আবার আমাকে জেগে থাকতে হবে রাতের পর রাত—আবার ছটফট করতে হবে—যন্ত্রণায় জ্বলতে হবে।

রাস্তায় যে মানুষকে প্রখর রোদে আজ দেখেছিলাম তার কথা আবার মনে পড়ে। সে কবে আসবে এখানে ? আসবে কি! আসবে। সে এলে যেন আমি প্রেমাংশুকে আবার অনুভব করতে পারব। যাবার সময় তাকে কী কথা বলে গেছে প্রেমাংশু ?

আজ রাস্তার সব আলো হঠাৎ নিভে গেছে। যতদূর দেখা যায়, অন্ধকার আর অন্ধকার। আকাশেও কালো মেঘ। আমার ঘুম আসেনা। এক-একবার ইচ্ছে করে, আলো জ্বেলে প্রেমাংশুর বড় ছবিটার সামনে দাঁড়াতে। কিন্তু ওঠা হয় না। উঠতে পারি না। এখন শৈলেন নেই। এখানে কেউ নেই! কারুর শ্রদ্ধায় আমার দরকার নেই। একা-একা সান্ত্বনা পাবার ক্ষমতা যেন আমার হারিয়ে গেছে। আমার সব কল্পনা ভোঁতা হয়ে গেছে।

কিন্তু হঠাৎ আমি চমকে উঠি। এবার আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হয়। আমার দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা পড়ছে। দাদা আমার নাম ধরে ডাকছে বার বার। আলো জ্বেলে দরজা খুলে আমি দাদার মুখোমুখি দাঁড়াই।

কী হয়েছে?

দীপু, শিগগির ওপরে চল। বাবার অবস্থা খুব খারাপ—

আমার শরীর হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভয়ে কথা বলতেও কষ্ট হয়। আমি বুঝতে পারি, বিকেলে বাবার চেহারা দেখে একটা অশুভ ইঙ্গিত চমকে উঠেছিল মনের মধ্যে, এখন দাদাকে দেখে বুঝতে পারি শোকের ছায়া নামছে এ বাড়িতে। থমথম করছে চারপাশ। আমি তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে এসে দাঁড়াই।

ঘরে আলো জ্বলছে কিন্তু এত কম আলো কেন? হয় তো অনেক ধুলো জমা হয়েছে বাল্বে, পরিষ্কার করবার কথা কারুর খেয়াল নেই। সেই অল্প আলোয়, এ ঘরে কম আলোর কথাটা আমার আজই প্রথম মনে হয়—আমি দেখি বাবার নিষ্প্রভ মুখ, মলিন দেহ। আমি দেখি আধ-বোজা তাঁর চোখ। আর তাঁর মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বার হচ্ছে। মা একদিকে বসে আছেন ঠাণ্ডা একটা পাথরের মতো। বাবার চেয়ে মাকে দেখতেই আমার কষ্ট হচ্ছিস বেশি।

এই ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ ঘরে বোধহয় আমিই প্রথম অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠি, এখনও ডাক্তার আসে নি কেন দাদা ?

খবর দেয়া হয়েছে, এখুনি এসে পড়বে, দাদা ঘরে ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভয়ে-ভয়ে কথা বলে।

আমি লক্ষ্য করি দাদার গলার স্বর শুনে বাবার মুখ বিকৃত হয়ে যায়। চোখ খুলে তিনি এদিক-ওদিক তাকান। আমাকে দেখেন। মাকে দেখেন। হাত তুলে ইশারায় কী যেন বলবার চেষ্টা করেন।

মার দেহটা নড়ে ওঠে এবার, ওগো, ছটফট কর না। কী চাও—কী, জল ?

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাবার শরীরের অবস্থার এমন পরিবর্তন হল কেমন করে সেকথা আমি বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কেন। কিন্তু বুঝতে পারি, কারুর কাছ থেকে কোন স্পষ্ট সঙ্কেত না পেলেও এই ঘর দেখে, বাল্বে ধুলো জমার কথা ভেবে, আলো-অন্ধকারে বাবার দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে আমার মনে হয় এখনই, এই রাতে, আমি জানিনা এখন রাত কত—একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। আবার শোকের ছায়া নামবে সংসারে। আমি মার মুখের দিকে তাকাই।

অস্বাভাবিক স্বর বার হয় বাবার গলা চিরে, ওকে আমার সামনে আসতে বারণ কর। ও কেন এসেছে এখানে ? আমি ওর মুখ দেখতে চাই না—

বাবা কারুর নাম করেন না। কিন্তু দরজার কাছ থেকে দাদা সরে যায়। মা তৎপর হয়ে বাবার গায়ে হাত বুলোতে থাকেন। কোন কথা বলেন না। কোন প্রতিবাদ করেন না। এত কথা বলার উত্তেজনায় বাবা ঝিমিয়ে পড়েন। পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

একটু পরে মা খুব আস্তে আস্তে ডাকেন, ওগো !

আমি মার হাত ধরে বলি, এখন কথা বল না মা, ওঁকে ঘুমতে দাও—

দীপু, দেখ দেখ, চোখ ছুটো দেখ, আমার কিছু ভাল লাগছে না। বিজু, ওরে বিজু, কে গেছে? এখনও ডাক্তার এল না। তুই নিজে গেলি না কেন?

মার কথা শুনে দাদা এসে খাটের পাশে দাঁড়ায়। আস্তে, সাবধানে বাবার কপালে হাত দিয়ে বলে, ডাক্তার বাবু এখুনি এসে পড়বেন। তোমাদের ফেলে আমার বাড়ি ছেড়ে যেতে সাহস হল না মা—

বিজু, কী হবে?

সব ঠিক হয়ে যাবে মা।

বাইরে গাড়ির শব্দ পেয়ে দাদা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়। ডাক্তার এসে গেছে। একটু পরেই দাদা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বাবার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু বাবার চেহারা দেখেই ডাক্তার যেন ইতস্তত করে তাঁকে পরীক্ষা করতে। তারপর আস্তে আস্তে বাবার একটা হাত তুলে নেয়। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ আমার মনে হয়, সব শেষ হয়ে গেছে।

আমিই প্রথম চিৎকার করে উঠি, ডাক্তারবাবু!

আমাদের বাড়ির অনেক পুরনো ডাক্তার কথা বলে না। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শুধু মার দিকে তাকায়। তারপর দাদার দিকে। কিন্তু মা বোধহয় এখনও ডাক্তারের এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারেন না।

ডাক্তারবাবু, উনি এমন করছেন কেন?

আমি নিজেকে সামলাতে পারি না, বাবা!

আর দাদাও চিৎকার করে ওঠে, বাবা, বাবা আমিই বোধহয় তোমাকে মারলাম।

এর মধ্যে কে গিয়ে ঝণ্টুকে তুলে এনেছে। চোখ রগড়াতে-

রগড়াতে ঘরের মধ্যে এসে দাদাকে আর আমাকে কাঁদতে দেখে ও একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা তেমন করেই বসে থাকেন—ঠাণ্ডা একটা পাথরের মতো। কিন্তু তাঁর কথা আমরা কেউই ভাবি না তখন।

॥ সাত ॥

বাবা যে এমন করে চলে যাবেন তা ভাবা হয়তো মার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ঠাণ্ডা পাথরের মতো যেমন আমার তাঁকে মনে হয়েছিল বাবার মাথার কাছে সেদিন, তারপর দিনের আলোয়, বাবার মৃত্যু অল্প পুরনো হয়ে গেলেও তাঁকে যেন একই রকম মনে হয়। এ সংসারে বোধহয় তিনি থাকতে চান না, মনে হয় এখানকার কিছুতেই তাঁর আর কোন কৌতূহল নেই।

এত লোকজনের আসা যাওয়া, বাবাকে নিয়ে এত আলোচনা যেন মার কিছু চোখে পড়ে না—কিছুই কানে যায় না। একজন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সাধ, সব স্বার্থ, সব সতর্কতাও যেন শেষ হয়ে গেছে।

মা চুপ হয়ে গেছেন, মা অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। আমার ভয় হয়, তিনিও হয় তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না। কিন্তু আর একজন—তার দিকে আমি তাকাতে পারি না। এতদিন যত দম্ভ থাক তার, যত যন্ত্রণা থাক, বাবার মৃত্যুর পর দাদার চেহারাটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। এই মৃত্যুর জন্যে, সংসারে এই আকস্মিক বিশৃঙ্খলার জন্যে যেন একমাত্র সে-ই দায়ী—এমন একটা ধারণা তার হয়েছে বলেই মাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার থাকে না। আমার সঙ্গেও কথা বলতে আসে না সে।

আজ এ সংসারে যারা আছে তাদের মধ্যে আমার অভিজ্ঞতাই যেন সব চেয়ে বেশি। মৃত্যুর আঘাত আমি সহ্য করেছি—

আর এরা, এ বাড়ির প্রত্যেকে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, স্থির থাকতে বলেছে—আমাকে ভেঙে পড়তে দেয় নি। এবার আমার

পালা। আমি একবার মার সামনে দাঁড়াব, একবার দাদার সামনে দাঁড়াব, আর ঝণ্টুকে ভোলাব—বোঝাব। এখন সমস্ত সংসারটার ভার যেন আমার ওপর। আমার ভেঙে পড়লে চলবে কেন।

প্রথমে আমিই সকলকে খবর দিয়েছিলাম। আমাদের যত আত্মীয় বন্ধু, সকলকেই জানিয়েছিলাম এই শোকের কথা। কিন্তু আর একজন, যাকে খবর দেব কি-না ভাবতে ভাবতে পুরনো হয়ে গেল বাবার মৃত্যু, আমি আজও জয়াকে কিছু জানাতে পারলাম না। কিন্তু ভেবেছিলাম, সে জানবেই—কারুর না কারুর কাছ থেকে শুনবেই এ খবর আর তখন, এ সংসারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকলেও সে আসবেই এখানে একবার না একবার—দাদার দিকে তাকিয়ে না দেখলেও, মার সঙ্গে, আমার সঙ্গে আর ঝণ্টুর সঙ্গে কথা বলবেই—বাবার কথা ভেবে হয় তো দু-এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে।

জয়া এল না। আর তখন, যখন তার আসবার আর কোন মানে হয় না, আমার মনে হল, ও না এসে বোধ হয় ভালই হয়েছে। ও এলে বাবার মৃত্যুর কারণটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়ে উঠত। জয়া জানে যে এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে আমরা সকলে, বিশেষ করে মা তাকেই দায়ী করবে, অভিশাপ দেবে—তাই ইচ্ছে থাকলেও সে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে এসে পড়তে চায় নি।

কিন্তু এসব ভেবেও, এবার কেউ আমাকে অনুরোধ না করলেও, জোর করে আমি একবার জয়াকে এখানে টেনে আনতে চাই। মা অভিশাপ দিক ওকে, দাদা যা খুশি তাই বলুক—এই নীরবতার প্রাচীর টুকরো-টুকরো হয়ে যাক। মনের মধ্যে শোক পুষে পুষে, আমি দেখছি মা আর দাদা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। জয়া একবার এসে দাঁড়ালে হয় তো এ আগুন, এ যন্ত্রণা নিভে যাবে।

কিন্তু জয়া হয় তো আর আসবে না। আমাকে আর একবার

যেতে হবে ওর কাছে—যেতে হবে ওকে অল্পক্ষণের জন্যে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে। আর এবার আমি ঝন্টুকে সঙ্গে নিয়েই যাব। আমাকে যেতেই হবে। আমি মার দিকে তাকাতে পারি না। এ সংসারও জুড়িয়ে গেল—ঝিমিয়ে গেল। এখন সেই মানুষ, আমি যার নাম জানি না, যার সঙ্গে আমার হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল, সে আসে না কেন!

কয়েকদিন পর মা কথা বলেন। আমাকে আর দাদাকে ডেকে ম্লান স্বরে শুধু তাঁর ইচ্ছার কথা জানান। তিনি আর এ সংসারে থাকবেন না। তিনি কাশী চলে যেতে চান। মাসে মাসে সামান্য কিছু টাকা পাঠালেই তাঁর চলবে।

মা যেমন স্বরে কথা বলেন ঠিক তেমন স্বরেই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তুমি চলে গেলে আমি কী করব মা?

আমার প্রশ্ন মা যেন বুঝতে পারেন না। শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ওপরে তাকিয়ে থেকে বলেন, আমি কিছু জানি না। বিজু, সব ব্যবস্থা কর, সংসারে আমি আর থাকতে পারব না রে—

মা, দাদা অস্থির হয়ে বলে ওঠে, আমি মামলা তুলে নেব। যেমন করে হোক, জয়াকে ফিরিয়ে আনব, তুমি যেও না। আমার বুকটা পুড়ে যাচ্ছে মা—আমি ভুলতে পারি না যে আমারই জন্যে বাবা দুঃখ পেয়ে গেলেন! তুমি চলে গেলে আমি এ বাড়িতে আর একদিনও থাকতে পারব না—

স্নিগ্ধ হেসে মা বলেন, দেখ বিজু, এখন তোদের এখানে আমার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। আমার আর কিছু নেই। সব গেছে। আমি আর কিছু চাই না। তোরা বিশ্বাস কর, কারুর ওপর আমার একটুও রাগ নেই। আমি তোদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে যাব, একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে, মা বলেন, আমাকে যেতেই হবে।

কী মিষ্টি মনে হয় মার গলার স্বর এখন। কী অদ্ভুত পরিবর্তন

তাঁর হয়েছে! তাঁর কথা শুনতে শুনতে, তাঁকে দেখতে-দেখতে এখন সত্যি মনে হয়, একটি মানুষের বিরুদ্ধেও তাঁর কোন অভিযোগ নেই—কোন রাগ নেই। তাঁর গভীর শোক তাঁকে উজ্জ্বল করেছে পূর্ণতার মহিমায়। মার স্নিগ্ধ হাসি আমার বড় ভাল লাগে এখন।

বাবা যখন ছিলেন তখন কোনদিনও আমার মাকে এত ভাল লাগে নি—এত স্নিগ্ধ, এত দৃঢ়, এত পূর্ণ মনে হয় নি একদিনও। বাবার মৃত্যু তাঁকে সংসারের প্রতিদিনের তুচ্ছতার বেড়া ভেঙে যেন অনেক—অনেক দূরে নিয়ে গেছে। আমি যেন হঠাৎ বুঝতে পারি কেন তিনি আর সংসারে থাকতে পারবেন না। কিন্তু দাদা বোঝে না।

দাদা মাকে বোঝায়, না মা, এখন নয়। তুমি গেলে সব ভেঙে যাবে—

দূর, যিনি ভাঙেন গড়েন তিনিই রইলেন তোদের সংসারে। সকলের মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে।

তাঁকে তুমি সংসারে থেকে ডাকতে পার না মা? ঝণ্টু আমি দীপু—আমাদের ফেলে তুমি যাবে কেমন করে?

আবার তেমন স্নিগ্ধ হাসি হেসে মা বলেন, তোদের আরও কাছে টেনে নিয়েছি বলেই তো ফেলে যেতে পারছি রে। মিছে ভয় পাস না বিজু, সংসারে থাকলে তোদের মঙ্গল চিন্তায় নানা বাধা আসবে—আমি তোদের সব ভার তাঁর হাতে তুলে দেব। না রে, সংসারে আমি আর থাকতে পারব না, মার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ে, তিনি যেখানে নেই, সেখানে কি আমি থাকতে পারি! একটু পরে মা যেন আবার আপন মনেই বলে ওঠেন, আছেন, আছেন—তিনি আছেন তোদের সঙ্গে। তোরা তাঁকে ভুলিস না। দীপু, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে যেতে দে—

দাদার কথা মা শুনলেন না, আমার কথাও না, তিনি এ সংসার

ছেড়ে চলে যাবেন। এখন তাঁর কাছে আর কিছুর যেন কোন মূল্য নেই। একাগ্র সাধনায় তিনি যেন শুধু বাবাকেই ধরে রাখতে চান। আমাদের মুখের দিকে তিনি তাকাবেন না, সংসারকে তিনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। মার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয় যে তাঁর ধারণা, এখানে থাকলে তিনি যেমন করে চান তেমন করে যেন বাবাকে ধরে রাখতে পারবেন না।

আমিও একদিন প্রেমাংশুকে এমন করেই ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। ঠিক মা যেমন করে চান, কোনদিকে মন যাবে না, কেউ বিরক্ত করবে না, সংসারের কোন আকর্ষণ মন টলাবে না—তাঁর স্মৃতির জগৎ সত্যি হয়ে যাবে। এমন করেই, একজন মানুষের কথা ভাবতে-ভাবতেই তিনি ভগবানকে পাবেন। মার যেমন বিশ্বাস আছে, মনের জোর আছে, আমার তেমন ছিল না। মা যত সহজে সংসার ছেড়ে যেতে পারছেন, আমি তত সহজে পারি নি—পারতাম না। কিন্তু আমার এখন মনে হয়, যে-কোন একটা বিশ্বাসে ভর করতে পারলে হয় তো এমন অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দিন কাটত না। আমি অতীতকে শ্রদ্ধা করতে পারি নি। আমার বয়স বর্তমানকে চেয়েছে, প্রেমাংশুর কথা ভেবে মন ভরে ওঠে নি, দ্বিধা জেগে উঠেছে। আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। আজ মার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শৈলেনের বলা কথাগুলো আমার মনে পড়ে যায়। আমার পিছনে প্রেমাংশু আছে বলে আমি সামনে এগিয়ে যেতে পারি না। সামনে এগিয়ে যেতে গেলেই হঠাৎ আমার চারপাশে থমথম অন্ধকার নামে। হ্যাঁ, শৈলেনের কথাই ঠিক, আমার অতীত আমাকে সুখী হতে দেয় না—সুখী হতে দেবে না।

কিন্তু আমার কথা থাক। আমার ভাবনার শেষ নেই। আর এখন, সংসারের এই বিপর্যয়ের সময় আমার কথা ভাবা চলবে না—আমার কথা কেউ শুনবে না। এখন সব চেয়ে বড় ভাবনা, মা চলে যাবেন। তারপর কী হবে।

আমাকে কাছে ডেকে দাদা একসময় বলে, দেখ দীপু, সব দো
আমার! আমার জন্যেই বাবা গেলেন—এখন মা-ও চলে যেতে চান।
আমি এ বাড়িতে কেমন করে থাকব?

আমার মনে হয়, আমিই বা কেমন করে থাকব! কিন্তু মা যে কিছুতেই আর সংসারে থাকবেন না সেকথা জেনেও দাদার কথা শুনে আমি বলি, এ সময় বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করলে হত—

দাদার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই বলে, আমিও কয়েকদিন ধরে সে-কথাই ভাবছি, অন্যদিকে তাকিয়ে দাদা আস্তে আস্তে বলে, এবার তোর সঙ্গে আমিও যাব। আর, ঝণ্টুকেও নিয়ে গেলে কেমন হয় রে দীপু?

সবচেয়ে ভাল হয়, একটু চুপ করে থেকে আমি দাদাকে বলি, শৈলেনদার কথা না শুনে তুমি যদি অনেক আগে ঝণ্টুকে নিয়ে বৌদির সঙ্গে দেখা করতে তাহলে হয়তো এতদিনে সব মিটে যেত—

দাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, কিন্তু সেকথা ভেবে এখন আর লাভ নেই। চল, এখন আমরা একবার যাই।

পরদিন সকাল-সকাল একটা ট্যাক্সি ডেকে দাদা আমি আর ঝণ্টু শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে জয়ার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। এবার আমাদের সঙ্গে আশ্চর্য, ঝণ্টু কিছুতেই আসতে চায় নি—ওর মার কাছে আসছি শুনেও না। দাদা কিছু বোঝে নি, চড়া স্বরে ঝণ্টুকে তাড়া দিয়ে বলেছিল তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে। তখন ঝণ্টু তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমিও ওকে দেখেছিলাম। ওর চোখ দুটো অদ্ভুত করুণ হয়ে উঠেছিল। আমি দূর থেকেই ওর চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছিলাম। ছোট একটা ছেলের মনের কথা, ও কিছু না বললেও, আমার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শেষ অবধি দাদার কথায় ও এল আমাদের সঙ্গে কিন্তু একটা কথাও বলল না—কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না ওর মার সম্বন্ধে। আর ঠিক তখন ওর মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পারলেও আমি কিছু

বলতে পারলাম না ঝণ্টুকে। ও বোধহয় মাথা তুলে তাকাবে না জয়ার দিকে—একটা কথাও বলবে না। দোষ যারই থাক, সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স নয় ঝণ্টুর, শুধু একটি কথা ভেবেই তার কচি বুকে অভিমান ফুলে-ফুলে উঠছে—জয়া তাকে ফেলে চলে গেল কেন—তাকে এতদিনে একবারও দেখতে এল না কেন।

আজ জানলায় কেউ নেই। হয় তো জয়া অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দাদা এখানে পৌঁছে ইতস্তত করে। ট্যাক্সি থেকে নামতে চায় না। আমাকে বলে, তুই যা, আগে বলে আয়—

না না, চল আমরা সকলেই একসঙ্গে যাই, আমি জোর করেই দাদাকে ট্যাক্সি থেকে নামাই। একটা কথা আমার হঠাৎ মনে হয়, আগে গিয়ে বললে জয়া দাদার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে চাইবে না।

আমরা তিনজন ওপরে উঠছি কিন্তু কোন শব্দ নেই, প্রত্যেকে যেন ভয়ে-ভয়ে পা ফেলছে—এমন কি ঝণ্টুও হাঁটছে খুব সাবধানে, যেন ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। কেউ একটা কথাও বলছে না।

জয়ার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। পর্দাও একটু সরে গিয়েছিল। আমি বাইরে থেকেই জয়াকে দেখতে পাই—শুয়ে আছে। ও-ও দেখতে পায় আমাকে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে। ঝণ্টুকে নিয়ে আমি ভেতরে ঢুকি। একটু দূরে দাদা দাঁড়িয়ে থাকে। জয়া দাদাকে দেখতে পায় না।

ঝণ্টু—ঝণ্টু—জয়া শক্ত করে ধরে তাকে। আদরে-আদরে অস্থির করে দেয়, তোকে কতদিন দেখি নি রে—

কিন্তু জয়ার সঙ্গে একটাও কথা বলে না ঝণ্টু। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জয়া ওকে ছাড়ে না। আমাকে বসতে বলে নিজে ঝণ্টুকে কোলের কাছে নিয়ে বসে। আমি ঘুরে ঘুরে বারবার বাইরে তাকাই। দাদাকে কেমন করে এখানে ডাকব হঠাৎ ঠিক করতে পারি না।

জয়া বলে, বাবার কথা শুনেছিলাম। খুব কষ্ট হয়েছিল। ভেবেছিলাম একবার যাই—

গেলেই পারতে।

যদি এর মধ্যে 'কেস্' ঢুকে যেত তাহলে হয় তো যেতাম। এখন গেলে অনেকে ভাবতে পারত বোধ হয় আমি কোন স্বার্থের জন্যে গেছি—

জয়া, আমি একটু ইতস্তত করে বলি, দাদাও এসেছে—

চমকে উঠে জয়া বলে, কোথায়?

এখানে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

না না, জয়ার চেহারাটা একমুহূর্তে যেন একবারে অন্যরকম হয়ে যায়—হিংস্র কঠিন, কেন তুমি ওকে এখানে নিয়ে এলে? আমি ওর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারব না। ওকে চলে যেতে বল—

জয়ার কথা শেষ হবার আগেই দাদা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। জয়ার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বলে, আমাকে কেউ এখানে আনে নি, আমি নিজে এসেছি, আমিই ঝণ্টু আর দীপুকে নিয়ে এসেছি—

দাদার ম্লান মুখ আর চোখ দেখে একটুও নরম হয় না জয়া। এখনও এক অন্ধ ভয়ঙ্কর আক্রোশে ও যেন বাবার মৃত্যুর কথাটা ভুলে গিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু কেন এসেছ তুমি? আর কখনও এস না—এস না—আমি জানি তোমার লজ্জা নেই কিন্তু তোমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার নিজের লজ্জা করছে। তুমি যাও।

জয়ার ধারালো কথাগুলো গমগম করে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে স্থির হয়ে চেয়ারে বসে থাকতে অস্বস্তি হয় আমার। এখান থেকে এখুনি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। জয়ার কাছে মাথা নিচু করে একটা আপোষ করবার চেষ্টা করতেও মন সায় দেয় না। যা হয় হোক, এমন অপমান সহ্য করবার কোন মানে নেই।

কিন্তু আশ্চর্য দাদার ধৈর্য! ও যেন আজ সব সহ্য করবার জন্যে

প্রস্তুত হয়ে এসেছে। ঠিক যেমন স্বরে ও কথা বলছিল তেমন স্বরেই আবার জয়াকে বলে, আমি তোমাকে শুধু কয়েকটা কথা বলতে এসেছি—

কে তোমাকে বলল যে তোমার কথা শোনবার জন্যে আমি হাঁ করে বসে আছি?

আমি জানি তুমি হাঁ করে বসে নেই, দাদা এখনও একটু উত্তেজিত হয় না, তুমি জান বাবা মারা গেছেন। আর একটা কথা, তা তুমি জান না, মা কাশী চলে যাচ্ছেন—

রূঢ় কঠিন স্বরে জয়া বলে, এসব কথা তুমি কেন বলছ আমাকে? তুমি আসলে কী চাও? 'কেস'-এ হেরে যাবে বলে তোমার ভয় হচ্ছে?

না। আমি নিজেই 'কেস' তুলে নিচ্ছি।

ঠোঁট টিপে জয়া বলে, কেন? মহত্ত্ব দেখিয়ে পাঁচজনের কাছে বাহাদুরী নিতে চাও? কিন্তু থাক, তোমার যা খুশি তুমি তাই কর। আমাকে এসব বল না।

আমাদের সংসার ভেঙে যেতে বসেছে জয়া। আমি তোমাকে— দাদা থামে, কী ভাবে, একটু পরে বলে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

জয়া হাসে। অনেকক্ষণ। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখি। যেন মাথার গোলমাল হয়েছে জয়ার। ওর হাসি থামে না। আর এখন, আমাদের এই শোকের কথা শুনেও যখন জয়া এমন করে হাসতে পারে তখন আমি বুঝতে পারি না কথা শেষ না করেই দাদা ফিরে যায় না কেন। জয়া যে ফিরে যাবে না, কিছুতেই না, সেকথাটা ওকে এমন করে হাসতে দেখে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে মুখে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য টেনে জয়া বলে, তোমার এক ডাকে যদি ফিরে যেতাম তাহলে আমি

ও বাড়ি ছেড়ে চলে আসতাম না। তুমি কী ভেবেছ আমাকে ?

স্থির স্বরে দাদা বলে, এক ডাকে যদি না যাও, আমি তোমাকে সারা জীবন ধরে ডাকব—

দেখ, আমি নাটক ভালবাসি না। তোমার সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক নেই যে তুমি আমাকে এসব কথা শোনাতে পার।

সম্পর্ক তো আবার গড়ে নেয়া যায় ?

রাস্তার যে কোন লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে কিন্তু তোমার সঙ্গে—

দাদা বলে, তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব।

আমার কিছুই বলবার নেই। তোমার জীবন কিম্বা মৃত্যু আমাকে সামান্য নাড়া দেবে না—তুমি যাও।

দাদা আবার কী বলতে যায় কিন্তু এবার আমি স্থির থাকতে পারি না। উঠে দাঁড়িয়ে দাদাকে বলি, জয়া তোমাকে যা বলবার স্পষ্ট বলে দিয়েছে। এ নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। চল এবার আমরা যাই। জয়ার অফিসের দেরি হয়ে যাবে—

আমার সঙ্গে জয়া কিন্তু একেবারেই অন্য সুরে কথা বলে, আজ আমি অফিস যাব না। ছুটি নিয়েছি।

কিন্তু আমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চাই। তাই বলি, কথা তো হয়ে গেল। এবার যাওয়া যাক—

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঝণ্টু গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। জয়া ওকে বাধা দিতে পারে না—একটা কথাও বলতে পারে না। কিন্তু তবুও দাদার সঙ্গে ওর এই কথা কাটাকাটিতে এখনও একটা অদ্ভুত উত্তাপের ঝাঁজ যেন আমার গায়ে লাগে। মনে হয়, এখনও আরও অনেক কথা আছে জয়ার দাদাকে শোনাবার। ওর সব অপমানের শোধ নিতে চায় বলেই ও অগ্রাহ্য করে দাদার আকস্মিক আমন্ত্রণ আর, দাদা সেকথা বুঝতে পেরেছে বলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার ভাল লাগে না এই অপমান। আমি সহ্য করতে পারি না জয়ার রূঢ় কঠিন ভাষা। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। আর আমার এখান থেকে সরে যাওয়াও দরকার। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝে নিক। আমি আছি বলে হয় তো আমার সামনে যেমন করে বলতে চায় দাদা তেমন করে কথা বলতে পারে না।

আর একটু হলেই দাদাকে রেখে ঝণ্টুর হাত ধরে আমি নিচে নেমে যেতাম। কিন্তু হঠাৎ আর একটা মানুষ এসে দাঁড়ায় জয়ার ঘরের বাইরে। একে আমি চিনি। এখানেই আর একদিন দেখেছিলাম। চোখে অহঙ্কার কাঁপিয়ে জয়া এর সঙ্গেই আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। নামটা আজও আমার মনে আছে, শিশির।

আজ কিন্তু জয়ার চোখে অহঙ্কার নেই। আমি দেখলাম, ও যেন হঠাৎ চোখের সামনে শিশিরকে দেখে চমকে উঠেছে, অপ্রস্তুত হয়েছে। আর ওর কঠিন চেহারা যেন এক কল্পিত আশঙ্কায় কোমল হয়ে উঠেছে। দাদা কিছু বুঝতে না পারলেও জয়ার পরিবর্তন এত স্পষ্ট যে আমিও ওর এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারি। আর, আমাদের বেরিয়ে যাবার ঠিক আগে-আগে দাদা বলে, ঝণ্টু মাকে বলে যাও—

শিশির দাদাকে দেখে। ঝণ্টুকে দেখে। আর তারপর আমাকে দেখতে-দেখতে অল্প পরিচয়ের হাসি হাসে। আমিই প্রথম কথা বলি, ভাল আছেন ?

হ্যাঁ। আপনি ?

আমি কিছু বলবার আগেই ঝণ্টু বাইরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, মা যাই—

জয়া ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ওর চোখ মুখ আবার সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু ঝণ্টুর কথা শুনে ও একটাও কথা বলতে পারে না শিশিরের সামনে। যদিও ঝণ্টু ওর কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের সকলের

আগে নিচে নেমে যায়। শিশির চোখে কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখতে চায়। আমি আর দাদা আস্তে আস্তে নিচে নামি।

এখন, একটা কথা বার বার আমার মনে হয়, এমন করে খবর না দিয়ে, জয়ার অনুমতি না নিয়ে এখানে আসবার অধিকার আমাদের নেই। শিশিরকে আবার এখানে দেখে আর জয়ার চোখে-মুখে আশঙ্কার ছায়া দেখে আমার পক্ষে বোঝা কঠিন হয় না যে, জয়া তার নতুন জীবনের শুরুতে ভাঙাচোরা পুরনো জীবনের একটি মানুষকে দেখতে চায় না—দেখাতে চায় না। আর এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হঠাৎ শৈলেনের কথা মনে পড়ে যায়। আর জয়ার করুণ অবস্থার কথা ভেবে আর একবার মনে হয়, এখানে কেন এলাম।

আমরা বেরিয়ে আসবার পর হয়তো শিশির আমাদের কথাই তাকে জিজ্ঞেস করবে। আর সব কথা জয়া তাকে বললেও আজ আমরা কেন এখানে এসেছিলাম শুধু সেকথাটাই বলতে পারবে না। শিশির আমাকে দেখেছে। সেদিন জয়ার চোখে আজকের মতো ভয় ছিল না। কিন্তু আজ ওর ভয় কাকে? দাদাকে নয়, ঝণ্টুকে। আজ তাকেও দেখল শিশির। জয়ার যে রূপ সে দেখাতে চায় —ঝণ্টু সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে তা দেয়া অসম্ভব বলেই জয়া ভয় পায়।

তার অবস্থা আমার মত নয়। একদিন আমার সংসার পরিপূর্ণ ছিল। আর পূর্ণতার স্বাদ আমি পেয়েছিলাম বলেই আজও ছায়া হয়ে প্রেমাংশু এসে দাঁড়ায়—আমাকে জয়ার মতো এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে যেতে দেয় না! আমার কোন দৈন্য তখন ছিল না বলেই আমি শৈলেনের যুক্তি খণ্ডন করেও ঝিমিয়ে থাকি। কিন্তু অপূর্ণ অতৃপ্ত জয়া যখন এক নতুন পরিচয় নিয়ে তৃপ্তির, পূর্ণতার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে তখন যদি তার মরচে ধরা অতীত তার আর এক পরিচয় তুলে ধরতে চায় তাহলে সে তো ভয় পাবেই।

ট্যাক্সিতে দাদা আর ঝণ্টু চুপচাপ বসে থাকে কিন্তু একটা কিছু বলবার জন্যে আমি মনের মধ্যে কথা হাতড়াই। কয়েকটা কথা, একটা আলোচনা যা আমাদের তিনজনের এই ঠাণ্ডা নির্জনতা দূর করে দেবে। আমার ভাল লাগছে না এই অপ্রস্তুত নীরবতা। কিন্তু কী কথা বলব আমি!

দাদাকে নয়, আমি ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করি, মার সঙ্গে কথা বললে না যে?

আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়না ঝণ্টু। অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু এবার দাদা কথা বলে, আমাকে আর একবার এখানে আসতে হবে দীপু। আজ তো বাড়ি চিনে গেলাম। এর পর আমি একাই আসব।

আমি বলি, সেই ভাল। জয়ারও হয় তো অনেক কথা থাকতে পারে তোমাকে বলবার, যা আর কারুর সামনে ও বলতে পারে না—

দাদা হয় তো আমার কাছ থেকে এমন কথাই আশা করে। কিন্তু না, যদিও দাদাকে আমি বলতে পারি না কিন্তু মনে মনে ভাবি, জয়ার কাছে দাদা যদি এমন করে না যায় তাহলেই যেন সব চেয়ে ভাল হয়। পুরনো ক্লান্তি আর উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলে এখন ও যদি নতুন কোন আশ্রয়, কোন পৃথিবী ওর জন্যে তৈরি করতে পারে তাহলে পিছনের একটা মানুষ কেন সামনে দাঁড়িয়ে আবার তাকে উত্তেজিত করে তুলবে।

আজ শিশির বাবু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল জয়ার চোখে—যে আশা আর আনন্দ, যে-ভয় আর উত্তেজনা—আমি যেন তার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনকেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। আর একটা কথা, একটা ভয়ঙ্কর সত্য, এত অপমান আর যন্ত্রণা পার হয়ে যেখানে আজ পৌঁছেছে জয়া, যার আশ্বাসে সাহস পেয়েছে, হয় তো প্রশ্রয় পেয়েছে যার কাছে সে-মানুষ, কিম্বা সে মানুষের ভাবনাও

তাকে শান্তি দেবে, আনন্দ দেবে। আর তীব্র আবেগের আর এক জোয়ারে হয়তো ঝণ্টুর চেয়ে তার কাছে জীবনই বড় হয়ে উঠবে। ঝণ্টুর কথা তার মনে পড়বে, সে কাঁদবে তার জন্যে, কিন্তু তাকে কাছে টেনে নেবার আগেই ভয়ে ভয়ে একবার তাকাবে শিশিরের মুখের দিকে। এমন হবেই। তাই আজ জয়ার জন্যেই আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম ওর ঘর থেকে।

একটু পরে, কী ভেবে আমি নিজেই বুঝতে পারি না, আমি দাদাকে বলি, তুমি যদি আবার কখনও জয়ার কাছে যাও তাহলে আমার মনে হয় ওকে একটা খবর দিয়ে যেও—

কিন্তু ভয় কোথায় জানিস দীপু, খবর দিলে ও আমার সঙ্গে দেখাই করবে না।

তাই যদি হয়, মানে জয়া যদি তোমাকে এড়িয়ে যেতে চায় তাহলে তুমিই বা ওর সামনে দাঁড়াবে কেন?

কেন? দাদা অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, মা-কে আটকাতে হবে না?

না। প্রথমত তোমার কথা জয়া শুনবে বলে মনে হয় না আর যদিও আবার আমাদের বাড়িতে ফিরে আসে তাহলেও মা যে আর সংসারে থাকবেন না সে তো বুঝতেই পেরেছ—

তাহলে? ঠাণ্ডা গলায় দাদা জিজ্ঞেস করে, আমি কী করব?

দাদার যে এখন আর কিছুই করবার নেই সেকথা তাকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি না। আর আজ জয়ার কথা শুনে, তাকে দেখতে-দেখতে আমার বারবার মনে হয়েছে, সত্যিই দাদার আর কিছুই করবার নেই। দাদাকে আমার মনে হয়েছে কাঙালের মতো। অনুতাপ এক রকম আর কাঙালপনা আর এক রকম। দাদা এখন অনুতাপ করে না, আমার মনে হয়, নানা ছলে শুধু জয়াকে ফিরিয়ে আনার কৌশল করে। কিন্তু জয়া যে আর ফিরে আসবে না সেকথা আমি আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। আমি আরও বুঝতে

পেরেছি যে একটা কিছু টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তা আর জোড়া দেয়া যায় না। যেখান থেকে একদিন যাত্রা শুরু করেছি আবার সেখানে ফিরে গিয়ে নতুন করে আরম্ভ করবার ইচ্ছে সকলেরই থাকে, কিন্তু ফেরা কি যায়! ফেরা গেলেও হয় তো সবই ঠিক থাকে—সেই জায়গা, সেই দৃশ্য, সেই চোখ মুখ—শুধু মনে হয়, এ মানুষ সে-মানুষ নয়, সেই পুরনো কেন্দ্র থেকে আবার নতুন যাত্রা অসম্ভব।

দাদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এবার আমি বলি, এখন তোমার একমাত্র কাজ ঝণ্টুকে মানুষ করা। এ ছাড়া আর তো কিছুই করবার নেই দাদা। আমার শুধু ঝণ্টুর জন্যে কষ্ট হয়—

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঝণ্টু বলে ওঠে, আমি আর মার কাছে যাব না—কখনো না—

আমি শুধু ঝণ্টুকে কাছে টেনে ওর মাথায় হাত বুলোতে থাকি। কোন কথা বলতে পারি না।

বলেছিল, একদিন আসবে, আমি সে-মানুষের নাম জানিনা সেই মানুষ—সে আসবে প্রেমাংশুর বনভূমির ঘ্রাণ নিয়ে। সে আসতে চায় নি। আমি জোর করেছিলাম। একটা কথা, গ্রীষ্মের কড়া রোদে সোজা হয়ে আমাকে দাঁড়াতে দেখে ও বলতে চায় নি। আমি সে কথা জানতে চাই। কী কারণে সে অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজে এসেছিল আমাকে সেই ভয়ঙ্কর খবর শোনাতে। শুধু একটি প্রশ্ন এখনও আমার বুক ঠেলে ওঠে বারবার, কী কারণ? সেদিন কেন সে আমাকে বলল না? এখন আমি তার আশায়-আশায় আর কতদিন বসে থাকব? সে কবে আসবে—কবে? যদি না আসে? যদি আর কোনদিনও তার সঙ্গে আমার দেখা না হয়? আমি আবার কবে প্রেমাংশুকে কাছে—খুব কাছে পাবো? পাব না। আজকাল ভয় হয়। আস্তে আমার নিশ্বাস পড়ে। মা চলে যাবেন

জেনেও আর মন খারাপ হয় না। আর এক-একবার মনে হয়, আমিও মার সঙ্গে চলে যাই। একটা সহজ পথ তো আমার জন্যে খোলা রয়েছে তাহলে আমি শুধু শুধু কেন ভেবে মরি!

কিন্তু অনেক দূরে আলোর ক্ষীণ একটা রেখার মতো আমার মনে সেই মানুষের প্রতীক্ষা যেন অল্পে অল্পে দানা বেঁধেছে। মনে হয়, সে আসবে—আসবেই! অন্তত আর একবার যখনই হোক, তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। আর তাই আজকাল আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সে-মানুষ আসে কই!

আজ কিন্তু তার কথা আমার মনে হয় নি—প্রেমাংশুর কথাও না। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দা ভিজে গেল। মাঝে মাঝে ট্যাক্সির হর্ন শোনা যাচ্ছে—তবু বৃষ্টি আর ট্যাক্সি দেখেও প্রেমাংশুর কথা আমার মনে পড়েনি। মা-বাবা দাদা জয়া—কারুর কথাই না। শুধু একটি প্রশ্ন, জয়ার বাড়ি থেকে ফেরবার সময় দাদা আমাকে ঠাণ্ডা স্বরে যেকথা জিজ্ঞেস করেছিল, আমার নিজের কথা এই ভিজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবতে-ভাবতে সে প্রশ্ন আমিও যেন কোন একজনকে বিমূঢ় দিশাহারা হয়ে আজ জিজ্ঞেস করতে চাই, আমি কী করব?

কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে একজন মানুষও কাছাকাছি নেই—কোথাও নেই। এপাশে ওপাশে যত বাড়ি দেখা যায়, সেগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। রাস্তার আলো এখনও জ্বলে নি। রাস্তায়ও কোন লোক নেই। কিন্তু আকাশ সাদা, আশ্চর্য সাদা, এখন আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ নেই। এমন সময় ঝণ্টু আমাকে খুঁজে-খুঁজে বের করে। আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

পিসি, তোমাকে রজত বাবু ডাকছেন।

আমি চমকে পিছন ফিরে ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করি, কে ডাকছেন?

একটা সুন্দর কাকু, ঝণ্টু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে, আমাকে বললেন, দীপা ঘোষাল তোমার কে হন? আমি বললাম, পিসি।

তখন উনি বললেন, খোকা, তোমার পিসিকে গিয়ে বল, রজত বাবু এসেছেন। আমি বললাম, আমার নাম খোকা নয়, ঝণ্টু—

কিন্তু ঝণ্টুর কথা শেষ হবার আগে আমি যেন তীব্র আবেগের ঝোঁকে ওকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী নাম বললে? রজত?

ঝণ্টু মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

তবুও আমি নড়তে পারি না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি যেমন ছিলাম তেমন। এখন দুপুর নয়, বিকেল শেষ হয়ে এল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে। আবার বৃষ্টির দিনে যে এসেছে, আমার সন্দেহ থাকে না, এ সেই মানুষ। ওর নাম রজত। একদিন এসেছিল প্রেমাংশুর মৃত্যুর খবর দিতে। আর আজ, এই চঞ্চল মুহূর্তে আমার মনে হয়, ও যেন তারই বেঁচে ওঠার খবর নিয়ে এসেছে। তবু আমি অনেকক্ষণ নিচে যেতে পারি না। বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনির রেশ এক জায়গায় আমাকে অনেকক্ষণ যেন স্থির করে রাখে। তারপর আমি বুঝতে পারি না কখন এক সময় ঝণ্টুর হাত ধরে নিচে নেমে যাই।

ঠিক দিনেই এবার এসেছে রজত। একটা ক্লান্তি আজ সারাদিন ঘিরে ছিল আমার শরীর-মন। আমি এখনও মুখ ধুইনি, চুল বাঁধিনি, আমার মুখে প্রসাধনের সামান্য স্পর্শও বুলোবার সময় পাই নি। ঠিক এমন অবস্থায় আমাকে দেখুক রজত। আর বুঝুক, আমার চেহারা দেখেই বুঝুক, সত্যি আমি ভাল নেই। আর যেকথা আমাকে বলে নি সেদিন, আজ সেকথা বলুক। কেন ও অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজে এসেছিল আমাকে ভয়ঙ্কর খবর শোনাতে। কেন!

বসবার ঘরে যেতেই হাসিমুখে রজত উঠে দাঁড়ায়, দেখলেন তো, ঠিক এলাম?

বসুন, বসুন, হঠাৎ আমি যেন সহজ হয়ে উঠি, কিন্তু এলেন তো অনেকদিন পর—এখনও সন্ধ্যা হয়নি কিন্তু বৃষ্টির জন্যে ঘরে অন্ধকার জমেছে বলে আমি আলো জ্বেলে দিয়ে বলি, আপনার সঙ্গে সেই কবে দেখা হয়েছিল!

আমি দু-চার দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম, ঝণ্টুকে দেখতে দেখতে রজত বলে, আর ভুল হবে না, তোমার নাম আমার খুব মনে থাকবে ঝণ্টু।

আমি জিজ্ঞেস করি, ভাল আছেন?

আমার কথায় অন্তরঙ্গতার আভাস পেয়ে বোধ হয় একটু অবাক হয় রজত। কিন্তু দু-এক মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুও ইতস্তত না করে বলে, কিন্তু আপনি বোধ হয় ভাল নেই? কেন?

আস্তে আস্তে বলি, বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন—

বিবর্ণ হয়ে যায় রজতের মুখ। একটা অস্বস্তির খোঁচায় মনে হয়, ওর যেন কথা বলতেও কষ্ট হয়। একটু পরে থেমে থেমে বলে, মৃত্যু মৃত্যু শুধু মৃত্যু—আর ভাল লাগে না—

বাবার কথাটা এত তাড়াতাড়ি ওকে যেন না শোনালেই ভাল হত। আমার মনে ছিল না যে মানুষ আজ বসে আছে আমার সামনে সে-ই আর একদিন আর এক মৃত্যুর খবর বয়ে এনেছিল। এখন হয় তো তাই বাবার কথা শুনে এখানে সহজ হতে পারছে না।

ওকে সান্ত্বনা দেবার চাপা ইচ্ছায় বলি, মরতে তো একদিন হয়ই—

ম্লান হেসে রজত বলে, আমিও জানি সেই পুরনো কথা। কিন্তু আপনার বাড়িতে যখনই আসি তখনই যদি আমাদের দুজনের মাঝখানে মৃত্যু এসে দাঁড়ায় তাহলে জীবনের কথা যে বলাই যায় না—

দুর্ঘটনার ওপর কারুর তো কোন হাত নেই। আজ নিশ্চয়ই আপনি কারুর মৃত্যুর খবর নিয়ে আসেন নি?

না। কিন্তু আপনার বাবার কথা শুনে দুঃখিত হলাম।

সে-খবর তো আমিই দিলাম আপনাকে, আমি একটু থেমে বলি, এবার কিন্তু দুর্ঘটনা নয়, বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে—

রজত কোনদিকে তাকায় না। মুখ নামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

হয়তো একটু পরেই চলে যাবে। হয় তো আর কোনদিনও আসবে না। কিন্তু ওকে আমি আবার ডাকব। আবার আসতে বলব। মৃত্যু আমার ভাল লাগে হঠাৎ। মনে হয়, এই সংশয়-যন্ত্রণার ওপারে আছে আর এক জগৎ—যেখানে প্রেম আছে, শান্তি আছে, সান্ত্বনা আছে আর আছে প্রেমাংশু। আমি সে-পথ চিনি না কিন্তু রজত চেনে। মনে হয়, ও যেন ইচ্ছে করলেই আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

রজতকে কথা বলাবার জন্যে আমি জিজ্ঞেস করি, একটা কথা, একটা কারণ—যা আপনি সেদিন আমাকে বলেন নি, থেমে থেমে আমি বলি, আজ বলবেন ?

রজত হেসে বলে, না না—

আমি জোর দিয়ে প্রশ্ন করি, কেন ?

সেসব বাসি হয়ে গেছে, পুরনো হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গেও আমার দেখা হয়ে গেল। সেসব কথায় আর কাজ কী !

বলুন, বলুন—

রজত হয় তো আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে সোজা হয়ে বসে বলে, আমিই আপনার স্বামীকে বাসের ধাক্কায় উল্টে যাওয়া ট্যাক্সি থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাই—

বলুন, তারপর ?

আমার দিকে এখন তাকায় না রজত। অন্য দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বলে, কিন্তু অল্প পরেই, মৃত্যুর ঠিক আগে-আগে, তাঁর কয়েকটা কথা—এ কী, না না, এসব কথা থাক, কেন আপনি আমাকে জোর করছেন !

বলুন, আমি অস্থির হয়ে রজতকে করুণ মিনতি করি, আপনি বলুন। আমি ভাল আছি, খুব ভাল আছি। বলুন, কী কথা আপনাকে শেষ সময় বলেছিল প্রেমাংশু ?

আজ নয়। পরে। অন্য আর একদিন—

না, আজই তার শেষ কথা আমাকে শুনতেই হবে। কেন আপনি শুধু শুধু আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন?

কষ্ট? মাথা নেড়ে রজত বলে, না না, আর কোন কষ্ট আমি আপনাকে দেব না। ভেবেছিলাম, আবার আসব। তারপর একদিন আপনাকে শোনাব আপনার স্বামীর শেষ কথা—

আমি মাথা তুলতে পারি না। রজতকে আবার অনুরোধ করতে আমার হঠাৎ ইচ্ছে হয় না। আমি জানি না কেন, একটা আশঙ্কা, রজতের এখানে আর না আসার ভয় আমার দেহ যেন অবশ করে দেয়। প্রেমাংশুর শেষ কথা শোনাবার পর তার বনভূমির মানুষ আর কি আসবে না এখানে কোনদিন?

এবার আমার চোখে চোখ রেখে গলার স্বরে অস্বাভাবিক দরদ ঢেলে রজত বলে, শুনুন, আপনার স্বামীর শেষ কথা, দীপা, আমি আবার আসব!

এক-এক মুহূর্ত জোরে, খুব জোরে, আমি বলতে পারি না কত জোরে যায়। এক-এক মুহূর্ত হাওয়ার মতো, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ-এর মতো যেন আমাকে, আমার শরীর-মন আর চোখের সামনে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই তুলে নিয়ে যায়—তুলে নিয়ে যায় দূরের এক সবুজ শ্যামল বনভূমিতে। আর সব কিছু নিয়ে যাবার পরেও এখন এই ঘরে যে আমার চোখের তারার মতো স্থির হয়ে থাকে তাকে দেখতে দেখতে আর এ ঘরেই দেয়ালে টাঙানো প্রেমাংশুর ছবি দেখতে দেখতে আমার আবার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি আছ, এখানে, এই ঘরে—

একদিন—সে কবে! প্রেমাংশু যেমন ছিল আমার বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে, এখনও, এই মুহূর্ত অবধি সে যেন—আমি নতুন করে অনুভব করি, তেমনি আছে। আজ আবার রজতের কথায় প্রেমাংশু বেঁচে উঠেছে।

প্রেমাংশু বলেছিল, রজতকে নয়, আমাকেই—আমি কাছে

ছিলাম না, আমার যাবার আর সময় ছিল না তখন। প্রেমাংশু যাবার সময় আমাকেই খুঁজেছিল। খুঁজবেই। ওর শেষ কথা শুনে-ছিল রজত। সেকথাই আমাকে শোনাতে এসেছিল। কিন্তু আমার শোনবার অবস্থা ছিল না তখন। রজত বলতে পারে নি।

দীপা, আমি আবার আসব! যখন বলেছিল প্রেমাংশু তখন ওর এই আশ্বাস, ওর ফিরে আসার কথা মিথ্যা মনে হত আমার। তখন রজত আমাকে বলে নি—বলতে পারে নি। তখন কান্নার একটানা আওয়াজে আর অন্ধকারের নির্জনতায়, একের পর এক অনেক মানুষের সান্ত্বনার কথা শুনতে শুনতে একজন, যে নেই, যে নেই এই পৃথিবীর কোথাও তার ফিরে আসার কথাটা আমাকে কাঁদাত অনেক বেশি। প্রেমাংশুর কথা আমি শুনতে পেতাম না—তার কথা আমি বুঝতে পারতাম না।

আজ রজতের মুখ থেকে প্রেমাংশুর কথা শুনতে শুনতে একটা স্পষ্ট অতীত—প্রেমাংশুকে নিজের করে রাখার, আমার শরীর আর মনের উত্তাপ দিয়ে তাকে বুকের ওপর রাখার সেই অতীত আমার মনে পড়ে।

কিন্তু এখন আমি ভেঙে পড়ি না। এখন শুধু ম্লান হেসে রজতকে বলি, একথা আমাকে বলতে আপনি এত ইতস্তত করছিলেন কেন? এ তো মৃত্যুর কথা নয়।

রজত বলে, আপনার স্বামীর শেষ কথা শোনাতে আমি সেদিন নিজে গিয়েছিলাম। আপনাকে চিনতাম না, তখন আপনাকে দেখি নি। সেদিন, আমি জানতাম, তাঁর শেষ কথা আপনাকে শোনাবার সুযোগ আমি পাব না। আমি জানতাম, আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না—পড়ে যাবেন। এত বড় আঘাত আপনি স্থির হয়ে সহ্য করতে পারবেন না—

বলুন, বলুন—

কিন্তু আমি আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম—

আমি বাধা দিয়ে খুব আস্তে বলি, আমি তো বেঁচেই আছি—

তবু আমি আপনার স্বামীর শেষ কথা শুনিয়ে আপনাকে একটা আশ্বাস দিতে চেয়েছিলাম। শোক সামলে ওঠার পরেও একটা আশ্বাস না পেলে—কী ভেবে রজত বলে, হয় তো যন্ত্রণা কমে না, স্থির হয়ে কোন কাজই করা যায় না—

আমি এক মনে রজতের কথা যেন আর শুনতে পারি না। মনে হয়, রজত সব কথা জানে না আমার। ও জানে না, আমার অনেক পুড়ে যাওয়া, ডুবে যাওয়া দিন রাতের কথা।

দীপা, আমি আবার আসব! এখন এ ঘরে বসে অল্প আলোয় রজতের মুখ দেখতে দেখতে, প্রেমাংশুর শেষ কথা, যার পরে আর কথা নেই, হঠাৎ যেন সত্যি হয়ে যায়।

রজত বলে যায়, আপনাকে না দেখলেও আমি আপনার শূন্যতা, আপনার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো অনুভব করেছিলাম। কেন, কোন মায়ায়, আমি জানি না, আমি বলতে পারি না। আপনার স্বামীকে না চিনলেও, জীবনে তাঁকে মোটে একবার দেখলেও, এমন সময় তাঁকে দেখেছিলাম, তা ভোলবার সময় নয়। ওঁকে দেখতে দেখতে আপনার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমি আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, রজতের চোখে, আমি দেখতে পাই আগ্রহের অদ্ভুত দীপ্তি যেন ফুটে ওঠে, আমি প্রেমাংশুকেই বাঁচাতে চেয়েছিলাম—

ইচ্ছে না থাকলেও রজতের কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে ফেলি, আমিও চেয়েছিলাম। মৃত্যুর পরেও অনেকদিন প্রেমাংশুকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম—

রজত কথা বলে না। ঝন্টুর দিকে তাকিয়ে হাসে। কিন্তু এতক্ষণ আমার কাছে একেবারে চুপ করে বসে থেকে থেকে বোধ হয় ঝন্টু হাঁপিয়ে ওঠে। আমি ওকে পাঠিয়ে দি এবার মার কাছে। আর রজতের চা-এর ব্যবস্থা করবার জন্যে নিজেও উঠে দাঁড়াই।

প্রেমাংশুকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, বন্ধ করে রেখেছিলাম স্মৃতির খাঁচায় কিন্তু শেষ অবধি মৃত্যুরই জয় হল—সেকথা রজতকে বলতে গিয়ে আমি থেমে যাই। আর চা করতে-করতে কিছুক্ষণ একা, রজতের চোখের আড়ালে থাকার ইচ্ছেও আমার মনে জাগে।

প্রেমাংশু নেই, আজ এই মুহূর্তে সেকথা আমি ভাবতে পারি না। প্রেমাংশুর মৃত্যু হঠাৎ যেন মুছে যায়। একটা ঘোর, একটা আবেশ আমাকে এখন স্থির হয়ে রজতের সামনে বসে থাকতে দেয় না। কিছু-ক্ষণের জন্যে নিজের বুকে এই উপচে পড়া খুশির স্বাদ একা-একা গ্রহণ করবার জন্যে চা আনবার নাম করে বেরিয়ে যাই। আর আজ যেকথা অনেক দিন পর শুনলাম রজতের মুখে বারবার শুধু সেকথাই মনে হয়, দীপা, আমি আবার আসব!

হয় তো আসবে প্রেমাংশু। জীবনের রূঢ় সত্য, যুক্তির কঠিন প্রাচীর হঠাৎ যেন আমার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। মৃত্যুর পর কেউ যে আর ফিরে আসে না আমি যেন তা ভুলে যাই। যে-কল্পনা এতদিন আমাকে পুড়িয়েছে, আমাকে কাঁদিয়েছে, জীবনের উগ্র ক্ষুধা ব্যর্থ করে দিয়েছে আমার এক-একটি নির্জন মুহূর্ত—আজ রজতের কথা শুনে আবার কল্পনার সেই জাল আমাকে যেন নতুন করে বাঁধে। আমার মনে হয় আসবে, প্রেমাংশু আসবেই। আর আমার বুক থেকে একটা ভারী বোঝা রজত যেন এক মুহূর্তে, কয়েকটি কথায় নামিয়ে দেয়—গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়।

কিন্তু একটু পরেই আমি রজতের জন্যে চা নিয়ে যখন আবার এ ঘরে ফিরে আসি তখন রজতের পাশে শৈলেনকে বসে থাকতে দেখে আমার বুকে, আমি বুঝতে পারি না কেন এই খুশির ঝলক যেন দপ্ করে নিভে যায়। শৈলেনকে দেখে আমি ভয় পাই।

কখন এলেন?

এই তো, রজতকে একবার দেখে নিয়ে শৈলেন জিজ্ঞেস করে, বিজন নেই?

না।

ঝণ্টু?

আছে। ডাকব?

না না—

আমার দাদার বন্ধু শৈলেন দা, আমি যেন একটা কৈফিয়ৎ দি রজতকে আর তারপর শৈলেনের দিকে তাকিয়ে বলি, প্রেমাংশুর বন্ধু রজত—

আমাকে থেমে যেতে দেখে রজত কথা শেষ করে দেয়, রজত মুখার্জি।

কিন্তু আমি জানি না, কেন হাসে না শৈলেন—কেন ভাল করে কথা বলতে পারে না রজতের সঙ্গে। আমি তাকে চায়ের কথা বললে সে তাও খেতে চায় না। আর তখন আমার মনে হয় আজ এ সময় এখানে রজতের সামনে শৈলেন না এলেই যেন ভাল হত। আর আমি নিজেও হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যাই। রজতের সঙ্গে কথা বলবার সময় সে-অন্তরঙ্গতার সুর যেন আর ফুটিয়ে তুলতে পারি না।

আর অল্প পরে, চা শেষ করে বিদায় নেবার সময় আমি রজতকে বাধাও দিতে পারি না। বোধ হয় একটা কথা আমার মনে পড়ে যায়, শৈলেন আমাকে শ্রদ্ধা করে। তার শ্রদ্ধার কোন মূল্য নেই আমার কাছে তবু সে বসে থাকে এক নীরস বৃদ্ধ অভিভাবকের মতো। আমার মুখে বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে ওঠে। ওর সামনে আমি রজতকে আবার আসবার জন্যে অনুরোধও করতে পারি না। তাই ওর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাই বাইরের দরজার কাছে।

আবার কবে আসবেন?

আবার, আমার দিকে তাকিয়ে হাসে রজত, হঠাৎ একদিন এসে পড়ব—

ঠিক আসবেন।

রজত একটু ইতস্তত করে বলে, আপনিও একদিন যাবেন ঝণ্টুকে নিয়ে। আপনার দাদার সঙ্গে তো আজ আলাপ হল না—

আমি হেসে বলি, একদিনেই কি আর সকলের সঙ্গে আলাপ হয়? এবার যেদিন আসবেন সেদিন মার সঙ্গেও আলাপ হবে—

আসব, নিশ্চয়ই আসব, আস্তে আস্তে রজত রাস্তায় নামে। একবার পিছন ফিরে তাকায়। এখন বৃষ্টি নেই। চারপাশে একটা জোলো আবেশ আছে। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। আমি জানি না কেন হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আমার। আমি আবার বসবার ঘরে শৈলেনের সামনে এসে বসি।

মাথায় একটা হাত দিয়ে বসে আছে শৈলেন। কী কারণে আমি বুঝতে পারি না ও চোখ তুলে তাকায়না আমার দিকে—তাকাতে পারে না। একমনে কী ভাবতে থাকে শৈলেন! আর রজতের সঙ্গে কথা বলার পর এখন আমার এখানে বসে শৈলেনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। যতক্ষণ রজত ছিল, ও চলে যাবার পর আমার মনে হয়, ততক্ষণ একটা আশ্চর্য উত্তাপও ছিল এ ঘরে. উজ্জীবনের উজ্জ্বল আভায় জ্বল জ্বল করছিল দেয়ালে টাঙানো প্রেমাংশুর ধুলোপড়া ম্লান ছবিটা। খুব অল্পক্ষণ ছিল রজত কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যেও অনেকদিন আগে মৃত একটা মানুষের দেহে ও যেন ওর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। শৈলেনের সে-ক্ষমতা নেই। আর কারুর সে ক্ষমতা নেই।

এখন, শৈলেনকে দেখতে দেখতে আমার মনে হয়, অকাল বর্ষার গুমোট গরমেও ঘরটা হঠাৎ যেন বড় বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যদি শৈলেন না আসত তাহলে আরও অনেকক্ষণ রজতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি প্রেমাংশুকে আমার চৈতন্য দিয়ে যেন অনুভব করতে পারতাম। তার নিশ্বাস আমার গায়ে লাগত। আমি প্রেমাংশুর দেহের উত্তাপেরও স্বাদ পেতাম।

শৈলেন কথা বলে এবার, তোমার স্বামীর এই বন্ধু, কী নাম যেন, রজতবাবু? বেশ লোক, না দীপা?

আমি কোন রকমে শুধু বলি, হ্যাঁ, বেশ লোক।

এঁকে বোধহয় আগে কখনও এ বাড়িতে দেখি নি—

না, উনি এখানে এই দ্বিতীয়বার এলেন, যেন এবার শৈলেনকে একটা কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে আমি বলি, উনি বাইরে ছিলেন কি-না।

কোথায়?

আমি জানি না, জানতাম, এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

ওঁর স্ত্রীকে দেখেছ তুমি? শৈলেনের চোখে কৌতূহল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওর এই প্রশ্ন শুনে মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যায় আমার। মাত্র একদিন একটি মানুষকে এখানে দেখে, আমি বুঝতে পারি ওর মনে অন্য সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। অপমানের একটা ধারালো অস্ত্র যেন আমার গায়ে এসে বেঁধে। কিন্তু একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়ে দেখি আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আর একটা ভয়, কিসের ভয় হঠাৎ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না. শুধু প্রেমাংশু, যাকে আজ আবার আমি নতুন করে পেয়েছি, আমার মনে হয়, একটা রূঢ় প্রশ্নে মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা একটা মানুষ শৈলেন তাকে আবার দূরে, অনেক দূরে নিয়ে যাবে। এখানে শৈলেনের সঙ্গে বেশিক্ষণ বসে থাকলে প্রেমাংশুর সবুজ বনভূমির ঘ্রাণও আমার নাক থেকে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু আমি প্রেমাংশুকে আর হারাতে চাই না—আর হারাতে পারব না।

শৈলেনের প্রশ্নের উত্তরে আমি শান্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলি, অত খবর আমি জানি না। তবে রজত বাবুর চেহারা দেখে মনে হয় বিয়ে হয় নি—

চেহারা দেখে? হেসে ওঠে শৈলেন, মানুষের চেহারায় বিয়ের খবর লেখা থাকে নাকি?

কথা শুনলে বোধহয় বোঝা যায় কে সংসারী আর কে নয়, শৈলেনকে লক্ষ্য করে আমি বলি, শুধু আপনার চেহারা দেখে আমি

কিছু বুঝতে পারি না। আপনাকে দেখে ঘোরতর সংসারী বলেই মনে হয়—

আরও জোরে হাসে শৈলেন, হ্যাঁ, আমার চেহারাটা অদ্ভুত বটে, মাঝে মাঝে আয়নায় দেখি তো—কথা বলতে বলতেই হাসি মিলিয়ে যায় শৈলেনের। ওর চোখ দুটো করুণ, বড় বেশি করুণ দেখায় আর তেমন চোখ তুলে ও তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আর এই নতুন মৃত্যু আমার ভাল লাগে না। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

দীপা, খুব আস্তে আমার নাম ধরে ডাকে শৈলেন। আমি উত্তর দি না শুধু মুখ তুলে ওর দিকে তাকাই।

এক একবার মনে হয় এ সমাজের সব নিয়ম-কানুন ভেঙে শুধু মনকেই শ্রদ্ধা করি—

হঠাৎ শৈলেনের এই উচ্ছ্বাসের কারণ খুঁজে না পেয়ে আমি বলি, নিয়ম-কানুন না ভাঙলে বুঝি মনকে শ্রদ্ধা করা যায় না?

না, যায় না। আমাদের মন এক দিকে যেতে চায় আর হাজার সংস্কার তার মুখ ফিরিয়ে দেয় অন্যদিকে। আমরা ইচ্ছে মতো চলতে পারি না বলে যন্ত্রণা ভোগ করি—

আমি শৈলেনকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠি, তাই বোধহয় লোকে আশ্রমে চলে যায়, সংসারে থাকলেই মন নানা দিকে চলতে চাইবে। তখন তো যন্ত্রণা ভোগ করতে হবেই।

শৈলেন বলে, হতাশা কিম্বা মনের যন্ত্রণায় লোকে সংসার ছেড়ে যায়—সে তো পালিয়ে যাওয়া। যদি কেউ ভগবানকে পেতে চায়, তার ডাক শুনে সব ছেড়ে যায়, সে হল আলাদা কথা। কিন্তু আমার মন যা চাইছে, সংস্কার তা পেতে দিচ্ছে না, মনকে কেবলই পীড়িত করছে—তখন পালিয়ে আমি যাব কোথায়? আমাকে শুধু একটা উৎকট মানসিক ব্যাধিতে ভুগতে হবে।

আমি যেন শৈলেনের কথায় সায় দিয়ে বলি, সভ্য হতে গেলে

একটু না ভুগলে চলবে কেন। আমরা তো আর সেই অসভ্য আদিম যুগে ফিরে যেতে পারি না।

কিন্তু ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, আমি দেখতে পাই হিংস্র আগুনের কড়া ঝাঁজে শৈলেনের চোখ দুটো জ্বলতে থাকে, তখন মনের এত রোগ ছিল না, মানুষ এমন করে সংস্কার আর সংযমের ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের মনকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মারত না—

মনের রোগ ছিল কি-না জানি না, কিন্তু শান্তিও হয় তো খুব বেশি ছিল না। তাই নিয়ম হয়েছে, সমাজ হয়েছে, সংস্কার হয়েছে—

মন যা চায় তা যদি না পাওয়া যায়, শুধু নিয়ম আর সংস্কারের কাঁটায় গোটা জীবনটাকেই যদি অস্বীকার করতে হয় তাহলে বেঁচে থেকে কী লাভ?

আমি যেন এবার অল্প অল্প বুঝতে পারি কী কথার আভাস দিতে চায় শৈলেন। কিন্তু আমি এখন ওর কথা শোনবার জন্যে, ওর কোন ইঙ্গিতের অর্থ স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত নই। এখন যেমন করে হোক শৈলেনের মুখ বন্ধ করে দিতে না পারলে অকারণে আমার জীবনটাই জটিল হয়ে উঠবে। আর একবার এখানে বসে-বসে আমার মনে হয়, আমি প্রেমাংশুকে আর হারাতে পারব না।

শৈলেনের কথার উত্তরে আমি বলি, কিন্তু মন যা চায় সব কালেই তা পাওয়া কঠিন। আপনি যে আদিম যুগের কথা বললেন, তখন, আপনি মনে করেন মানসিক ব্যাধি ছিল না—তখনও মানুষের মন যাকে চাইত তাকে পেত কি?

পেত, নিশ্চয়ই পেত।

বোধ হয় না। কারণ তখন যে শক্তিশালী তারই জয় হত—আমি দৈহিক শক্তির কথা বলছি। বলবানের কাছে বোধহয় ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে হত। আর

সে-বর্বর যুগের অবসান হল নিয়ম সমাজ সংস্কারে। মানসিক ব্যাধি আমার মনে হয় সব কালেই ছিল। কাজেই এখনও একটু ভুগতে তো হবেই।

সংস্কার ভাঙতে পারলে এই ব্যাধি থেকে তো মুক্তি পাওয়া যায়।

যায় না, আমি এবার শৈলেনের বলা কথা একটু অন্যরকম করে তাকেই শোনাই, সংস্কার ভাঙার বেদনা কিম্বা যন্ত্রণা পরে আমাদের আর এক নতুন ব্যাধি দেয়। প্রত্যেকেরই একটা অতীত থাকে তো। মানে, কিছু ভাঙবার আগে একজন মানুষ যেমন ছিল—আমি সেই অতীতের কথা বলছি—

আমার কথা ফুরোবার আগে শৈলেন অধীর হয়ে বলে, আমি সব বুঝি দীপা, আমি সব জানি—কিন্তু যা-ই হোক, আমি জীবনকে সংস্কারের গণ্ডিতে দাঁড় করিয়ে অস্বীকার করতে পারব না।

করবেন না।

কিন্তু তুমি কেন করছ?

কী করছি আমি?

বয়সের দাবী, জীবনের দাবী তুমি মেনে নিতে পারছ না কেন?

আমি শৈলেনের চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলি, আমার কোন দাবী—কোন ব্যাধি নেই, আপনি ভুল করেছেন—

কী নিয়ে বেঁচে আছ তুমি?

আমার অভাব আপনি কোথায় দেখেছেন? আমি প্রেমাংশুর স্মৃতি বহন করে একটা নিগূঢ় আনন্দের স্বাদ পাচ্ছি।

স্মৃতি, শৈলেন হেসে বলে, ও তো বাসি হয়ে যায়। শুধু স্মৃতি দিয়ে কি জীবনকে ভরে তোলা যায়?

জীবন বলতে আপনি কি বোঝেন—শুধু প্রেম? স্মৃতি বাসি হয়ে যায় আমি জানি কিন্তু তখন প্রেমের গণ্ডিও আমরা অতিক্রম করে আসি—শুধু প্রেম নিয়েই তো জীবন নয়।

আমার মনে হয় শুধু প্রেম নিয়েই জীবন—নিঃসঙ্গতার হাহাকার তোমাকে কি মাঝে মাঝে যন্ত্রণা দেয় না ?

দেয়। কারণ আমার কোন কাজ নেই। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে আপনি যে একাকীত্বের কথা বলছেন তা আমাকে বিষণ্ণ করে তুলতে পারত না, এক মিনিট চুপ করে থেকে বলি, আমি কাজ চাই, কাজ নিয়ে বাঁচতে চাই।

শৈলেন বলে, যন্ত্রের মতো ?

না, ক্লান্তির সময় প্রেমাংশুর স্মৃতি আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেবে যে আমি মানুষ—আমি ক্লান্ত হব না।

শৈলেন এতদিন পর আমাকে আরও বোঝায়, একদিন, যখন তোমার বয়স বেড়ে যাবে, কাজের ক্লান্তিতে শরীর-মন অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন শুধু প্রেমাংশুর স্মৃতি তোমাকে শান্তি দিতে পারবে না।

কে শান্তি দেবে ? সংসারে থেকে কে শান্তি পায় ? এসব কথা আমাকে বলবেন না—বোঝাবেন না। আমি শুনব না. মানব না।

শৈলেন বলে, যেকথা তোমাকে বলতে পারি নি, থেমে যায় শৈলেন। একবার দরজার দিকে তাকায়, ভুমি আমাকে ভুল বুঝনা দীপা। প্রথম জীবনে তোমাকে দেখার পর—

শৈলেনের কথা শুনতে শুনতে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না আমার মনে, এসব কথা আমাকে বলবেন না। আমি শুনতে পারব না। আমি প্রেমাংশু ছাড়া কাউকে জানি না। আপনারা আমার বিশ্বাস, আমার স্মৃতি, আমার নির্ভর এমন করে চুরমার করে আমাকে নিরাশ্রয় করবেন না—

শৈলেন একা সে-ঘরে বসে থাকে চুপচাপ। কিন্তু আমি আর সেখানে বসে থাকতে পারি না, একটা হঠাৎ-আসা আবেগে আমার শরীর থরথর করে কাঁপে। আমি সে-অবস্থা শৈলেনকে দেখাতে চাই না বলে এই আবেগ সংযত করবার জন্যে ঘর ছেড়ে যাই।

আমি মার কাছে যাই না, ঝণ্টুকে ডাকি না। একা-একা আমার ঘরের পাশের ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। আর তখন সুখ আর দুঃখ, প্রেমাংশু আর রজত, শৈলেন আর সংসার, আসক্তি আর নিরাসক্তি, স্মৃতি আর কাজের ভাবনা আমাকে অল্প-অল্প করে যেন ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে, আমি জানি না কার কথা ভেবে আমি দিশা হারিয়ে উচ্চারণ করি, বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও!

॥ আট ॥

জয়া এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর, আমার মনে পড়ে না আমি কোন ঘরে কিম্বা বারান্দায় শূন্যতার সামান্য স্পর্শ অনুভব করেছিলাম। আমার মনে বেদনা ছিল, অশান্তি ছিল আর হয় তো বুকের মধ্যে একটা অভিমানও জমা হয়ে উঠেছিল বলে জয়ার চলে যাওয়া আমাকে এত বিচলিত করে নি।

শেষ অবধি মা সংসার খালি করে দিয়ে একেবারে চলে গেলেন। জীবনের শেষ ক'টা দিন তিনি কাটাবেন কাশীতে। আর কখনও এ বাড়িতে ফিরবেন না। এখন সংসারে দাদা ঝণ্টু আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এখন সংসারের সব ভার আমার ওপর—আমার অনেক কাজ।

আর এই কাজের চাপে আমি আস্তে আস্তে মা-বাবার কথা, আমার নিজের সুখ-দুঃখের কথা, এসংসারেরশূন্যতার কথা ভুললাম—ভুলতে পারলাম। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, যে দাদা একদিন জয়াকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল, এখন তার মুখে জয়ার নামও শোনা যায় না। তার সঙ্গে আর দেখা করতে যায় নি দাদা। ওর চেহারা দেখে মনে হয়, একটা কঠিন লোহার খাঁচা ভেঙে ও যেন অনেকদিন পর বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

অনেকদিন আগে, আমার ছেলেবেলায় দাদা যেমন জোরে-জোরে হাসত, আবোল-তাবোল গল্প করত—এখন আবার তেমন মজার-মজার গল্প বলে আমাকে হাসায়। আর ওর কথা শুনতে-শুনতে এক একবার আমার মনে হয়, সংসার মানুষকে মারে, অল্প-অল্প করে শেষ করে দেয়, দায়িত্বের বোঝা একটা ক্লান্তির ছাপ ফুটিয়ে দেয় চেহারায়। এখন দাদা অন্য মানুষ, এখন যেন ওর কোন ক্লান্তি

নেই, দায়িত্ব নেই। কিন্তু রোজ ভোরবেলা ও ঝণ্টুকে নিয়ে বেড়াতে যায়, ওকে পড়ায়। অফিস থেকে ফিরে আসে ঠিক সময়। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করে, দীপু, আজ সিনেমায় যাবি?

এক-একবার চলে যেতে ইচ্ছে করে। আমি না গেলেও দাদা যাবে ঝণ্টুকে নিয়ে—যাবেই। কী হবে আমার একা-একা ঘরে থেকে। শৈলেন এসে সেই এক সুরে শোনাবে ওর মনের কথা—আমার মাথা ধরে যাবে। তার চেয়ে দাদার সঙ্গে সিনেমা দেখা অনেক ভাল। কিন্তু মনে হয়, এখনও আমি দুর্বল, বড় বেশি দুর্বল। এখনও আমি অপেক্ষা করি। আমার ভয় হয়, যদি রজত এসে ফিরে যায়! আমার সিনেমায় যাওয়া হয় না।

জয়া যেমন করে বাইরের আলোয় নিজেকে মেলে দিতে পেরেছে, দাদা যেমন করে সংসারের ওপর থেকে মন তুলে নিয়েছে, আমি এখনও তেমন করে যেন নিজেকে তৈরি করতে পারি নি। এখনও আছে প্রেমাংশু. এত কাজের মাঝে, সংসারের এই হিম-শূন্যতায় এখনও মাঝে মাঝে আমি তার উত্তাপ অনুভব করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠি।

জয়ার কথা আর বলে না ঝণ্টু। ও খুশি আমাকে নিয়ে, বাপকে নিয়ে, ওর ইস্কুলের বন্ধু বান্ধব নিয়ে। আর যদিও আমার সঙ্গে জয়ার অনেকদিন দেখা হয় নি, দূর থেকেই আমি বুঝতে পারি, এক বুক শূন্যতা নিয়ে ও হয় তো আমার মতো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবার সময় পায় না। তাহলে আমিই শুধু কেন একা-একা রজতের আশায় রোজ সন্ধ্যায় বসে থাকি! এখনও কেন একটা মুখ, সে-মুখ প্রেমাংশুর, আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে কাঁপে! যদি এই বেদনা, এই কোমলতা আমার মনে না থাকত তাহলে আমি কত সহজ হতে পারতাম! একটা মানুষকে ভুলতে, হৃদয়ের একটা বৃত্তিকে পিষে ফেলতে এত দেরি লাগে কেন!

সেদিন আমি দাদার সঙ্গে সিনেমায় যাইনা বটে, কিন্তু মনে মনে

ঠিক করি এমন করে রোজ সন্ধ্যায় কারুর আশায় আমি আর ঘরে বসে থাকব না। একা-একা বাড়ি বসে আমার শুধু মার কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়, প্রেমাংশুর কথা মনে পড়ে। আর পিছনের এই ম্লান ঠাণ্ডা স্পর্শ আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয় না—আমাকে যেন অক্ষম পঙ্গু করে ঘরে বসিয়ে রাখে। এমন করে আমি বাঁচতে চাই না।

এখন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। এবার যেন বর্ষা এলই না—কবে সময় চলে গেছে। এখন হঠাৎ আকাশে মেঘ জমে। ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। আর তারপরই ঝুর ঝুর বৃষ্টি নামে। এমন বর্ষা আমার ভাল লাগে। কিন্তু ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। বৃষ্টির সময় একা-একা ঘরে বসে থাকতে এখনও আমার ভয় লাগে।

একবার মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাই। রোদ নেই। আকাশ জুড়ে যেন একটা দীর্ঘ ছায়া কাঁপছে। কার ছায়া, কিসের ছায়া, আমি বুঝতে পারি না। আমার ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। এখন দুপুর। কিন্তু ঘরগুলো অন্ধকার। সারা বাড়ি থমথম করছে। প্রেমাংশুর ছবিটাও ম্লান হয়ে গেছে যেন। এখন কেউ আসবে না। রজত না। শৈলেন না। কেউ না।

একটা ছায়া, আকাশের সেই নির্জন ছায়া—যেন আস্তে আস্তে পৃথিবীতে নামছে। সেই ছায়া আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে বাঁধবে, আমাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরবে। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ি একেবারে চুপচাপ। দাদা অফিসে। ঝন্টু ইস্কুলে। শুধু আমি একা জেগে-জেগে ভয় পাই—আকাশের ওই নির্জন ছায়ার ভয়! আমি ঘরে আর বসে থাকতে পারি না। দুপুর-বেলা বেরিয়ে পড়ি। আমার যাবার কোন জায়গা নেই। একা-একা সিনেমায়ও যেতে ইচ্ছে করে না। আকাশের সেই ছায়া বড় হয়, অনেক বড়, সেই নির্জন ছায়া পৃথিবীতে নামে—সেই নির্জন ছায়া যেন আমাকে ঘিরে ফেলে।

একবার, আমার মনে হঠাৎ চমকে ওঠে রজতের কথা—প্রেমাংশুর কথা। প্রতাপাদিত্য রোড এখান থেকে বেশি দূরে নয়। না না, আমি বুঝতে পারি না কেন, আমার মনের সব চেয়ে বড় গোপন ইচ্ছেটাকে, একটা লজ্জা, হিংস্র জানোয়ারের মতো যেন গলা চেপে মারে। প্রতাপাদিত্য রোডের দিকে আমি যাই না—যেতে পারি না। সংসারের দু-একটা দরকারী জিনিস কিনব বলে আমি এসপ্ল্যানেডের ট্রাম ধরে নিউ মার্কেটের কাছাকাছি নেমে পড়ি।

মেঘলা দিন। এখন হাওয়া নেই। এখন গুমোট গরম। ঘামে শরীর ভিজে যায়। নিউ মার্কেটে ঘুরে-ঘুরে জিনিস কিনতে আমার ভাল লাগে না। ক্লান্তি আসে, বিরক্তি লাগে। মনে হয়, এখন না এসে ঝণ্টুকে নিয়ে অন্য সময় এলেই হত। তাড়াতাড়ি দু-একটা জিনিস কিনে আমি আবার বাইরে বেরিয়ে আসি। একটা ট্যাক্সি ডাকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। আজ একা-একা ট্যাক্সি চড়তে আমার ইচ্ছে করে না—ভয় লাগে।

ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দূরে আর একজনকে দেখে হঠাৎ চিনতে যেন আমার কষ্ট হয়। জয়া আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। ও হাসে আমাকে দেখে। আর ততক্ষণে আমি আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি এ সময় এখানে—অফিস নেই?

আছে, জয়া বলে, ঘণ্টা খানেকের ছুটি নিয়ে বেরিয়েছি—একটা বিয়ের প্রেজেণ্ট কিনতে হবে, একটু থেমে ও বলে, যাক, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। চল কাছাকাছি কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক—

জয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই এগিয়ে যায়। আমিও যাই ওর সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, আমারও মনে হয়, ওর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। এখন জয়াকে দেখতে আমার ভাল লাগছে—খুব ভাল লাগছে। ওকে দেখতে দেখতে আমার নিজেকে মনে হচ্ছে ম্লান, অসহায়।

এই পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হল জয়ার জীবনে! ওর চেহারায় দুঃখের, দৈন্যের অল্প স্পর্শও নেই। জয়ার গোটা শরীরটা যেন ঝক ঝক করছে কঠিন ইস্পাতের মতো। ও দমবে না। ভাঙবে না। কিছুতেই না। কিন্তু আমি এমন করে ভেঙে যাচ্ছি কেন! আমার ক্ষয়ে যাওয়ার কোন কারণই তো নেই। জয়ার ছেলে আছে, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও সে এখনও বেঁচে আছে—মনের যন্ত্রণায় এতদিনে জয়ার তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা—কিন্তু এর মধ্যেও ও কেমন করে এত নতুন হয়ে উঠতে পারল। বার-বার আমার মনে হচ্ছে, আমাদের বাড়িতে, একটা সংসারে, দাদার ঘরে যে জয়াকে আমি দেখেছি, এ সে নয়। এ যেন অন্য কেউ। এই জয়া আমাদের সকলকে ফেলে, সব বাধা পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। তাই হঠাৎ ওকে আমি চিনতে পারি না। কিন্তু জয়াকে আমার ভাল লাগে। আমি অবাক হয়ে যাই।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটা বিলিতি রেস্তোরাঁয় ঢোকে জয়া। হাসি মুখে কফির অর্ডার দেয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আর কিছু খাবে?

আমি মাথা নেড়ে আপত্তি জানাই, না না—কিছু না।

সেদিন তোমার সঙ্গে কোন কথাই হল না, নিজের ব্যাগটা একটা খালি চেয়ারে রেখে জয়া বলে, তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে না?

হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে বলি, রেগে গিয়েছিলাম? কবে?

যেদিন আমার ওখানে গিয়েছিলে—তোমার দাদাকে দেখে আমার মাথার ঠিক ছিল না—

জয়াকে বাধা দিয়ে আমি বলি, ও হ্যাঁ। না, আমি রাগ করি নি। তোমাকে খবর না দিয়ে যাওয়া দাদার অন্যায় হয়েছিল।

তবে এখন ওকে দেখলে আমার আর রাগ হবে না। ওর সম্বন্ধে এখন আর কোন অনুভূতি আমার নেই। আমি শুধু একজনের জন্যে

বসে থাকি—সে ঝণ্টু। আমি জানি, ও বড় হয়ে আমার কাছে আসবেই।

এখনও মাঝে মাঝে তুমি তো ওকে তোমার নিজের কাছে এনে কয়েকদিন রাখতে পার?

হ্যাঁ পারি, একটা নিশ্বাস ফেলে জয়া বলে, ইচ্ছে করেই আনি না। তুমি ও বাড়িতে আছ বলেই ঝণ্টুর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত আছি। এখন ওকে আমার কাছে এনে রাখলে আমারই ক্ষতি—আমারই অশান্তি।

জয়ার কথার মানে বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, কী ক্ষতি?

অনেক ক্ষতি, একবার পিছনে তাকিয়ে জয়া বলে, ঘরে কোন টান থাকলে—কোন বাঁধন থাকলে আমি এমন করে এগিয়ে যেতে পারতাম না—

তোমার কোন বাঁধন নেই?

না নেই। আমার কোথাও কিছু নেই দীপু। দূরে যেমন ঝণ্টু আছে, তেমনি কাছাকাছি আছে শিশিরবাবু—জয়া হেসে বলে, কিন্তু আমার ঘর ফাঁকা দীপু। ঘরে কেউ নেই। তাই আমার মনে কোন বোঝা নেই—কোন পীড়া নেই—

জয়া থেমে যায়। আমি মনে মনে ভাবি, তোমার মতো আমার ঘরও তো ফাঁকা, কিন্তু আমার মনে কেন এত বোঝা—এত পীড়া?

একটু পরে কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে জয়া বলে, এখন কারুর ওপর আমার কোন রাগ নেই দীপু, কারুর কাছে কিছু চাইবারও নেই। কিন্তু প্রথম-প্রথম রাগ ছিল। আর যেন দাবী-দাওয়াও ছিল। তাই নিঃঝুম ঘরে বসে থাকতাম, পাবার আশায় ব্যাকুল হতাম, মনের জ্বালায় জ্বলতাম, কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না—কিছু করবার চেষ্টাও করতে পারতাম না—

আমি জয়ার কথার মাঝে বলে উঠি, আমার তো কেউ নেই,

কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না কেন? অক্ষম হয়ে বসে থাকি কেন?

জয়া বলে, তোমার অতীত মধুর। তুমি তা ভুলতে পার না। আমার অতীত তিক্ত আর তাই আমি বেঁচে গেছি, আর এক চুমুক কফি খেয়ে বলে জয়া, স্বামীর ভালবাসা তুমি পেয়েছ, আমি পাই নি। ভাগ্যিস পাই নি। পেলে কী পেতাম? একটা ছোট অন্ধকার ঘরে জীবনের শেষ দিন অবধি বসে থাকতে হত—তাহলে আমি জীবনের অনেক কিছুই জানতে পারতাম না—

জয়া থামে কিন্তু আমি হঠাৎ কোন কথা বলতে পারি না। আর মনে মনে আমি তার কথাগুলো অস্বীকারও করতে পারি না। হ্যাঁ, স্বামীর প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে গোটা জীবনকে, পৃথিবীকে যে পাওয়া যায় না এখন সেকথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখনও একটা প্রশ্ন আমার মনে থেকে যায়। ছোট ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে, স্বামীর ভালবাসা না পেয়ে জীবনে তার চেয়ে বেশি, তার চেয়ে বড় আর কী পেয়েছে জয়া।

কিন্তু, আমি মাথা তুলে বলি, একটা কথা, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পার জয়া?

কী?

ঘর না থাকলে, কিম্বা জীবনে কোন আকর্ষণ না থাকলে, এমন কী পাওয়া যায় যা মন একেবারে ভরে দেয়—কোন ফাঁক থাকে না?

জয়া হেসে বলে, সে জিনিস হল স্বাধীনতা, একটা আশ্চর্য আনন্দ, হালকা শরীর-মন নিয়ে খুশি মতো অবাধ চলা ফেরার অধিকার—যার স্বাদ কোন বন্ধন থাকলে পাওয়া যায় না—

আমার তো কোন বন্ধন নেই, তাহলে আমি তোমার মতো আনন্দে থাকতে পারি না কেন? আমি কেন হালকা হতে পারি না?

জয়া বলে. কে বলে তোমার বন্ধন নেই? এখনও তোমার

প্রেমাংশু আছে, মা আছে, দাদা আছে, বাবা—সেদিন অবধি ছিলেন। তোমার তো ভরা সংসার দীপু। কিন্তু আমার কেউ নেই—কিছু নেই।

হাসিমুখেই জয়া কথা শেষ করে। না, ওর স্বরে কোন বেদনা নেই। কিন্তু হয় তো এখনও আমার মন কোমল বলেই, আমার মনে হয়, জয়া ওর জীবনের একটা মস্ত ফাঁক কৃত্রিম হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু আমার সন্দেহ, আমার ভাবনা আমি ওকে জানাতে চাই না—জানিয়ে লাভ নেই। তুজনের মন হয় তো এক রকম নয়। আমার সঙ্গে ওর অমিল অনেক। জয়ার সঙ্গে তর্ক করে আমি ওর হাসি-হাসি মুখ ম্লান করে তুলতে চাই না। ও এগিয়ে যাক সামনে। ও সব বন্ধন ছিন্ন করুক। ও একা-একা মনে মনে গড়ে তুলুক ওর নিজের জগৎ। আমি কেন ওর পৃথিবী থেকে ওকে টেনে আনব।

আর, তুদিন আগে কে ভাবতে পেরেছিল এত সহজে সব জয় করে নেবে জয়া? এমন করে, এত আঘাত পেয়েও, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে? ওকে দেখি। ওকে দেখতে আমার ভাল লাগে।

কই, কেনা-কাটা করবে না? কফির কাপ সরিয়ে দিয়ে আমি বলি, তোমাকে তো আবার অফিসে ফিরতে হবে?

হাতের ছোট ঘড়িটা দেখে জয়া বলে, এখনও আর একটু সময় আছে—কিন্তু তুমি কোথায় যাবে এখান থেকে?

সোজা বাড়ি, আমি জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, আমার যাবার কোন জায়গা নেই—

জয়াও হালকা স্বরে বলে, একটা জায়গা কোথাও করে নিলেই তো হয়। পৃথিবীতে জায়গার কি অভাব আছে?

দেখি কী হয়, এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি হঠাৎ বলে উঠি, আর একদিন ঝণ্টুকে নিয়ে যাব তোমার ওখানে—

জয়া সহজ স্বরে বলে, তোমার খুশি। তবে ঝণ্টুকে শুধু শুধু

টানাটানি কর না। ও বেশ আছে, একটু থেমে অন্যদিকে তাকিয়ে জয়া বলে, আমিও বেশ আছি।

মনে মনে বলি, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। জয়া ভাল আছে বই কি—বেশ ভাল আছে। কিন্তু বারবার সেকথা আমাকে ও শোনাচ্ছে কেন। কী জানি!

বাইরে বেরিয়ে আসি আমরা দুজন। জয়া চলে যায় নিউ মার্কেটের দিকে আর আমি লিণ্ডসে স্ট্রিট ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চৌরঙ্গীতে পড়ি। এখন আকাশে মেঘ নেই। কড়া রোদ। ঠাণ্ডা ঘরে বসে কফি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আরও বেশি গরম লাগছে। একা-একা রাস্তায় চলতে-চলতে শুধু একটা কথাই আমার মনে হয়, জয়া সুখে আছে। ও যেন জোর করে আমাকে বোঝাতে চায় ওর কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু জয়ার দুঃখ টেনে বের করবার জন্যে, আমি বুঝতে পারি না, আমিই বা কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠি। দুঃখ কার নেই? আমি না হয় সুখে ছিলাম সংসারে কিন্তু সে-সুখ কতদিনের! সংসারে পূর্ণতার স্বাদ পায় নি জয়া—হয়তো কখনও পায় নি কিন্তু সে-স্বাদ কজন পায়? পায় না বলেই তো মানুষ অস্থির হয়, অন্বেষণের একটা তীব্র নেশায় জীবনকে রহস্যময় করে তোলে।

আজ বাড়ির সামনে এসে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ। হঠাৎ ঢুকতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, কী করব ভেতরে প্রবেশ করে? কে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে? এ সংসারে, এত বড় বাড়িতে আমাকে কার প্রয়োজন? হয় তো এতক্ষণে ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছে ঝণ্টু। আমাকে খুঁজেছে। কিন্তু আমি না থাকলেও কোন অসুবিধা ওর হবে না। পুরনো ঠাকুর ওর সামনে খাবার ধরে দিয়েছে। ওর দেখা শোনা করবার লোক আছে এ বাড়িতে।

সংসারের কাজ নয়, বাইরের কোন কাজ চাই আমার। আমার মনের দাবীর জন্যে আমি পাগল হয়ে যাব। দাদা

ঝণ্টু শৈলেন প্রেমাংশু আর প্রেমাংশুর প্রাণ-বিলোনো রজত—এই সব মানুষকে, এইসব কোমলতা স্বপ্ন কল্পনা আমার মন থেকে দূর করে দিক সকাল থেকে রাত অবধি বাইরের কঠিন কাজের প্রবল চাপ, আমি জয়ার খুশি দেখব না, দাদার দৈন্য নিয়ে মাথা ঘামাব না, শৈলেনের হিসাবী মনের ধার ধারব না, রজতের কথায় আর নিশ্বাসে প্রেমাংশুকে ধরবার চেষ্টা করব না—আমি জীবনকে খুঁজব কাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আমার জন্যে কোন কাজই কি নেই কোথাও!

সেই রাতে, এত দেরি করে আজকাল দাদা আর বাড়ি ফেরে না, অফিস থেকে সোজা চলে আসে—দাদার আর এক চেহারা আমি অনেকদিন পর আবার দেখি। দাদার জন্যে অপেক্ষা করে-করে ঘুম পেয়ে যায়। আজ বাইরেব কোন লোকও আসে নি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাও ভয়ঙ্কর নির্জন হয়ে যায়। ঝণ্টু অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ভয় লাগবে বলে আমি বসে থাকি দাদার ঘরে। বাড়িটা একেবারে চুপচাপ। কী হল দাদার? আমার মন চঞ্চল হয়। ভয় লাগে। রাত আরও গভীর হলেও যদি দাদা না ফিরে আসে তাহলে কী করব আমি? কাকে খবর দেব? আমি ভয় পাই—ভীষণ ভয়। সামান্য আওয়াজেও যেন চমকে উঠি।

আরও অনেক পরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় এই বাড়ির সামনে। আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি। এতক্ষণ পর দাদা ফিরেছে। অনেকক্ষণ কেউ দরজা খোলে না। কেউ হয় তো জেগে নেই। শব্দ করে ট্যাক্সিটা চলে যায়। একটানা কলিং বেল বাজে। তখন ভয়ে ভয়ে আমি নিচে নেমে দরজা খুলে দি। আর দাদার চেহারা দেখে পিছনে সরে যাই—বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মনে পড়ে যায় আর এক রাতের কথা—যেদিন এ বাড়িতে মা ছিলেন, বাবা ছিলেন, জয়াও ছিল—যেদিন এমন মাতাল হয়ে এত রাতে দাদা ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরেছিল।

আমাকে দেখে দাদা হেসে বলে, আজ একটু দেরি হয়ে গেল দীপু—অনেক দেরি। আজকাল আমি তো খুবই তাড়াতাড়ি ফিরে আসি—

খাবে না ?

না। খেয়েই তো এলাম। আরে, আমাকে দেখে তুই অত গম্ভীর হয়ে গেলি কেন ? দীপু, না না, আমাকে বাধা দিস না, আমার একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে দাদা বলে, আমার আজকাল কী মনে হয় জানিস ?

দাদা থেমে যায়। আমার উত্তরের অপেক্ষা করে দেখে আমি জিজ্ঞেস করি, কী ?

আমিই বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমি মাথা উঁচু করে যেখানে খুশি যেতে পারি। কেউ বাধা দেবে না কেউ মুখ ভার করবে না। আমার চেয়ে সুখী মানুষ কে বল এ পৃথিবীতে—

কেউ না দাদা, আমি ওপরে উঠতে-উঠতে বলি, এবার শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে।

হোক। তোর খুব ঘুম পেয়েছে ?

না। কেন ?

তাহলে তোর সঙ্গে একটু গল্প করি আয়। সেই ছেলেবেলার কথা তোর মনে আছে দীপু—যখন এ বাড়িতে আর কেউ ছিল না, শুধু মা বাবা তুই আর আমি ?

দাদার অল্প-অল্প নেশা হয়েছে—অসংলগ্ন কথা বলছে। আমি দাদাকে ভয় পাই না—একটুও না। কিন্তু ওকে আমার মায়া হয়। জয়াকে দেখে, তার কথা শুনে আমার তাকে মায়া হয় নি। দাদাকে দেখতে-দেখতে আস্তে সাবধানে আমি একটা নিশ্বাস ফেলি।

কিন্তু তারপরই হেসে বলি, আমার সব মনে আছে দাদা।

থাকবেই। সেসব কথা ভোলা যায় না—দাদা নিজের ঘরে যায়। আমাকেও ডাকে। আর আমার মনে হয়, দাদাকে দেখতে-দেখতে তার কথা শুনতে-শুনতেই মনে হয়, একটা ভাঙা চোরা

স্থিরের জন্যে এখন, এই মুহূর্তে আমার যেন কিছুই করবার নেই। আমি চুপ করে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকি।

দাদার খেয়াল থাকে না যে এখন রাত অনেক, ও বুঝতে পারে না নিঃঝুম পাড়ায়, ফাঁকা বাড়িতে আস্তে কথা বললেও ঘর গমগম করে ওঠে, আশেপাশের বাড়ির লোক প্রত্যেকটি কথা শুনতে পায়। দাদা জোরে জোরে কথা বলে।

মনে থাকে দীপু, সব মনে থাকে। কিন্তু আসল কথাটা কী জানিস—আমি আবার তেমন হয়ে উঠেছি। সেই—আগে যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনি। সত্যি বলছি দীপু, ঠিক কথা। আমি বেঁচে গেছি—আমার দিকে না তাকিয়ে কথায়-কথায় দাদা হঠাৎ বলে ওঠে তুই-ও বেঁচে গেছিস। বাঁচ—আরও ভাল করে বাঁচ।

দাদা যে নেশার ঘোরে কথা বলে হঠাৎ আমি যেন সে কথা ভুলে যাই। আমি তার কথার মৃদু প্রতিবাদ করে বলি, না দাদা, আমি বেঁচে নেই—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে দাদা চিৎকার করে ওঠে, কেন কেন কেন? তুই বোকা তাই ঘরের কোণায় এমন মরে আছিস। আমাকে দেখে বুঝতে পারিস না? জয়াকে দেখে শিখতে পারিস না কেমন করে বাঁচতে হয়?

আমি হেসে হালকা স্বরে বলি, চেষ্টা তো করেছিলাম—পারলাম কই—

ওসব কথা আমার সামনে বলবি না। আমি বলছি, দাদা এসে আমার সামনে দাঁড়ায়, শোন দীপু, ভাবিস না আমার নেশা হয়েছে—না না, আমি মাতাল হই নি—একটুও না, আরও জোরে দাদা কথা বলে, আমি বলছি, তুই বেঁচে গেছিস, একটুও ইতস্তত না করে দাদা ফস করে বলে ফেলে, প্রেমাংশু বেঁচে থাকলে তুই মরে যেতিস দীপু—

আমি জোরে বলে উঠি, না না, দাদা!

থাম। আমার সঙ্গে তর্ক করিস না। আমি বলছি, প্রেমাংশু থাকলে তুই শেষ হয়ে যেতিস—

আর একবার আমার মনে হয়, দাদা মাতাল, ওর নেশা হয়েছে। কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যাই। এ ঘরে আর থাকতে ইচ্ছে করে না আমার। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে যাই।

দীপু, দাদা তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে বলে, কী ? তোর মন খারাপ হয়ে গেল ? হ্যাঁ, আমি তোকে ঠিক কথাই বলেছি। আর কিছুদিন প্রেমাংশু বেঁচে থাকলে তুই—তোরা দুজন শেষ হয়ে যেতিস। সংসারে থাকলে কেউ বেশি দিন সুখী হয় না। একা থাকতে পারা, দীপু—সে যে কী সুখের—

দাদা খাটের ওপর বসে পড়ে। মুখ বাড়িয়ে একবার আমার ঘরের দিকে তাকায়। তারপর গলার স্বর অনেক নামিয়ে বলে, দীপু তুই সুখী, আমার চেয়ে অনেক বেশি সুখী—তোর একটাও ছেলে-মেয়ে নেই।

দাদার কথা শুনতে শুনতে নিজের ভাবনা আমি ভাবি না এখন। শুধু মনে হয়, একজনকে দেখলাম দুপুরে, রাস্তায় আর একজনকে দেখছি অনেক রাতে, ঘরে। এদের দুজনেরই সংসার নেই—বন্ধন নেই। ঝণ্টুর ওপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ হয় তো শুধু আছে। বন্ধন ছিন্ন করে দুজনেই আমাকে বার বার একটা কথাই বোঝাচ্ছে যে এরা এখন খুব সুখী। একজন আর একজনের কোন কাজে বাধা দেয় না। এরা সব বন্ধন মুক্ত। এরা স্বাধান।

কিন্তু একটা কথা, যা আমি জয়াকে বলতে পারি নি, যা আমি দাদাকেও বলতে পারি না এরা যে এত সুখী, আশ্চর্য, সে কথাটা শোনাবার একটাও মানুষ নেই ওদের। তাই জয়া অনেকক্ষণ কথা বলে-বলে আমাকে সেকথা শোনায়—তাই দাদা মাঝরাতে সেকথা আমাকে জোর করে বোঝায়।

যদি দাদা আর একটা বিয়ে করতে পারত, যদি শিশিরবাবুর সঙ্গে সত্যি জয়ার একটা চিরকালের সম্পর্ক গড়ে উঠত তাহলে হয় তো ওরা কিছু না বললেও, আমি দূর থেকেই মনে মনে ওদের সুখ-দুঃখের হিসেব করতে পারতাম। কিন্তু এখন রাতের নির্জনতায় দাদার ঘরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার নিজেকেই আবার ভয়ঙ্কর একা মনে হয়—এদের কারুর কথা শুনতে ইচ্ছে করে না—ভাবতে ইচ্ছে করে না। যদিও আমার ঘুম পায় না তবুও ঘুমের ভান করেই আমি দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।

আজ আমার ঘরে ঢুকে বড় ভাল লাগে। কোন দরকার না থাকলেও আমি আলো জ্বালি। একবার ঝণ্টুর দিকে তাকাই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন সব সয়ে গেছে ওর। ও জয়ার জন্যে কাঁদে না, দাদা আগে ফিরল কি রাত করে এল তা নিয়ে ভাবনা করে না। এই বয়সেই ও গড়ে নিতে পেরেছে নিজের একটা স্বাধীন জগৎ। ছেলেবেলা থেকেই হয়তো ও বুঝতে পেরেছে বন্ধনে সুখ নেই।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমার মনে হয়, যেকথা দাদা আমাকে বলল একটু আগে, একটা নির্মম সত্য, প্রেমাংশু নেই বলে আমি বেঁচে আছি, সেকথা ঠিক—খুব ঠিক। আমার যে মন আজ ছুটে-ছুটে যাচ্ছে এখানে-ওখানে, আশ্রয় খুঁজছে, বাঁচতে চাইছে, সেই মুক্ত স্বাধীন গতিবেগ প্রেমাংশুকে এড়িয়ে যায়—ছাড়িয়ে যায়। আর প্রেমাংশু যদি থাকত তাহলে আমি আমার মধ্যে একটা চঞ্চল মন খুঁজে পেতাম না। এমন করে নিজেকে চিনতে পারতাম না। যে স্বাধীনতার স্বাদ আমি আজ পেয়েছি, প্রেমাংশুর সংসারে তা আমার ছিল না। এখন একটা সংসারের বদলে গোটা পৃথিবীটাই যেন আমার হয়েছে। কিন্তু আমি শুধু সেখানে দিশাহারা হয়ে ঘুরে ফিরছি—খুশি মতো বিচরণ করতে পারছি কই।

এখন যদি হঠাৎ প্রেমাংশু বেঁচে ওঠে আর আমি আবার ফিরে

পাই আমার হারানো সংসার তাহলে আমি জানি না, নিজের মধ্যে একটা চঞ্চল মন আবিষ্কার করবার পর, সেই সংসারে আমি আগের মতো দিন কাটাতে পারব কি-না। ঝড়ের অন্ধকারে এক আকস্মিক ভয়ঙ্কর ধাক্কায় যেখানে আমি এসে পৌঁছেছি সেখান থেকে আর যে কর্মহীন শান্তির নীড়ে ফেরা যায় না এখন এতদিন পর তা যেন আমি অল্প-অল্প বুঝতে পারি। একটা প্রশ্ন, ঝণ্টু ঘুমোচ্ছে বলে, কাছাকাছি কেউ নেই বলে আর প্রেমাংশুর ছবিটাও দেখা যায় না বলে, আমার মনে হয়, আমিও যেন আর ফিরতে চাই না আমার সেই পুরনো সংসারে।

আমার মাথা কটকট করে। চোখ জ্বলে। কী এক যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ ঘুমতে পারি না। যে-ভাবনা, প্রেমাংশু আর শান্তির সংসার থেকে দূরে সরে আসার যন্ত্রণা, একা-একা স্বাধীন জগতে বিচরণের আনন্দ আমাকে পোড়ায়—নতুন করে পোড়ায়।

দাদা আর অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে না। অনেক রাতে বাড়ির সামনে একটু বেশি শব্দ করে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। দাদার মুখে মদের গন্ধ থাকে। কিন্তু কী তাজা দেখায় ওর চেহারা! গান গাইতে গাইতে দাদা ওপরে ওঠে। এক-একদিন খায় না। আমি দাদার অপেক্ষায় রোজই জেগে থাকি।

বিকেলবেলা মাঝে মাঝে যখন ঝণ্টু আব্দার ধরে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে তখন ইচ্ছে হলেও ঘর ছেড়ে বার হতে আমার মন সরে না। বারবার একই কথা মনে হয়, যদি রজত এসে ফিরে যায়। আমি রোজ সন্ধ্যায় রজতের অপেক্ষা করি। প্রেমাংশু না এলেও, তার মত কেউ আসুক আমার সামনে—তার মত কথা শোনাক। আমি কথা শুনতে চাই, কথা শোনাতে চাই। দাদা কিম্বা জয়ার মতো নিঃসঙ্গ স্বাধীনতায় আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যায়। গোটা

পৃথিবী আমি আর চাই না—চাইতে পারি না। এই দুঃসহ জীবনের কোন অর্থই যেন আমার কাছে নেই। সেই পুরনো কথাই আবার আমার মনে হয়, আমি বাঁচব কেমন করে।

আজ আকাশ পরিষ্কার। সারাদিনে একবারও বৃষ্টি হয় নি। কিন্তু আজ ঘরে বসে থাকতে আমার একেবারেই ইচ্ছে করে না। শরীর-মন হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গেছে। একবার ভাবি জয়ার বাড়ি চলে যাই, আর একবার ঝণ্টুর সঙ্গে চৌরঙ্গীর দিকে চলে যেতে ইচ্ছে করে কিম্বা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ সময়ের জন্যে বসে থাকার কথা মনে হয়। এই নির্জন বাড়ি, ফাঁকা ঘর আজ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না হঠাৎ কখন এক সময় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার বুক ঠেলে, না আমার কেউ নেই—আমার যাবার কোন জায়গা নেই—কিন্তু কী আশ্চর্য, গোটা পৃথিবীটাই নাকি আমার।

ঝণ্টু আপন মনে ওপরের ঘরে বসে লেখাপড়া করছে। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে বিকেলে আমি আর কোনদিনও কোথাও যাব না ঘর ছেড়ে—ওকে শুধু মিথ্যা আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখব। কিন্তু আজ, যদিও ঝণ্টু আমার কথায় আস্থা রাখে নি, ভেবেছিলাম, ঘরের বাইরে যাব। আর তাই তৈরি হয়েই আমি নিচের ঘরে এসে বসে আছি।

কিন্তু তখন থেকে, যখন বিকেলের শেষ আলো রাস্তার ওপারে একটা প্রাচীন আমের ডালে স্থির হয়েছিল, আমি এ ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা ভাবছি। উঠতে পারছি না। যেতে পারছি না। ঝণ্টুকে ডাকতে গেলেও যেন স্বর বার হতে চায় না। আমি দেখি হঠাৎ এক সময় দূরের আমের ডাল থেকে শেষ বিকেলের আলোর হালকা রেখা হঠাৎ কখন মিলিয়ে গেছে। সবুজ-সবুজ অদ্ভুত ফ্যাকাশে আলো আমার চোখে আজ যেন অচেনা লাগে। এমন আলো আমি কখনও দেখি নি। কিন্তু দেখতে-দেখতে তা-ও শেষ হয়ে

যায়, মুছে যায় আমার চোখের সামনে থেকে। বাইরে এখনও অন্ধকার হয় নি, রাস্তায়ও আলো জ্বলে নি তবুও আমি এ ঘরের আলো জ্বেলে দি। অন্ধকারে একা-একা বসে থাকতে আমার যেন ভয় লাগে। একটু আগে দেখা নতুন ফ্যাকাশে আলোর কথা মনে করে আমি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলি। আর ঠিক তখন তীক্ষ্ণ কলিংবেল বেজে ওঠে।

কেউ আসবার আগে আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসি। আর দরজা খুলে দেখি সেই মানুষ—রজত। ওকে দেখে, সেই ফ্যাকাশে আলো, প্রেমাংশু—বিদ্যুৎ-শিহর খেলে যায় মনের মধ্যে। আশা করেছিলাম—না ওর কথা ভাবি নি—দরজা খুলে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কয়েক মুহূর্ত। আমি কোন কথা বলতে পারি না।

আমাকে দেখেও অবাক হয়ে যায় রজত। প্রথম প্রথম কথা বলতে পারে না। কেন চুপ করে থাকে কে জানে। হয় তো আমার চেহারা দেখে, প্রসাধন দেখে ও মনে করে আমি বাইরে বার হচ্ছিলাম তাই ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

রজত বলে, হাসিমুখেই বলে, হঠাৎ এসে পড়লাম। কিন্তু আজ আর ভেতরে ঢুকব না—

সে কী? হঠাৎ আমি যেন একটা নাড়া খেয়ে কথা বলে উঠি, আসুন, ভেতরে আসুন, সহজ হালকা স্বরে আমি এবার বলি, জানেন, আমি আজকাল প্রায় রোজই আপনার অপেক্ষায় বসে থাকি—

আমার কথা শুনে অবাক হয় না রজত। চমকে ওঠে না। লৌকিকতার বেড়া ভেঙে এক অতি পরিচিত মানুষের মতো বলে, আমিও ভাবি রোজই আসব কিন্তু—আজ আপনি কোথাও বেরুচ্ছিলেন?

কোথাও না, অল্প হেসে বলি, আমি আজকাল খুব ভাল আছি—কী বলেন?

নিশ্চয়ই। ভাল আপনাকে থাকতেই হবে—একটু থেমে অন্য

দিকে তাকিয়ে রজত বলে, আমাদের সকলকেই, পরিবেশ প্রতিকূল হলেও ভাল থাকতেই হবে।

আমি খুব আস্তে প্রশ্ন করি, কেমন করে ?

যেমন করে হোক, একটু বেশি জোরে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় রজত। আমি ওর গলার স্বর শুনে চমকে উঠি।

কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকায় না রজত, আমার ভাবান্তরও লক্ষ্য করে না, দেয়ালে টাঙানো প্রেমাংশুর ছবির দিকে চোখ রেখে বলে, যেমন করে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—

ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি।

আপনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি আপনার স্বামীকে, কারণ আমার মনে হয়, প্রথম থেকেই আপনি শোককেই বুক দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন—

না।

তাহলে ?

আমি অনেকবার তার মৃত্যু আমার মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম—

পারেন নি ?

আমি মুখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে বলি, না। রজত থেমে থেমে বলে, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। আপনি প্রেমাংশুকে ভুলেছেন—নিশ্চয়ই ভুলেছেন—

না, আমি তাকে ভুলি নি !

অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে রজত বলে, হ্যাঁ ভুলেছেন। স্মৃতি নয়। ছায়া নয়। স্মৃতি আর ছায়ার অন্য নাম মৃত্যু। আপনি বাঁচতে পারেন নি এতদিন—আপনি ভুলেছেন প্রেমাংশুকে—একটা আসল মানুষকে !

কী বলতে চায় রজত ? আমি ওর কথার প্রতিবাদ করতে পারি না। কিন্তু এক ভার বেদনায় যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

শৈলেনের উপদেশে বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দিতে পারি কিন্তু রজতের এমন আক্রমণ সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার চোখ দুটো অল্পে অল্পে হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। রজত দেখে না—দেখতে পায় না।

ও তেমন স্বরেই বলে যায়, দীপা, আপনি মনে রেখেছেন শুধু তার মৃত্যু। আপনি তার স্মৃতি আর ছায়া নিয়ে কেঁদেছেন, শুধু কেঁদেছেন! প্রেমাংশুকে ভুলেছেন—

না।

হ্যাঁ, আমি জানি আপনি তাকে ভুলেছেন।

আমার কথা রজত বিশ্বাস করতে চায় না কেন! ও কি আজ সন্ধ্যায় আমার প্রসাধন দেখে মনে করছে আমি সত্যিই ভুলেছি প্রেমাংশুকে। তাকে যদি ভুলব তাহলে তারই বনভূমির মানুষের জন্যে প্রতীক্ষা করব কেন! রজত আমার মনের খবর কত-টুকু জানে!

রজত বলে, হয় তো আজ আমাকে সব কথা শোনাবার জন্যেই এসেছে, রজতের চোখ কিন্তু এখনও প্রেমাংশুর ছবির দিকে, দীপা, আপনি প্রেমাংশুর জীবন ভুলেছেন—

আমি চুপ করে থাকতে পারি না, ভিজে ঠাণ্ডা স্বরে, রজতের কাছে সব কথা স্বীকার করবার জন্যে বলি, ভুলেছি, আমি সব ভুলেছি—

কিন্তু এখন রজতের গলার স্বর আমার খুব চেনা মনে হয়, তিরস্কার নয়, সমবেদনার আবেগে ও যেন বলে, দীপা, আপনি তার প্রেমও ভুলেছেন! প্রেমাংশু কি কোনদিন চেয়েছিল আপনি তাকে এমন করে ভুলে যান? সে কি কোনদিন চেয়েছিল এমন করে তার মৃত্যু নিয়ে আপনি শুধু কাঁদেন?

রজত থামে। কিন্তু আমি জানি ও আমার উত্তরের অপেক্ষা করে না। ও শুধু আমাকে আক্রমণ করতে এসেছে। করুক।

আমি একটা কথাও বলব না। রজত জানে না, আমারও ওকে বলতে ইচ্ছে করে, বয়স যেমন আস্তে আস্তে শরীরকে, বাসনাকে ঢেকে দেয়, বিচ্ছেদ তেমনি অল্পে অল্পে মনকেও নেভায়। স্মৃতির ঘ্রাণে জীবনকে ভরে তোলা যায় না। আমি ভরে তুলতে পারি নি! প্রেম হিম নয়, তুষার নয়।

যেকথা অনেকদিন পর আমাকে শোনায় রজত, প্রেমাংশুর শেষ কথা, দীপা, আমি আবার আসব—তা শুনে প্রথম প্রথম মনে হয়, আসবে—সত্যি প্রেমাংশু আসবে আবার। কিন্তু আজ কী কথা শোনায় আমাকে রজত? উত্তাপ নেই। কোথাও উত্তাপ নেই। এ জীবনে প্রেমাংশু নেই। প্রেম নেই। এ জীবন তুষার—শুধু তুষার।

প্রেমাংশুর শেষ কথা মিথ্যা। ও কিছু না। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাবে বলেই একটা আশ্বাস দূর থেকে, অনেক দূর থেকে যেন পাঠিয়েছে প্রেমাংশু। কিন্তু আজ ওর আশ্বাসে উত্তাপ নেই। প্রেমাংশু একটা ছায়া—একটা অশরীরী। এই ছায়া নিয়েই আমার দিন কেটেছে। অনেক দিন। অনেক রাত। প্রেমাংশু আর আসবে না। কোনদিনও না।

দীপা, রজত আমাকে দেখে চুপ করে যায়। একটু পরেই ব্যস্ত হয়ে বলে, এ কী, আপনি কাঁদছেন! না না এসব কথায় আর কাজ নেই। আমি আপনাকে কাঁদাতে আসি নি—

আমি কাঁদছি না, আপনার যা খুশি বলুন। আমি সব শুনব।

একদিন আপনাকে কাঁদতে দেখেছিলাম, রজত উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সেদিন জানতাম আমার কথা শুনলে, আমাকে দেখলে আপনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন—

একটু চুপ করে থাকে রজত। একবার আমার দিকে তাকায় তারপর প্রেমাংশুর ছবির দিকেই চোখ রেখে বলে খুব স্পষ্ট করে এক নির্ভীক পুরুষের মতো, দীপা, আপনাকে দেখার আগে, আপনার

শূন্যতা অনুভব করবার সময়-সময় যে মুখ, যে-শরীর, চোখ কা
চুল—যেমন ছবি ফুটে উঠেছিল আমার মনে,—একটুও ইতস্তত ন
করে রজত বলে, আপনি ঠিক তেমন। আপনাকে কাঁদাতে হয়েছিল
বলে আমিও, আপনি জানেন না, মরে যাচ্ছিলাম। আমি আবার
আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম। বারবার দেখতে চেয়েছিলাম।

আমার অল্প কাছে সরে আসে রজত। প্রেমাংশুর ছবির দিকে আর তাকায় না। আমাকে দেখতে দেখতে সহজ স্বরে জোরে-জোরে বলে, একজনের, আপনার সব চেয়ে কাছের মানুষের মৃত্যু-সংবাদ আমাকে শোনাতে হয়েছিল বলে আমি আপনাকে উজ্জীবনের কথাও বলতে চেয়েছিলাম—

জলে চোখ ঝাপসা হয়ে গেলেও উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করি, কী কথা?

দীপা, আমি আবার আসব।

না, আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, প্রেমাংশু আর আসবে না—কোনদিনও না—

হাসে রজত। যেন খুব সাবধানে আবার চেয়ারে বসে পড়ে। ও যেন আমার কথা শুনতে পায় না, কিন্তু তারপর, আমি জানতাম, কোনদিন না কোনদিন প্রেমাংশুর শেষ কথা শুনলে আপনি বাঁচবেন, বাঁচার প্রতীক্ষা করবেন।

না, আর কারুর প্রতীক্ষা আমি করি না—আমার জীবন একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে। আমি আর বাঁচতে চাইনা—বাঁচতে পারব না। আমি মরতে চাই—

আমার সামনে অমন করে কাঁদবেন না, রজত আমাকে মিনতি করে না, আদেশ করে, আমি একদিন আপনাকে কাঁদিয়েছিলাম। বার বার কাঁদাতে আসি না। আমি আপনার স্বামীর শেষ কথা আপনাকে শুনিয়ে গেছি। প্রেম—প্রেমাংশু কখনও মরে না—

রজতের কথা শুনতে শুনতে সব—এক-একটি হারানো মুহূর্ত,

প্রেমাংশুর হাসি, ওর চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর, ওর মনের আবেগ এ-ঘরের আলোর রেখায়-রেখায় কাঁপে। কিন্তু আমার কান্না থামে না। প্রেমাংশুর ছবির দিকে তাকিয়ে আমি যেন আপন মনে কথা বলে যাই—

আজ এত পরে, অনেক বাঁচা মরার ধাপ পেরিয়ে এই মানুষকে দেখতে দেখতে আমি তোমাকে দেখি—তোমাকে পাই। তুমি ছিলেনা অনেক দিন। আমার বুকের মধ্যে না। মনের মধ্যে না। কোথাও না। আর তুমি ছিলে না বলেই আমার থাকাটা মাঝে মাঝে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। যেন আমিও ছিলাম না। আলোয় না। অন্ধকারে না। কোন কিছুতেই না। তখনও আমাকে ঘিরে জীবন ছিল। রঙ আকাশ কামনা বাসনা—সব।

কী ভয়ঙ্কর এই থাকা। না বেঁচে থাকা, না মরে থাকা। যন্ত্রণার অন্ধকারে অল্প অল্প করে ডুবে থাকা। ডুবে থাকা কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া নয়। ডুবতে-ডুবতে বাঁচবার জন্যে তোমাকে—তোমার স্মৃতি আর স্বপ্ন সম্বল করে পুড়ে-পুড়ে শুধু টিকে থাকা।

কল্পনায় যেমন মরা যায় না, তেমনি বাঁচাও যায় না। আমি বাঁচতে পারি নি। তুমি ছিলে না। আমিও ছিলাম না। কিন্তু আশ্চর্য, রজতের একটি কথায় ওর নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে সমবেদনায় আমার এখন মনে হয় আজ এখন এই ঘরে তুমি আছ, আমিও আছি। এখন যে মানুষ আমার চোখের সামনে বসে আছে এই ঘরে, তোমার মুখের সঙ্গে ওর মুখের অনেক অমিল। কিন্তু তোমার কথা ভাবতে ভাবতে, তোমার ছবি দেখতে-দেখতে আমার মনে হয়, শুধুই মনে হয়, সব মুখ এক। সব প্রেম এক। একথা আজ কান্নায়-কান্নায় হঠাৎ আমার কেন মনে হয়।

এক-একদিন তোমার চলে যাওয়ার পর প্রথম-প্রথম আমার বাঁচতে ইচ্ছে করত না, থাকতে ইচ্ছে করত না সেই সব মানুষের ভিড়ে যারা আমার কেউ নয়। তোমার মৃত্যু, এক দুর্ঘটনায় বর্ষার

ভিজে দুপুরে হঠাৎ নিঃশব্দে তোমার চলে যাওয়া আমাকেও দিয়ে গেল আর এক মৃত্যু। আর এই নির্মম মৃত্যুর মধ্যে ডুবতে-ডুবতে পুড়তে-পুড়তে আমি বেঁচেছিলাম। সে সব কথা জানে না রজত।

অমি বেঁচেছিলাম মৃত্যুর মতো—এক ভয়ঙ্কর জীবন্ত মৃত্যুর মতো। আমি হাসতাম কাঁদতাম চলতাম ফিরতাম মৃত্যুর মতোই। প্রাণ নেই। কোথাও প্রাণ নেই। আর যেখানে প্রাণ নেই সেখানে প্রেমও নেই। তুমি ছিলে আমার মৃত্যুর মতো জীবনে—না থেকেও ছিলে। তোমার স্বপ্ন ছিল। তোমার স্মৃতি ছিল। সুখ ছিল না—ছিল না।

কিন্তু একটা সবুজ শ্যামল বনভূমি আছে—আছেই। সেখানে তুমি আছ। কোথাও না কোথাও তুমি আছই। প্রেম আছে বলেই আমার মনে হয় তুমিও আছ—প্রাণ আর রঙ আছে। আর জীবন তো আছেই।

কিন্তু তোমার স্মৃতির মধ্যে কান্না আছে, মৃত্যু আছে, উত্তাপ নেই। উত্তাপ তোমার দেহে—তোমার রক্তে। তোমার স্মৃতিতে প্রেম নেই। আমার মৃত্যুর মতো জীবনে উত্তাপ নেই। প্রেম নেই।

আমি তোমাকে ডেকেছি অনেক দিন। আমি আশ্রয় খুঁজেছি তোমারই মৃত্যুর ছায়ায়। আমি নিজেকে, নিজের প্রাণকে জোর করে মেরেছি। আমি ইচ্ছে করেই ডুবে গেছি যন্ত্রণার অন্ধকারে। ভেবেছি জীবন আমার জন্য নয়, উত্তাপ আমার জন্যে নয়। আমি নিজেকে মারব—এক হয়ে যাব তোমার সঙ্গে।

কিন্তু তুমি তো আজকাল আর আস না। তুমি সাড়া দাও না আমার ডাকে। আমারই ক্লান্ত হাত এসে পড়ে আমার বুকের ওপর। কোন উত্তেজনা নেই। কোন স্পর্শ নেই। অন্ধকারে আমি শুধু একাই জেগে থাকি। আর তারপর, অনেক পর তোমার শেষ কথা আমাকে শোনায় রজত, দীপা, আমি আবার আসব!

আমাকে দেখুন, রজতের ভারী স্বর কাঁপে, কেন কাঁদছেন ?

আমি জানি না, আমি বলতে পারব না, আমার স্বর ভেঙে যায়, কেটে কেটে যায়, আমাকে আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না—

আর একবার দেখুন আপনার স্বামীর ছবির দিকে—দেখুন! আবার একবার ভাবুন তার শেষ কথা। যাবার সময় কী কথা আপনাকে বলে গেছে প্রেমাংশু ?

সেকথার কোন মানে নেই—সেকথা মিথ্যা। সব মিথ্যা।

কী মিথ্যা ? প্রেম ? প্রেমাংশু ?

হ্যাঁ, সব মিথ্যা। আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই না—

করুণ হাসি খেলে রজতের ঠোঁটের ফাঁকে, দীপা, হঠাৎ মরা যায়। কিন্তু হঠাৎ বাঁচা যায় না। অল্পে অল্পে আলোয় হাওয়ায় যেমন করে রজনীগন্ধা ফোটে, তেমন করেই হয় তো আবার নতুন করে ফুটে উঠতে হয়—বেঁচে উঠতে হয়।

আমি রজতকে আমার এতদিনের যন্ত্রণার কথাটা স্পষ্ট করে বলার প্রাণপণ আগ্রহ অনেক চেষ্টায় সংযত করে আস্তে শুধু বলি, একা-একা বাঁচা যায় না। আমি বাঁচতে পারি নি—বাঁচতে পারব না।

প্রেমাংশু কী চেয়েছিল আপনার কাছে ?

কী ?

সে কি আপনাকে চায় ? আপনার মৃত্যু চায় ?

প্রেমাংশু যেখানেই থাকুক, একটা আবেগ যেন আমার বুক ঠেলে আসে, সে আমাকেই চাইবে চিরদিন—

না, চাইবে না।

আমার সব উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তে নিভে যায়। শুকনো চোখে রজতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। এত উদ্ধত স্পষ্ট স্বরে প্রেমাংশুর বিরুদ্ধে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস করে না।

রজত বলে, যদি কোনদিনও প্রেমাংশু আপনাকে ভালবেসে থাকে

তাহলে সে আপনার মৃত্যু চাইবে না—সে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে এই পৃথিবীতে—

বলতে চাইনি, কিন্তু এতদিন জ্বলে জ্বলে আজ হঠাৎ আমার মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে যায়, কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবে? স্মৃতি দিয়ে?

না, প্রেম দিয়ে। যে-প্রেম সে আপনাকে দিয়ে গেছে তারই আলোয় আপনি বেঁচে থাকবেন আর প্রেমাংশু বেঁচে থাকবে—তার প্রেম বেঁচে থাকবে আপনার রক্তের মধ্যে।

এসব কথা আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু আজ আর একজনের মুখে, খুব কাছাকাছি একই ঘরে বসে প্রেমাংশুর কথা শুনতে, তার প্রেমের কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে। বর্ষার ঝকঝকে সন্ধ্যায় যে মানুষ আমার কাছে প্রেমাংশুকে নতুন করে ফিরিয়ে আনছে সে যেন আমার বড় চেনা—আমার খুব কাছের মানুষ।

কিন্তু আজ আর বেশি কথা বলে না রজত। ঝণ্টুর খবর নেয়। দাদার কথা জিজ্ঞেস করে। শৈলেন কেমন আছে তা-ও জানতে চায়। আমি এবার সোজা হয়ে বসি। ভয়ে-ভয়ে জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকাই। আজ শৈলেন যেন কিছুতেই না আসে। আমি আমাদের দুজনের এতক্ষণ বলা সব কথা যেন ভুলে যাই। মনে মনে শুধু ভাষার সন্ধান করি—কেমন করে একেবারে স্পষ্ট করে রজতকে আজই বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে শৈলেন আমার কেউ নয়।

রজতকে উঠে দাঁড়াতে দেখে হঠাৎ একবুক লজ্জায় আমি বলে উঠি, এ কী, যাবেন না, এক মিনিট—আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি—

রজত এক হাত তুলে হাসি-হাসি মুখে আমাকে থামায়, না—

একটুও দেরি হবে না, আমি এখুনি আসব। একটু বসুন—

আমার কথা শোনে না রজত। এক-পা এক-পা করে দরজার দিকে মুখ নামিয়ে পিছনে তুই হাত রেখে এগিয়ে যায়। নিজেই খট করে খিল খোলে। তারপর চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে। ধীর গম্ভীর স্বরে বলে, দীপা, আমি আবার আসব।

একটা চমকে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রজত আর তাকায় না আমার দিকে। তাড়াতাড়ি হেঁটে রাস্তা পার হয়ে চলে যায়। ও চলে যায় কিন্তু প্রেমাংশুর শেষ কথা অন্য আর এক মাধুর্যে আমার মনে নতুন আশ্বাস নিয়ে আসে। প্রেমাংশুর শেষ কথা সত্য হয়ে স্পষ্ট হয়ে সূর্যমুখীর মতো যেন আমার খুব কাছে বর্ষার ভিজে হাওয়ায় তুলতে থাকে।

আর হঠাৎ আমার এত দিনের ক্লান্তি আর যন্ত্রণা, আমার দ্বন্দ্ব আর অপমান, শরীর-মন-জ্বালানো নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা রজতের আশ্বাসে প্রেমাংশুর শেষ কথায় অনেক ওপর থেকে মাটিতে নেমে আসা উগ্র তুঃসহ আলোর রেখায় টুকরো টুকরো হয়ে মুছে যায়—হারিয়ে যায়।

॥ নয় ॥

বর্ষা চলে গেছে। এখন আর বৃষ্টি নেই। অনেক দিন আকাশে কালো মেঘের ছায়াও আমার চোখে পড়ে নি। রজত এসেছে তার পর আরও অনেক দিন। ও কাছে এসেছে। ও প্রেমাংশুকে ফিরিয়ে এনেছে যেন দূরের সবুজ শ্যামল বনভূমি থেকে। এই সংসার, এই ভাঙাচোরা ম্লান সংসার—আমি দেখতে পাই, সব ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে সহজ হয়েছে—আবার ভরে উঠেছে।

যেকথা দাদা বলেছিল একদিন রাতে নেশার ঘোরে, ওর বন্ধন না থাকার কথা, ওর সুখ আর স্বাধীনতার কথা—আজ সেসব, ওকে দেখতে-দেখতে আমার অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি বলে মনে হয়। কোথাও কোন জটিলতা নেই। সব কিছুই সহজ হালকা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখনও কোথাও-কোথাও কান্নার ছোঁয়া আছে। মাঝে মাঝে রজতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখনও আমার চোখ ভিজে ওঠে।

আর তখন আমি তোমাকে ডাকি। কান্নার ছোঁয়ায় আমার শরীর আবার হঠাৎ যেন ভারী হয়ে যায়। কেন! এই মানুষকে, তোমার বনভূমির রজতকে আমি এখন চিনি। তুমি চিনতে না। আর তোমাকেই ও আবার আমাকে চেনায়। ও মৃত্যুকে করল জীবন। আমাকে বার বার বলল, তুমিই যেন প্রেম আর প্রেমের মৃত্যু নেই। তাই আমার জীবনে—আমাদের জীবনে তোমারও মৃত্যু নেই।

এখন তোমার স্মৃতিতে কিন্তু আর কান্না নেই। এখন আমার দেহ তুমি যেমন আর স্পর্শ করতে পার না, তেমনি আমার মনেও তোমার ছোঁয়া লাগে না। আর যে মানুষ বসে থাকে আমার

চোখের সামনে, সে এখন তোমাকে নিয়ে আসে আমার রক্তে। এই মানুষ তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে তোমার বনভূমি থেকে এখানে—আমার মৃত্যুর মতো জীবনে।

কিন্তু এতদিন আমি রজতকে ভয় করেছিলাম। ওকে মনে হত কঠিন লোহার মতো! রজত যেন মানুষ নয়। কখনও কখনও এই ভয়ঙ্কর মানুষের কথা আমার মনে হত। এক-একবার অন্ধকারে, যখন রাত অনেক, যখন তোমার স্মৃতি, সেই সব দিন আমাকে মারত, কঠিন করে তুলত আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, তখন জ্বলতে-জ্বলতে ডুবতে-ডুবতে আমি দেখতাম রজতকে। যার কোন দোষ না থাকলেও, আমার মনে হত সে-মানুষ হঠাৎ কোথা থেকে এসে তোমাকে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে—নিয়ে গেছে দূর কোন আলো ছায়া কাঁপা বনভূমিতে, যেখানে আমি নেই।

আমি জানতাম একদিন তোমার শেষ কথা শোনাতে রজত আসবেই। বলবে না প্রথমে, যেমন বলতে চায়নি রাস্তায়। প্রথম-প্রথম ও আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইবে না শোকের কথা। একদিন আঘাত দিতে হয়েছিল বলে আর কোন আঘাতই হয়তো ও আমাকে দিতে চাইবে না কোনদিন। কিন্তু আমি আরও জানতাম, রজতের মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, ও বলবেই। আমারই জন্যে ও আমাকে শোনাবে তোমার শেষ কথা। শুনলেও, এখন আমি জানি, তুমি আর আসবে না। আর তুমি আসবেনা বলেই তোমার শেষ কথা শুনিয়ে গেল রজত। তাকে দেখতে-দেখতে আমার এখনও সব সময় মনে হয়, সে-মানুষ তোমাকে না চিনলেও যেন এসেছে তোমার কাছ থেকে, তোমার বনভূমি থেকে, তোমারই কথা শোনাতে, দীপা, আমি আবার আসব।

এক-একটি দিন এখন যেন এক-এক রকম হয়ে ফুটে ওঠে। এতদিন যন্ত্রণা ছিল—ডুবে যাওয়ার, পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা—এখন রজত আসে প্রেমাংশুর বনভূমি থেকে একরাশ বেদনা নিয়ে। আর

এই মানুষ আমার কাছে ভয়ঙ্কর নয়, অদ্ভুত হয়ে ওঠে—এত অদ্ভুত যে আমি বেঁচে উঠি। কিন্তু ও আমাকে কাঁদায়। রজত আমাকে প্রেমাংশুর কথা বলেই কাঁদায়।

এই ঘর, আমি এখন যেখানে বসে আছি, যেখানে রজত বসে থাকে—হঠাৎ সেখানে যেন প্রেমাংশুও এসে দাঁড়ায়। প্রেমাংশুকে আমি দেখতে পাই না কিন্তু ওর ছোঁয়া লাগে আমার গায়। প্রেমাংশু আসে না—ওর উত্তাপ আসে। রজত প্রেমাংশুকে আনতে পারে না—তার প্রেম আনে। বেদনার উত্তাপে আজকাল প্রায়ই রজত আমাকে কাঁদায়। আর এতদিন পর, এই কান্নার মধ্যেই আমি খুঁজে পাই জীবনকে। আমার মৃত্যুর দিন রজতের এক-এক কথায়, প্রেমাংশুর উত্তাপে শেষ হয়—নিভে যায়। জ্বলে ওঠে আর এক নতুন জগৎ—একদিন প্রেমাংশু যেখানে ছিল।

আজকাল রাতে আমার ভাল ঘুম হয় না কিন্তু খুব সকালে এ বাড়ির কেউ জাগবার আগে, বোধহয় পাখি ডাকারও আগে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সকালের মিষ্টি আমেজে লাভ-ক্ষতির কোন হিসেবের কথা মনে আসে না, শুধু একটা সহজ আবেগে প্রত্যেকের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ঝণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। জয়ার কথা আমার মনে পড়ে না। মা-বাবার কথাও নয়। প্রথম ভোর থেকেই এই নির্জন বাড়িতে যেন একটা সুখের আভা জ্বলতে থাকে। আমি ঝণ্টুকে জাগাই না। আস্তে আস্তে মশারী খুলে ফেলি। দরজা জানলার পর্দা টেনে টেনে সরিয়ে দি। ঝণ্টুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে বলে পাখাটাও এখন আর চালাতে ইচ্ছে করে না।

ঘর থেকে বার হবার আগে হঠাৎ প্রেমাংশুর ছবির দিকে আমার চোখ পড়ে যায়। না, এখানে কান্না নেই। আমি অন্য দিকে

তাকিয়ে আপনমনে গুনগুন করে উঠি, তুমি আছ। তুমি থাকবেই। প্রেমাংশুর মৃত্যু নেই।

এক-একটি ভোর এক-এক স্থির আশ্বাসের মতো আজকাল আমার ঘুম ভাঙায়। আর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকলের আগে জেগে ওঠার একটা তৃপ্তির স্বাদ একা-একাই পাই। কিন্তু আজকের আকাশ যেন করুণ বিষণ্ণ মনে হয়। হিমের হালকা স্পর্শ আছে ঘাসে আর গাছের পাতায়। একটা দ্বন্দ্ব, বিস্মৃতির অস্পষ্ট ভয় আমাকে যেন টানা সহজ পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

কাল সন্ধ্যায় রজতকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ এক সময় দূরে প্রেমাংশুর ছবিটা বড় ম্লান মনে হয়েছিল আমার—ওর স্মৃতি কয়েক মুহূর্তের জন্যে মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল।

তখন একটা ঘোরে যেন রজত কথা বলছিল আর থেমে-থেমে ওর স্পষ্ট উচ্চারণ আমাকে টেনে আনছিল—সরিয়ে আনছিল প্রেমাংশুর কাছ থেকে অনেক দূরে। তখন আমি কাঁদছিলাম।

রজত বলছিল, আমি যখনই আসি, আপনার সঙ্গে কথা বলি, তখনই লক্ষ্য করি একটা ছায়া নামে আপনার মুখে—একটু থেমেছিল রজত, কিন্তু আমি আপনাকে দুঃখ দিতে আসি না—

আপনি দুঃখ দেন না, আমার গলা চিরে যেন অস্পষ্ট স্বর বেরিয়েছিল, কিন্তু আমি ভুলতে পারি না। আমার নিজেকে মাঝে মাঝে বড় দীন মনে হয়—বড় স্বার্থপর।

কেন?

ভোলবার চেষ্টা করি বলে।

না, ভোলবার চেষ্টা না। ভুলতে হয়। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আমাদের এগিয়ে যেতেই হয়।

এগিয়ে যাই। কিন্তু যেতে-যেতে হঠাৎ যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন নিজেকে বড় ছোট মনে হয়।

স্থির চোখে আমার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল রজত। কথা বলে নি—স্পষ্ট করে বলবার জন্যে হয় তো মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু ওর দৃষ্টি আমাকে যেন সরিয়ে নিয়েছিল এখান থেকে। ঠিক এমন করে মাঝে মাঝে প্রেমাংশু দেখত আমাকে। আমার চোখের সামনে এক আশ্চর্য সবুজ বনভূমি। আমি প্রেমাংশুকে পেয়ে গেলাম। আর তখন আবার চমকে উঠেছিলাম রজতের গলার স্বরে।

রজতের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল, না, ছোট মনে হয় না। আমরা জীবনকে, প্রেমকে ছোট করে দেখি বলে দুঃখ পাই। প্রেমাংশু কি আপনার জীবন থেকে সরে যেতে চেয়েছিল ?

না—কখনো না।

তাহলে কেন আপনি বার বার তাকে সরিয়ে দেন ?

রজতের কথা স্পষ্ট হয় নি আমার কাছে। আমি মাথা তুলে বলেছিলাম, হয় তো আমার নিজের স্বার্থের কথা ভেবে—

না, আপনার প্রেম সংকীর্ণ। আপনি প্রেমাংশুর কথা বোঝেন না—জানেন না। প্রেমাংশু আপনাকে কাঁদাতে চায় না।

সে কী চায় ?

প্রেমাংশু—হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে রজত বলেছিল, যে আপনাকে ভালবাসে, সে আপনাকে কখনো দুঃখ দিতে চায় না—কাঁদাতে চায় না। সে চায়, তার প্রেমের অফুরন্ত উত্তাপ আপনার শিরায়-শিরায় জেগে থাকুক।

কিন্তু সে যে নেই।

আর তার প্রেম ? তা-ও কি নেই ? নিদারুণ শোকের মাঝেও কখনও কি আপনার মনে হয় নি এক অস্বাভাবিক উত্তাপের কথা, যা আপনার জীবনে একটি মাত্র মানুষই আনতে পেরেছিল ?

হয়েছে, আমার সারা শরীর এক অস্থির আবেগে থরথর করে কাঁপছিল, সেই একটি মাত্র মানুষকে যখন নিজের প্রয়োজন ভুলিয়ে

দেয় তখনই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়—আমি বাঁচতে ভয় পাই।

আস্তে আস্তে রজত বলেছিল, যে-মানুষ চোখের সামনে থাকে না তাকে ভুলতেই হয়—বয়স কিম্বা জীবন কিম্বা এক-এক মুহূর্ত তাকে দূরে ঠেলে দেয়—

আমি মুখ নামিয়ে বসেছিলাম। রজতকে প্রতিবাদ করবার শক্তি আমার ছিল না। আমি জানি, যে নেই তাকে অল্পে-অল্পে ভুলতেই হয় তবু কেন মনে হয় এই বিস্মরণ একটা মস্ত অপরাধ!

রজত বলেছিল, এই দ্বন্দ্ব, মনের এই কৃত্রিম চেষ্টার জন্যে আপনার দোষ নেই, দায়ী আপনার আশেপাশের যত ছোট মনের মানুষ। তারা প্রেমকে মারে—প্রেমিককে মারে। যে মানুষ আপনাকে ভালবাসল, আপনাকে ভালবাসতে শেখাল সে আজ না থাক, কিন্তু প্রেমের মধ্যে দিয়ে আপনি তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। প্রেমাংশু সুখী হবে। আর তাহলে দেখবেন, আপনার কান্নাও বন্ধ হয়ে যাবে।

রজতের কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল। আমি ওর ভাষা বুঝতে পারছিলাম। আমি যেন মনে মনে প্রেমাংশুকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু তখনও আমি মাথা নিচু করে কাঁদছিলাম।

আর খুব জোরে, ঠিক মনে নেই রজত আমার হাত ধরেছিল কি-না, ও বলেছিল, কান্না নেই, দীপা, মাথা তুলে তাকিয়ে দেখ কোথাও কান্না নেই—

রজতের কথা শুনে আমি আরও অস্থির হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু তখন আরও কাছে, একেবারে বুকের কাছে যেন প্রেমাংশু এসেছিল আর তাই আমিও খুব জোরে বলে উঠেছিলাম, না না, আমি কাউকে চাই না—

কাউকেই নয়?

দুই হাতে চোখ ঢেকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় যেন আমাকে বলতে

হয়েছিল, আমি প্রেমাংশুকেই চাই। রজত, আমি বাঁচতে চাই না—আমি মরতে চাই—

তোমার স্বামী তোমাকে চায়—তোমার মৃত্যু চায়?

চায়—নিশ্চয়ই চায়। প্রেমাংশু আমাকে চাইবেই—চিরদিন।

না, একটা উজ্জ্বল আভা যেন হঠাৎ প্রেমাংশুর বনভূমি থেকেই ছিটকে এসেছিল রজতের চোখে-মুখে, যে তোমাকে ভালবাসে, ভীষণ ভালবাসে সে কখনও তোমার মৃত্যু চায় না—চাইবে না।

তখন ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। আলো না অন্ধকার আমি তা-ও বুঝতে পারছিলাম না কারণ তখনও আমার দুই হাত আমি চোখের ওপর চেপে রেখেছিলাম। অল্প পরেই খস্ খস্ শব্দ। রজত উঠে দাঁড়াল। আর কোন কথা বলল না। আমাকেও আর কিছু বলতে দিল না। আমিও চোখ খুলে দেখলাম না রজতকে। শুধু বুঝতে পারলাম একটা মানুষ এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আর তারপর আমি শুনলাম দূর থেকে ভেসে এল রজতের গলার স্বর, দীপা, আমি আবার আসব!

আসবেই। আমি জানি রজত আবার আসবে। আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে প্রেমাংশুর বনভূমিতে। আমার বাধা দেবার কোন শক্তি থাকবে না। কিন্তু শুধু একটি প্রশ্ন এখনও থেকে গেল আমার, আমি চোখের জল মুছে ফেলব কেমন করে?

কতক্ষণ একা-একা সেই ঘরে বসেছিলাম মনে নেই, একটু পরে শৈলেনের কর্কশ গলার স্বরে আমার তন্দ্রা ভাঙল। শৈলেনের গলার স্বর এত রুক্ষ, এত কর্কশ আমার এর আগে আর কখনও মনে হয় নি। ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেই বনভূমির সব রঙ, সব কোমলতা এক নিষ্ঠুর ছোঁয়ায় যেন মুছে গেল আমার মন থেকে। আমার চোখ দুটোও শৈলেনকে দেখে শুকনো খট খটে হয়ে উঠল।

বোধহয় শ্লেষের একটা কড়া ঝাঁজ ছিল শৈলেনের স্বরে, রজত চলে গেল?

কয়েক মুহূর্ত আমি দেখলাম শৈলেনকে। তারপর কঠিন কাটা-কাটা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলুন তো? আপনার সঙ্গে তার কি কোন দরকার ছিল?

না না, সে তো তোমার কাছেই আসে। আমার সঙ্গে তার দরকার থাকবে কেমন করে?

কিন্তু আমার কাছে তো আপনিও আসেন—

এবার স্পষ্ট বিদ্রূপের স্বরে শৈলেন বলেছিল, কিন্তু যে প্রেমাংশুর বন্ধু তার আসা-যাওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই অন্য সকলের চেয়ে বেশি।

শৈলেনের ঈর্ষা দেখে আমি মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছিলাম। এই ভীরু মানুষটার ঝাঁজ দেখে আমার হাসি পেয়েছিল। আর আমি কিছুক্ষণের জন্যে প্রগলভ হয়ে উঠেছিলাম। এখন আমার নিজেকে একেবারে অসহায় মনে হয় না বলে শৈলেনের মতো ভীতু মানুষকে আঘাত করবার ইচ্ছে হয়।

আমি বলেছিলাম, আমার কাছে কে আসে, কে যায় তা লক্ষ্য করার অধিকার বোধ হয় আপনার একার—তাই না?

আমার কথা শুনে জ্বলে উঠেছিল শৈলেন, হাঁ, আমার একার। কারণ তোমার সঙ্গে যখন আর কারুর আলাপ ছিল না— প্রেমাংশুরও নয়, তখন এ বাড়িতে আসার অধিকার একমাত্র আমারই ছিল—

আমি হেসে বলেছিলাম, আপনি তো দাদার কাছে আসতেন—

কিন্তু এখন আমি কার কাছে আসি?

সেকথা অপনিই জানেন, আমি বুঝতে পারছিলাম আস্তে আস্তে আমার মুখ, আমার গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠছে, আমি শুধু এইটুকুই জানি যে আপনি কোনদিন আমার কাছে আসেন নি— আসতে পারেন নি।

শৈলেন যেন আকস্মিক উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, তার মানে?

মানে, আমি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিলাম, আপনি আমাকে শেখান নি প্রেমাংশুকে কেমন করে বাঁচাতে হয়—কেমন করে নিজে বেঁচে উঠতে হয়। আপনি আমাকে শুধু মৃত্যুর দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েছেন।

বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিল শৈলেন, কিন্তু কে তোমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে—রজত ?

আমিও মাথা তুলে বেশ জোরেই বলেছিলাম, হ্যাঁ, রজত।

আমিও যে নির্লজ্জের মতো এমন জোরে কথা বলে উঠব শৈলেন ভাবতে পারে নি। তাই ও চমকে উঠেছিল। শৈলেন হাঁপাচ্ছিল। আমি ওর এই ঈর্ষার কারণ খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু রজতের ছোঁয়ায়, প্রেমাংশুর উত্তাপে আমার শিরায়-শিরায় জীবন জ্বলছিল বলে মৃত্যুর মতো একটা মানুষকে আমি কঠিন আঘাত দিতে চেয়েছিলাম। আর বেঁচে ওঠার প্রথমেই এই জটিলতা, শৈলেনের বিদ্রূপ আর ঝাঁজ আমার ভাল লাগছিল।

আমি তোমার কাছে আসতে পারি নি, উত্তেজনার ঘোরেই কথা বলছিল শৈলেন, কারণ আমি তোমার অতীতকে শ্রদ্ধা করেছিলাম —নিজের স্বার্থের কথা ভেবে আমি আর পাঁচজনের কাছে তোমাকে সুলভ করে তুলতে চাই নি—

কিন্তু যে আমার বর্তমানকে শ্রদ্ধা করে সে আমাকে সুলভ করে তোলে তা আপনার মনে হয় কেমন করে ?

প্রেমাংশুর কোন মূল্য নেই তোমার কাছে ?

আছে বই কি, আর সে-মূল্য বাড়িয়ে দেবার মানুষও আছে পৃথিবীতে—

হ্যাঁ আছে, হেসে উঠেছিল শৈলেন, এমন মানুষের অভাব পৃথিবীতে নেই যারা শুধু সুবিধা পেতে চায়—

কিন্তু সুবিধা চেয়েও পায় না আর তখন বেড়ার আড়ালে লুকোয় এমন মানুষেরও তো অভাব নেই, আমার কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল শৈলেন। ও অস্থির হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সংযত করবার ক্ষমতাও ওর ছিল না।

শৈলেন বলেছিল, কিন্তু তুমি কেন আমাকে ভুল কথা বলেছিলে? শুধু শ্রদ্ধা আদায় করবার জন্যে প্রেমাংশুর নাম করে কেন মিথ্যা কথা বলেছিলে?

আমি সমানে এতক্ষণ শৈলেনের সঙ্গে তর্ক করে যাচ্ছিলাম। যেন অনেক দিন পর হঠাৎ বেঁচে উঠে জীবনের এই স্বাদ আমি বুক ভরে গ্রহণ করছিলাম। কিন্তু এবার আমার মনে হল শৈলেন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন এর শেষ করা দরকার। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর তখন শৈলেন এসে দাঁড়াল আমার ঠিক সামনে।

কোথায় যাচ্ছ?

আপনি দাদার বন্ধু, রূঢ় স্বরেই বলেছিলাম, আমার কিম্বা প্রেমাংশুর সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক ছিলনা—আপনি আর কখনও এমন স্বরে এসব কথা আমার সামনে বলবেন না।

আমি কথা শেষ করে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাধা দিয়ে শৈলেন বলেছিল, দীপা, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি সব মেনে নেব। তুমি আমাকে বাঁচাও!

কী মেনে নেবেন আপনি?

তোমার অতীত—প্রেমাংশুকে—সব!

কিন্তু আমার কোন অতীত নেই, অস্বাভাবিক ঝাঁজে বোধ হয় আমার স্বর বিকৃত হয়ে উঠেছিল, এসব কথা কেন আপনি আমাকে শোনান? একটা কথা কেন বুঝতে পারেন না যে আমি সর্বহারা কাঙালিনী হয়ে কারুর কৃপায় বেঁচে থাকতে চাই না?

কিন্তু দীপা, শৈলেনের স্বর অনেক নেমে গিয়েছিল হঠাৎ, তুমি কি আমাকে বাঁচাবে না?

না, দৃঢ় একটা শাসন যেন আমার গলা চিরে বেরিয়ে

এসেছিল, আমি আবার আপনাকে বলছি, জোর করে কোন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন না—তা হয় না—হবে না।

হয় তো আমাকে মিনতি করত শৈলেন—স্পর্শ করত। সমস্ত সংস্কারও হয়তো খুব অল্পক্ষণের জন্যে মুছে যেত ওর মন থেকে, দেহমন দিয়ে আমাকে কামনা করত শৈলেন, ব্যাকুল হয়ে ভেঙে পড়ত কিন্তু আর নয়—অনেক হয়েছে। আমারও আর কথা বলবার ধৈর্য ছিল না। আমি তাকাই নি ওর দিকে। ওকে সেখানে একা দাঁড় করিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু তারপর একা-একা আমার ঘরের পাশে সেই পুরনো অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কথাই শুধু মনে হচ্ছিল—কেন, কোন আশ্বাসে, কী সঙ্কেতে আমি এত স্পষ্ট করে রজতের কথা শৈলেনকে জানাতে পারলাম।

দুপুরবেলা খাবার পর একটা মিষ্টি আলস্যে খাটের একধারে শুয়ে মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। গল্প কিম্বা প্রবন্ধর নামগুলো দেখেই আঙুল চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ধৈর্য ধরে কিছু পড়বার ইচ্ছে নেই। পত্রিকা দেখতে-দেখতে ঘুমের আমেজ আসছিল। বেড কভার সরিয়ে বালিশ টেনে নিলাম। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই হয় তো ঘুমিয়ে পড়তাম কিন্তু অসময়ে ঝণ্টুকে ইস্কুল থেকে ফিরে আসতে দেখে আমার তন্দ্রা ছুটে যায়।

কী গো ঝণ্টু বাবু, আজ এত তাড়াতাড়ি ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল যে?

ছুটি হয় নি পিসি, থমথমে ভারী স্বরে ঝণ্টু বলে, আমার খুব জ্বর হয়েছে। আমাকে মাস্টার মশাই ছুটি দিয়ে দিলেন—

খাট থেকে নেমে ওর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। গা গরম—ভীষণ গরম। ঝণ্টুর চোখ দুটো লাল। জুতো মোজা খুলে

ওকে আমার খাটে শুইয়ে দিলাম। বসে রইলাম ওর মাথার কাছে। যদি জ্বর না ছাড়ে তাহলে দাদা ফিরে এলে ডাক্তার ডাকব।

ঝণ্টু, ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে জিজ্ঞেস করি, তুমি কার সঙ্গে এলে?

ইস্কুলের দারোয়ানের সঙ্গে পিসি, মাথায় খুব ব্যথা—

ঝণ্টুর জ্বর অনেক। আমি আর একবার ভাল করে থার্মোমিটার দেখলাম। এখন মাথায় আইসব্যাগ দেয়া যেতে পারে। অল্প-অল্প ভাবনা হল আমার। এই অল্পক্ষণের মধ্যে ঝণ্টুর চেহারা যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। নিঃঝুম হয়ে ও পড়ে আছে। দাদা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

কিন্তু তখন দাদার আশায় বসে না থেকে আমি যদি ডাক্তার ডাকতাম তাহলে রাতে এত বাড়াবাড়ি হত না ঝণ্টুর। আমি ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা লেগে ওর জ্বর হয়েছে—দু-একদিনের মধ্যেই ছেড়ে যাবে। দাদা ফিরল অনেক রাতে—আজও দাদার মুখে মদের গন্ধ। স্বর জড়ানো। আমি দাদাকে ঝণ্টুর অসুখের কথা বলে ওকে আমার ঘরে ডেকে আনলাম।

দাদার স্বর শুনে ঝণ্টু চোখ খোলে কিন্তু যেন চিনতে পারে না কাউকে। হঠাৎ বিড়-বিড় করে বলতে থাকে, না না, আমি আর মার কাছে যাব না। পিসি, আমাকে মার কাছে নিয়ে যাবে না—

দাদা ঝণ্টুর কপালে হাত দেয়। আর ওকে দেখতে-দেখতে দাদার নেশাও যেন কেটে যায়। খাটের ওপর ও কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকে। একটু পরে চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

দাদা ভয় পেয়েছে। ওর মুখ দেখে আমার মনে হল, এখন কী করবে যেন ঠিক করতে পারছে না। দাদা একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিকে যায়। তারপর ঝণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝণ্টু তখনও প্রলাপ বকছে, না, কখনো না, আমি মার কাছে যাব না—

দাদা ছটফট করতে করতে হঠাৎ বলে ওঠে, দীপু, একবার খবর দিতে হয়—

দাদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, এখুনি ডাক্তারকে খবর দিতে হবে দাদা—

দাদা মাথা চুলকোয়। একটু ইতস্তত করে অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু আমি জয়ার কথা বলছিলাম—

দাদার কথা শুনে আমি যেন চমকে উঠি। সব চেয়ে আগে এ সময় জয়ার কথা কেন মনে হয় দাদার? কিন্তু বেশি ভাববার সময় নেই। ক্লান্ত বিব্রত মুখে দাদার দিকে তাকিয়ে আমি বলি, জয়াকে কাল খবর দিলেও চলে। ঝন্টুর কী হয়েছে সেটা আগে জানা দরকার। তুমি আগে ডাক্তারকে খবর দাও।

আমার কথা শুনে দাদা হঠাৎ যেন একটা নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর জোরে পা চালিয়ে বোধহয় ডাক্তারকেই খবর দিতে যায়। একটু পরেই গলায় স্টেথস্কোপ ঝুলিয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে আমাদের বাড়ির পুরনো ডাক্তার ঘরে এসে ঢোকে। আর ঝন্টুকে পরীক্ষা করতে করতে ভুরু কোঁচকায়। ইতস্তত করে না অভিজ্ঞ ডাক্তার। গম্ভীর স্বরে বলে, এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে, প্যাড আর কলম বের করে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লিখতে ডাক্তার বলে, ওষুধ আজই আনাতে পারলে ভাল হয়। আমাকে আরও আগে খবর দেয়া উচিত ছিল। যাহোক, ইনজেকশনও দিচ্ছি—

ডাক্তারবাবু, আমি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করি, ভয়ের কিছু নেই তো?

ডাক্তার শুকনো হাসি হাসে। আমার কথার জবাব দেয় না। বলে, মাথা ধুইয়ে দিন। কাল ভোরেই যেন আমাকে খবর দেয়া হয়, ব্যাগ বন্ধ করে, কলম বুকপকেটে রেখে ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়।

পরদিন সকাল থেকে, মুখ দেখেই আমরা বুঝতে পারি, ঝন্টুর

অবস্থা আরও খারাপ হয়। ও নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। কথা বলে না। প্রলাপও বকে না শুধু নিশ্বাস নেবার সময় ওর বুক ঠেলে যেন ঘড় ঘড় শব্দ হয়। আর জ্বরও বাড়ে। ভোরবেলা ডাক্তার এসেছিল। দুপুরের দিকে আর একবার আসবে বলে গেছে।

কাল রাতে যে কথা দাদা বলেছিল, জয়াকে ঝণ্টুর অসুখের কথা জানাতে, একটা ঘুমহীন রাত ঝণ্টুর বিছানায় বসে কাটাবার পর, আজ ভোরে আমারও সেকথা মনে হয়। আমার চোখ টনটন করছে, শরীর কাঁপছে। একটা ভীষণ ভয় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে আমার ঠাণ্ডা বুকের মধ্যে। আমি বেশিক্ষণ ঝণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে এখানে বসে থাকতে পারছি না।

দাদাও বসে আছে এঘরে। যন্ত্রের মতো ঝণ্টুর মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে, জোর করে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ওষুধ মুখের মধ্যে যাচ্ছে না ঝণ্টুর, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দাদারও বোধহয় হাত কাঁপছে। আমাদের কারুরই খাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই।

দাদা, একটানা যন্ত্রণায় আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও খুব আস্তে, বোধহয় দায়িত্বের ভাগ দেবার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে ফেনিয়ে ওঠে বলেই আমি বলি, জয়াকে—বৌদিকে খবর দেবে না?

করুণ বিবর্ণ হয়ে ওঠে দাদার মুখ। দাদাও যেন অপরাধীর মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলে, দেব?

হ্যাঁ, আমার মনে হয় বৌদিকে এক্ষুনি ঝণ্টুর অসুখের কথা জানানো দরকার।

ও আসবে?

হ্যাঁ, এবার ওকে আসতেই হবে। এখন বৌদিকে আনতে না পারলে—মানে, পরে আমাদের পাড়ার লোক নিন্দে করবে।

কিন্তু কেমন করে খবর দেব? একটু ভেবে দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুই যাবি?

আমি মাথা নেড়ে বলি, যেতে তো হবেই। তুমি ঝন্টুকে একা সামলাতে পারবে?

দাদা বলে, পারব; তুই একটা ট্যাক্সি নিয়ে যা। জয়াকে এখুনি সঙ্গে করে নিয়ে আয়—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যেন আপন মনেই বলি, দেখি—

কিছুক্ষণ পর রাস্তায় বেরিয়েই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে যাই। কাউকে দিয়ে ট্যাক্সি বাড়িতে ডাকিয়ে আনতে পারতাম কিন্তু এক মুহূর্তও নষ্ট করতে মন চায় নি, একটা অশুভ আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছিল।

এখন প্রথম সকাল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। ট্রামে-বাসেও বেশি ভিড় নেই। ট্যাক্সি খুব জোরে ছুটছিল; হঠাৎ আমার মার কথাও মনে পড়ে যায়। আশ্চর্য, এতক্ষণ তাঁর কথা একবারও মনে হয় নি। তিনি যে বেঁচে আছেন সেকথাও যেন আজকাল আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু মার কথা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা যেন কমে এল আমার, বুক অনেক হালকা হল। সকালের কচি আলোয়, হুহু হাওয়ায় যেন তাঁর আশীর্বাদের, শুভ কামনার ঘ্রাণ পেলাম। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব মিটে যাবে। সংসার ছেড়ে মা চলে গেছেন এক যুক্তিহীন বিশ্বাসে ভর করে কিন্তু এখন তাঁর ভাবনা আমার বিচলিত মুহূর্তগুলোকে যেন সংযত করে দেয়। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি তাড়াতাড়ি জয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই।

আজ ছুটির দিন না। জয়ার ঘরের দরজা খোলা। স্টোভের শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমি হাত দিয়ে দরজায় টক টক শব্দ করি।

কে? আমাকে বোধহয় এত সকালে আসতে দেখে জয়া অবাক হয়ে যায় কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এস, এস—তুমি বাইরের লোকের মতো দূরে থেকে ডাক কেন

দীপু? এ কী, তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?

আমি জয়ার কাছে সরে এসে বলি, তোমাকে আমার সঙ্গে এখুনি যেতে হবে। ঝণ্টুর বাড়াবাড়ি অসুখ। আমি তোমাকে নিতে এলাম—

হঠাৎ কড়া তাপ যেন লাগে জয়ার মুখে। ওর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। অন্য দিকে তাকিয়ে ও শুধু বলে, তাই তুমি এই সাত সকালে এখানে ছুটে এসেছ, জয়া আমার দিকে তাকায়, কিন্তু আমি যাব না —যেতে পারি না—

ঝণ্টুর জন্যে তোমাকে যেতেই হবে, জয়াকে ভয় দেখাবার জন্যে বলি, কখন কী হয় বলা যায় না, এ সময় তুমি কাছে না থাকলে—

সব দায়িত্ব আমি নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছি দীপু—আমি আমার মনকেও তৈরি করে ফেলেছি।

কিন্তু ঝণ্টু তো শুধু দাদার ছেলে নয়, তোমারও ছেলে। তুমি দাদার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পার—

এসব কথা আমি জানি। আমি সব বুঝি কোন কারণেই আমি আর ও বাড়িতে যাব না সেকথা তোমাদের অনেক বার জানিয়ে দিয়েছি দীপু।

জয়া থামে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। একবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, আর একবার মনে হয়, আমি চলে গেলে জয়া ছটফট করবে। ছেলের ভাবনায় কোন কাজে মন দিতে পারবে না। আর দম্ভ বাঁচিয়ে রাখতে হবে বলে ঝণ্টুর খবরও নিতে পারবে না। তাই আমি ঠিক করি, ওকে আমার সঙ্গে এখুনি নিয়ে যেতেই হবে।

জয়া, আমি এবার মিথ্যা কথা বলে তার মন টলাতে চাই, কাল সারা রাত ঝণ্টু প্রলাপের ঘোরে মা-মা বলে ডেকেছে—

জয়ার চোখ দুটো আমার কথা শুনে করুণ হয়ে ওঠে। সে শুধু কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে, ঝণ্টু আমাকে খুঁজেছে—

হ্যাঁ।

তাহলে? কী হবে? একটু পরেই শান্ত স্বরে জয়া বলে, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে দীপু—

কী?

আমি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু আমি যতক্ষণ সেখানে থাকব ততক্ষণ সে-ঘরে যেন তোমার দাদা না আসে।

আমি জয়াকে আশ্বাস দি, আসবে না।

একটু পরে জয়া আমার সঙ্গে রাস্তায় নামে। একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে। শুধু জয়ার কথায় যে বিস্ময় জমে ওঠে আমার মনে তা যেন কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। এখনও দাদার ওপর এত বিতৃষ্ণা কেন জয়ার। এখন দাদা তো ওর কাছে বাইরের আর পাঁচজন মানুষের মতোই। বাইরের সব সম্পর্ক যখন দাদার সঙ্গে চুকিয়ে দিয়েছে জয়া তখন ভিতরে ভিতরে ওর এখনও এত আক্রোশ কেন। কী জানি!

আমাদের বাড়িতে পৌঁছে যেন একান্ত অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে পা ফেলে সাবধানে জয়া দোতলায় ওঠে। দাদাকে কিছু বলবার দরকার হয় না, সে শুধু জয়াকে একবার চোখ তুলে দেখেই কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ঝণ্টুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার কপালে একটা হাত রেখে আস্তে জয়া ডাকে, ঝণ্টু—

কিন্তু কথা বলতে পারে না ঝণ্টু। চোখও খোলে না। জয়া তাকিয়ে থাকে তার দিকে। আমি লক্ষ্য করি ওর চোখ জলে ভরে যায়। সে মাথা তুলে চারপাশে তাকায়। যেন তার সব চেয়ে কাছের মানুষ তারই চোখের সামনে অল্প-অল্প করে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর সে কিছু করতে না পারার অস্থিরতায় পাথর হয়ে পড়ে আছে একদিকে।

আমি জয়াকে বলি, তুমি বস, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে—আমি যাই, তোমার জন্যে চা করে আনি—

জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে জয়া আমাকে বাধা দেয়, না, যেও না।

আমি এখন কিছু খাব না—ঝন্টুর গালে হাত বুলোতে-বুলোতে সে বলে, এর যে গা পুড়ে যাচ্ছে, দেখ দেখ, ওর মুখটা কেমন হয়ে যাচ্ছে, কখন ডাক্তার আসবে দীপু ?

এখুনি আসবে, আমি জয়ার খুব কাছে এসে দাঁড়াই, এই যে আইসব্যাগটা দিতে হবে—

তুমি দাও দীপু, তুমি দাও। আমি এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না—কেন, কেন তুমি আমাকে ডেকে আনলে ? জয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। খাটের ওপর ঝন্টুর মাথার কাছে বসে পড়ে কান্না-কান্না গলায় ডাকে, ঝন্টু, ঝন্টু—

তখন হয় তো জয়ার ডাক শুনে নয়, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঝন্টু চোখ খোলে। লাল চোখ। ঘোলাটে দৃষ্টি। জয়া ঝুঁকে পড়ে ওর দেহের ওপর। কিন্তু ঝন্টুর মুখ দেখে মনে হয় জয়াকে দেখে ও যেন চমকে ওঠে—ভীষণ ভয় পায়। ও চোখ বন্ধ করে। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে। তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে যায় ঝন্টুর দেহ। আমি লক্ষ্য করি, ওর হাত দুটো যেন শুকিয়ে যায়। আর তখন একটা বড় ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে ডাক্তার এসে ঢোকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ঝন্টুর মুখ দেখে ডাক্তার চমকে যায়। তার-পর তাড়াতাড়ি খাটের কাছে এসে ওর একটা হাত তুলে নেয়। এক মুহূর্ত। গম্ভীর থমথমে হয়ে ওঠে ডাক্তারের মুখ। আমার দিকেই তাকায় ডাক্তার।

জয়া চিৎকার করে ওঠে, ডাক্তারবাবু !

আমিও জিজ্ঞেস করি, ঝন্টু কেমন আছে ?

আমার কথার উত্তর দেয় না ডাক্তার। মুখ নামিয়ে বসে থাকে দু-এক মিনিট। দাদা এখনও ঘরে আসে না। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি যে আর কোন কথা নেই ডাক্তারের—আমি বুঝতে পেরেছি যে ঝন্টু আর নেই।

প্রথম আশ্বিনের তাজা আলোর সব রঙ মুছে যায় আমার সামনে থেকে। যারা দাঁড়িয়ে আছে এখন আমার কাছাকাছি তাদের মুখ ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে যায়। বুক ঠেলে কান্না আসে কিন্তু ভেঙে পড়তে পারি না। আমার সব অনুভূতি যেন শুকিয়ে গেছে। জয়াকে জোর করে সকাল বেলা ধরে এনে এ কী দৃশ্য আমি দেখালাম!

ভয়ে-ভয়ে একবার জয়ার মুখের দিকে আমি তাকাই। কিন্তু উদ্বেগ নেই ওর চোখে। জিজ্ঞাসা নেই। স্থির হয়ে ও বসে আছে। কিন্তু আমি কী করব এখন। টপ টপ করে আমার চোখ বেয়ে জল পড়ে। খুব জোরে দাদাকে ডাকি।

ডাক্তার তাকায় না কোনদিকে। কাগজ বের করে কী যেন একটা লেখে। সে কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে আস্তে-আস্তে ডাক্তার বেরিয়ে যায়। দাদা এখনও দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। কাঁদছে না। শুকনো ম্লান মুখ। কিন্তু ঘরে তখন আশে পাশের বাড়ি থেকে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘর ভরে যায়।

জয়া উঠে দাঁড়ায় একটা যন্ত্রের মতো। ছুটে আমাদের সবাইকে ঠেলে বেরিয়ে যায়। কাউকে একটা কথা বলবার সুযোগ দেয় না। ওকে ঠেকাবার জন্যে আমিও ওর পেছন-পেছন ছুটে নিচে নেমে আসি। চিৎকার করে জয়ার নাম ধরে ডাকি। ও সাড়া দেয় না। পিছনে তাকায় না। বিমূঢ় হয়ে দূর থেকে আমি দেখি অপ্রকৃতিস্থ একটা মেয়ে ছুটে বড় রাস্তা পার হয়ে যায়।

॥ দশ ॥

এক-একবার, আমি জানিনা কাকে লক্ষ্য করে আমি মনে মনে বলি, এই নিঃঝুম বাড়ি থেকে আমাকে মানুষের ভিড়ে নিয়ে যাও—আমাকে নিয়ে যাও জনতার কোলাহলে। এ বাড়িতে আমি আর থাকতে চাই না। আমি এই তিল-তিল মৃত্যু থেকে মুক্তি চাই। কিম্বা একবারে শেষ হয়ে যেতে চাই।

এ বাড়িতে যেন আর কোন মানুষ নেই। একটি ছোট মানুষ হঠাৎ শেষ নিশ্বাস ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে সব দাপাদাপি শেষ হয়েছে—সব কলরব থেমে গেছে। ঘরে-ঘরে শুধু একটা কান্না কাঁপছে। আর মাঝে মাঝে একটা সাংঘাতিক অভিমান আমাকে কঠিন খোঁচা মারছে। কারা মারল ঝণ্টুকে? ছোট একটি ছেলে কিছু বুঝল না, প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই বলে আপন মনে গুমরে-গুমরে দূরে চলে গেল।

কিন্তু আমার ভাবনার সঙ্গে দাদা আর জয়ার ভাবনার হয় তো অমিল অনেক। ঝণ্টুর মৃত্যুও আমার মনে হয়, ওরা গ্রহণ করতে পেরেছে পরস্পরকে আরও দোষ দিয়ে, আরও ঘৃণা করে। দাদা একদিন স্পষ্ট করেই আমাকে বলেছিল, দেখলি, দেখলি? চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়ল না—

আমি কিছু দেখি নি দাদা—

জয়ার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। এ বাড়িতে সে একদিনই এসেছিল। আমি জানি আর কোনদিনও আসবে না। তবে দেখা হলে হয়তো জয়াও আমাকে বুঝিয়ে দিত ঝণ্টুর মৃত্যুর জন্যে সব দোষ দাদার। এখনও ঈর্ষার ঝাঁজে, আক্রমণের তীব্র ইচ্ছায় ওরা শোক ভুলেছে—ঝণ্টুকেও ভুলেছে। থাক জ্বালা। থাক ঈর্ষা। ওদের

বুকের মধ্যে জীবন জ্বলুক। মৃত্যু হার মানুক। শোক তুচ্ছ হোক। কে জানত ঈর্ষা এত মধুর! আমি কাকে ঈর্ষা করব?

একটা সেতু, জয়া আর দাদার মাঝে হঠাৎ কখন আসা-যাওয়ার একটা সোজা পথ মুছে গেছে। ঝণ্টু নেই। কোন সূত্র ধরেই আর কেউ কারুর সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াতে পারবে না। আর কখনো-কখনো একা-একা নির্জন অবসরে হয় তো মানুষ বলেই ওরা সব দোষ তুলে নেবে নিজের কাঁধে। তখন ওরা চোখের জল ফেলবে। আর জীবনের সব পাওয়া মিথ্যা হয়ে যাবে ওদের কাছে।

কিন্তু এমন দুর্বল মনকে ওরা পালন করতে পারবে আর কতক্ষণ! জীবনের দাবী আর কলরবে, একটা উদ্দীপ্ত আমন্ত্রণে ওরা কান্না ভুলবে —শোক ভুলবে। ওরা বাঁচবে।

দাদাকে রোজ দেখি। রোজই আমার মনে হয় ওর যেন বয়স কমে যায়। ওর জীবনে নিয়ম নেই। শাসন নেই। শুধু অফুরন্ত প্রাণশক্তি আছে। এ বাড়ির কোন ম্লান নির্জন ঘর ওকে ধরে রাখতে পারে না। ও বাইরের ডাকে সাড়া দিয়ে বেঁচে থাকে—বেঁচে থাকে নির্ভীক যুবকের মতো। চিন্তার একটি করুণ রেখাও নেই ওর মুখে।

জয়াকে দেখি না। কিন্তু তার অবস্থাও কল্পনা করে নিতে পারি। এখানে কাঁদতে পারে নি ও। কিন্তু কাঁদতে ওকে হবেই। হয় তো ও কাঁদবে শিশিরবাবুর সামনে। তার সান্ত্বনায় ছাড়াবে জীবনের জট —ভাঙা চোরা অতীতের যন্ত্রণা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে। জয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ওর সম্পর্কেই একটা নিষ্ঠুর ভাবনা হঠাৎ আমার মনে উঁকি দেয়। তিক্ত অতীতের যে দ্বিধা, যে সংশয় শিশিরবাবুর কাছে জয়াকে সহজ হতে দেয় নি, এখন ঝণ্টুর মৃত্যুতে সে-সবের শেষ হবে। জয়া সুখী হবে। দাদাকে আরও ঘৃণা করবে—একেবারে দূরে সরিয়ে দেবে—নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওর জীবনের দুঃস্বপ্নের দিন।

তাই হোক। আলোর রেখায়-রেখায় মুছে যাক ওদের দুজনেরই ক্ষতির দিন, হারের রাত। জড়তা আর ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে ওরা

বাঁচুক। কিন্তু শুধু আমি এ বাড়িতে আর থাকতে পারছি না। কে আমাকে নিয়ে যাবে এই থমথমে নির্জন গুহা থেকে!

শৈলেনও আর আসে না। আসবার কথাও নয়। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ঝণ্টুর মৃত্যুর খবর পেয়ে অন্তত একবার মামুলি সান্ত্বনা দিতে শৈলেন আসবে। হয় তো সে খবর পায় নি। হয় তো সে এ বাড়ির কোন খবরই আর রাখে না। তার কথা আমারও আর মনে হয় না।

একা-একা ঘরে বসে কিম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এখনও ঝণ্টুর কথা ভাবতে-ভাবতে আমার দেহটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কতটুকুও পেল জীবনের! কতটুকু দেখল! যে কদিন ছিল এ পৃথিবীতে শুধু দেখল শোক—শোকের পর শোক। কলহ আর অশান্তির রূঢ় দৃশ্য দেখতে-দেখতে নিঃশব্দে হঠাৎ একদিন সরে গেল।

রজত আমার মুখে সব কথা শুনে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। ঝণ্টুর মৃত্যুর জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। ওর মৃত্যুও প্রেমাংশুর মৃত্যুর মতো আকস্মিক। রজত এ সংসার থেকে, আমার মন থেকে মৃত্যুকে, মৃত্যুর ছায়াকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূর করে দিয়েছিল। কিন্তু আবার আমার শরীর কাঁপে। চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। আমি আর রজতের ওপর আস্থা রাখতে পারি না।

ঘন শরৎ নেমেছে। প্রথম সন্ধ্যায় যখন আলোর পাতলা ছায়া হালকা অন্ধকারের গায়ে লেগে থাকে, যখন আকাশকে আশ্চর্য সাদা মনে হয় আর পুরু মেঘ এলোমেলো স্মৃতির রেখা টেনে-টেনেও ক্লান্ত হয় না তখন রজতের প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শিউলি আর কাঠ গোলাপ গাছের মাথায়-মাথায় স্থির ধোঁয়ার মতো, শীতের কুয়াশার মতো ম্লান সাদা কী যেন থমকে থেমে থাকে। তখন আমি এ বাড়ি থেকে পালাতে চাই। আমার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আর কিছু চাই না। সোজা একটা টানা পথ আমাকে দেখিয়ে দিক রজত। সে-পথ ধরে আমি পালিয়ে যাই প্রেমাংশুর কাছে।

একটা জায়গা এখন আছে আমার—প্রেমাংশুর বনভূমি। একটা বিশ্বাস এখনও স্থির হয়ে আছে হয় তো রজতের জন্যেই—প্রেমাংশুর প্রেম। কিন্তু শান্তি নেই। মৃত্যু ছাড়া আমারও মুক্তি নেই। এসব কথাই আমি শোনাই রজতকে।

বোধহয় আজ থেকে রোদের তেজ কমতে শুরু করেছে। অনেক দূরে কোথাও শীত যেন অপেক্ষা করছিল, আজ থেকে প্রথম থেমে-থেমে তার চলা শুরু হল। বিকেল ফুরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। পাখা চালালে শীত-শীত করে। মাঝে মাঝে এখান ওখান থেকে মশা এসে গায়ে বসে। কোন-কোনদিন, যেদিন দাদা মদ খায় না আর তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরে আসে, যেদিন রজত আসে না, সেদিন দাদা এসে আমার পাশে বসে। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে। আর ঘন ঘন সিগারেট খেতে খেতে প্রেমাংশুর সেই ছবিটার দিকেই তাকায়।

কী ঠিক করলি দীপু?

কিসের?

এমন করে সারা সন্ধ্যে বাড়ি বসে থাকবি—এমন করেই জীবন নষ্ট করবি?

না দাদা, আমার একাকীত্বের কথা আর নতুন করে কাউকে শোনাতে চাই না বলে জোর করে মুখে হাসি টেনে বলি, জীবন নষ্ট করব না।

কী করবি?

আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কী করবে?

প্রথমে অবাক হয়ে যায় দাদা। কিন্তু একটু পরেই মাটিতে পা ঠুকে বলে, কিছু করব না। যেমন আছি তেমন থাকব। দেখতে পাস না আমি কত ভাল আছি এখন?

আবার সেই ভাল থাকার কথা! দাদার কথা শুনে আজ আমি খুশি হতে পারি না। এ সময় মা কাছে থাকলেও হয় তো সত্যি ভাল থাকতে পারত। আর আজ আমার হঠাৎ মনে হয় আমিও

বেশি দিন থাকব না এ বাড়িতে। কোথাও না কোথাও, হয় তো প্রেমাংশুর কাছেই আমাকে চলে যেতে হবে। তখন দাদা কী করবে!

দাদা, আমি ফস করে বলে ফেলি, তুমি আর একটা বিয়ে করবে?

জোরে হেসে ওঠে দাদা, কেন বল তো? মরবার জন্যে?

মরবে কেন? সকলেই কি মরে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, আর একবার মাটিতে পা ঠোকে দাদা, সকলেই মরে যাচ্ছে। ওরা বোকা, ওরা ভীতু! আমি ওদের মতো হতে পারলাম না বলেই তো এত কাণ্ড হল—

কিন্তু একদিন যখন তোমার অনেক বয়স হবে, ধর আর কুড়ি-বাইশ বছর পরে, যখন একটি লোকও থাকবে না তোমার কাছে। একা-একা তখন—

এখনও হাসে দাদা, তখনকার কথা ভেবে এখন আমাকে একটা বিয়ে করতে হবে? না না দীপু, তুইও বেশ আছিস—আমিও বেশ আছি—

হ্যাঁ দাদা, সত্যি আমরা বেশ আছি।

তারপর আর গল্প জমে না। কথা হয় না। আমাদের দুজনের এই ভাল থাকার কৃত্রিম অভিনয় ডুবে যায় এক অখণ্ড নীরবতায়। শুধু দাদা একটার পর একটা সিগারেট টানে। আর আমি ওর পাশে বসে থাকি। তারপর এক সময়, অনেক পরে আস্তে আস্তে দাদা উঠে যায়। খাবার আগে দাদাকে ডাকতে গিয়ে দেখি ক্লান্ত ছোট ছেলের মতো ও ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে তারপর আমি ওর ঘুম ভাঙাই।

আজ খুব সকালে কিম্বা কাল শেষ রাতে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল। এখন আমার ঘুম ভাঙার পর-পর বাইরে তাকিয়ে দেখি রাস্তা ভিজে,

আকাশ দেখে মনে হয় আবার বৃষ্টি হবে। আজ সারাদিনে রোদ উঠবে না।

হঠাৎ বুকের ভেতর কনকন করে ওঠে। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। প্রেমাংশুর কথা মনে হয়। এখন বর্ষা নয়। কিন্তু একদিন যেদিন প্রেমাংশু রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরেছিল, যেদিন সে শেষ কথা বলে যায় আমার সঙ্গে, যেদিনকার আকাশ যেন আজকের মতো ছিল, সেদিন ভিজে-ভিজে দুপুরে রজত প্রথম এসেছিল এখানে। আজ আমি প্রেমাংশুর ছবির দিকে শুয়ে শুয়েই তাকিয়ে থাকি। কিন্তু তার শেষ কথা, দীপা, আমি আবার আসব—জোলো হাওয়ায় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রেমাংশু আসে না—আসবে না।

দাদা অফিসে বেরিয়ে যাবার সময়-সময় হাওয়ার একটা তোড় আসে আর জোরে জল নামে। তবুও দাদা বেরিয়ে যায়। যদি পায় তাহলে হয়তো ট্যাক্সি নেবে। আমার বুক কাঁপে। বার বার দাদাকে বলতে ইচ্ছে করে, বেরিও না—আজ এমন দিনে বেরিও না। একদিন অফিসে না গেলে কোন ক্ষতি হবে না তোমার!

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও আমি বাধা দিতে পারি না দাদাকে—বারণ করতে পারি না। ভারী লোহার মতো একটা সঙ্কোচ যেন আমার গলা টিপে রাখে। আমি স্বর বার করতে পারি না। দাদা চলে যায়। আর আমি এক অশুভ আশঙ্কায় বসবার ঘরে একটা চেয়ারে নিঃঝুম হয়ে বসে থাকি। দাদা ফিরে না এলে বোধহয় এখান থেকে উঠতে পারব না।

কিন্তু কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়! সংসারের সব ভার আমার ওপর। যদিও সংসারে মানুষ নেই কিন্তু কারুর লাভ ক্ষয় ক্ষতির কথা না ভেবে নিয়মের একটা চাকা যেন ঘোরে আর ঘোরে। আর তার সঙ্গে আমাকে তাল রাখতে হয়। হয় তো আমি বুঝতে পারি না কখন আস্তে আস্তে এই নিয়মের চাকাই আমাকে ঠেলতে ঠেলতে

স্মৃতির জগৎ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। যদি এই নিয়ম, এই ঘূর্ণন থেমে যেত তাহলে আমাকেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত এক জায়গায়—আমার মৃত্যু হত।

ঠাণ্ডা দুপুর। নিঃঝুম। এখনও চিক চিক জল ঝরছে—এখনও একটা ভয়, একটা কনকনানি আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এক ঘর লোক যদি থাকত এখন এখানে, কথা বলত, হাসত তাহলে অশুভ ইঙ্গিত, একটা আতঙ্ক হয়তো মুছে যেত আমার মন থেকে। আমি কাকে ডাকব—কার সঙ্গে কথা বলব!

কথা বলবার লোক আসে একটু পরেই ভয়ঙ্কর হয়ে। আমার মুখ তাকে দেখে বিবর্ণ হয়ে যায়। আমি তাকে কোন প্রশ্ন করতে পারি না। রুদ্ধশ্বাসে শুধু একটা দুঃসংবাদের প্রতীক্ষা করি। এমন অসময়ে আজ আবার কেন এল রজত?

দীপা, আমার ভীত বিবর্ণ মুখ দেখে একটু বেশি জোরেই রজত বলে, আমি এসেছি—

বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে আমার গায়ে। রজতের কথা আমি শুনতে পাই না। আমি জানি এখুনি ও বলবে—কেন আজ দাদাকে আমি বাইরে বার হতে দিলাম!

কেন—কেন এলে? আমার গলা চিরে যেন একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

ইচ্ছে করেই এলাম। কিন্তু তুমি অমন করছ কেন? তোমার শরীর কাঁপছে কেন?

আমার ভয় লাগছে, ভীষণ ভয়—আমি রজতের মুখের ওপর স্পষ্টই বলে ফেলি, কী বলবে বল? আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না—

কিছু হয় নি দীপা। আমি আজ ইচ্ছে করেই বর্ষার দুপুরে এসেছি।

কেন?

তোমার ভয় ভাঙাতে, রজত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অল্প-অল্প ভেজে, আর একদিন এমন সময়—এমন দুপুরে এসেছিলাম। সে-দিন মৃত্যু ছিল, আজ দীপা দেখ, কোনখানে কোন মৃত্যু নেই।

অনেকক্ষণ, আমি জানি না কতক্ষণ, রজতের ভাষা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মনে হয় আমার। ও বলে, কিছু হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় এই রুপোলি দুপুরে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে যা জীবন-মৃত্যুর কঠিন সেতু ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। আমার বুকের কাঁপন, আমার মুখ চোখ গলার স্বর স্বাভাবিক হয় যখন তখন হঠাৎ আমি দেখতে পাই আমারই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রজত ভিজছে।

এস, ভেতরে এস—বস।

একটা চেয়ারে বসে রজত। পকেট থেকে রুমাল বের করে আলগোছে মুখে আর মাথায় বুলিয়ে নেয়, আমি জানতাম আজ এ সময় আমাকে দেখলে দীপা তুমি চমকে উঠবে, ভয় পাবে।

এখন রজতের কথা শুনতে-শুনতে আমার লজ্জা হয়। আমি যে সত্যি ওকে দেখে আর এক মৃত্যু সংবাদের আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলাম সে কথাটা স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। আমি ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

এই সময় আমি একদিন প্রেমাংশুর সে-খবর শোনাতে এসেছিলাম। কিন্তু আজ আমি উজ্জীবনের খবর নিয়ে তোমার কাছে এসেছি—

রজত আর একবার বলে, এমন ম্লান ভিজে দুপুরেও দেখ দীপা, কোনখানে কোন মৃত্যু নেই। দেখ—দেখতে পাও?

আমি কিছু দেখতে পাই না, দেখতে চাই না—

তোমাকে দেখতে হবেই। এতদিন—আমি যেদিন প্রথম এসেছিলাম সেদিন থেকে তুমি শুধু মৃত্যুকে দেখেছ, মৃতকে দেখেছ। তুমি আর কিছু দেখ নি, আর কাউকে দেখতে চাও নি—

রজতের এক-একটা কথা তীরের মতো আমার মনে খোঁচা দেয়। সমর্পণের কনকনে ভয়ে আমার দেহ হিম হয়ে যায়। দুই হাতে মুখ ঢেকে দীর্ণ অস্পষ্ট স্বরে আমি বলি, আমি পারব না রজত—নিজের কাছে ছোট হতে পারব না—

আমাকে রজত রূঢ় প্রশ্ন করে, প্রেমাংশুকে ছোট করতে পারবে?

না। তাকে ছোট করতে পারব না বলেই আমি আবার নতুন করে বেঁচে উঠতে চাই না। আমি মরতেই চাই। আমাকে একা-একা প্রেমাংশুর মতো মরতে দাও রজত।

দীপা, আমার হাতের ওপর রজতের উষ্ণ একটা হাত এসে পড়ে, আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি, রজতের হাতের চাপ আমি অনুভব করি—ওকে বাধা দিতে পারি না। আমার কানের কাছে ওর ভারী স্বর গম গম করে, কিন্তু প্রেমাংশু—তার প্রেম তোমাকে মরতে দেবে না।

দীপা, মুখ তোল। কথা বল। এমন করে কাঁদ কেন? এমন এক বর্ষার দুপুরে প্রেমাংশু চলে গিয়েছিল। আজ দেখ, আবার সে ফিরে এসেছে। তুমি তাকে নাও।

না না—

আরও একদিন তুমি এমন করে মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। যাবার সময় প্রেমাংশু কি বলে যায় নি, দীপা, আমি আবার আসব?

আমি জানি এই বর্ষার দুপুরেও উজ্জীবনের ছোঁয়ায় মাটি গাছ আকাশ থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু এখনও এত কান্না কেন পৃথিবীতে! প্রেমাংশু এসেছে। প্রেমাংশু কথা রেখেছে। কিন্তু আমার মুখ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। আমি কথা বলতে পারি না। প্রেমাংশু এলেও তাকে গ্রহণ করবার আমার যেন আর শক্তি নেই—সাহস নেই। না, উজ্জীবন আমার জন্যে নয়, আমি মৃত্যুকেই চাই। তবুও রজতের কথা শুনতে-শুনতে চুপ হয়ে যাই। প্রেমাংশুর শেষ কথা, রজতের বলা কথা—যার পরে আর কথা নেই।

রজত ডাকে, দীপা !

না রজত, উজ্জীবনের এ তীব্র আনন্দের ভার আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না—

দীপা, এ পৃথিবীতে আর মৃত্যু নেই। আজ থেকে, এখন থেকে আমি তোমাকে বাঁচাব। আমি তোমাকে ফোটাব অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে রজনীগন্ধার মতো। আমি না। প্রেমাংশু। কী কথা তোমাকে যাবার আগে শুনিয়ে গেছে প্রেমাংশু ?

রজত—

একদিন আমার মুখ থেকে প্রেমাংশুর শেষ কথা শোনার পর তুমি আমাকে বলেছিলে, আমি প্রেমাংশুকে চাই। আমি বাঁচতে চাই না। মরতে চাই।

আমি প্রেমাংশুর ছবির ওপর চোখ রেখে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠি, আমি এখনও মরতে চাই রজত—

সেদিন আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার স্বামী কি তোমাকে চায়—তোমার মৃত্যু চায়—

হ্যাঁ, সব কথা আমার মনে আছে রজত। আজও সেই এক উত্তর আমি তোমাকে দেব—

কিন্তু কেন দেবে ? সেদিন তুমি বলেছিলে, প্রেমাংশু আমাকে চাইবেই—চিরদিন।

আমি আজও ক্ষীণ ভাঙা স্বরে এক মৃতপ্রায় মানুষের মতো বলি, ংশু এখনও আমাকেই চায়।

রজতের দৃঢ় উদ্ধত স্বর যেন ভেঙে পড়ে আমার কানের কাছে, না, চায় না—চাইতে পারে না। দীপা, আমি যদি প্রেমাংশু হতাম —থামে না রজত। কিছু ভাবে না। কোন দিকে তাকায় না। আমার দিকেই তাকিয়ে থাকে। আরও জোরে চেপে ধরে আমার হাত। আরও কাছে সরে এসে দুঃসাহসী পুরুষেব মতো বলে ওঠে, আমি যদি তোমার স্বামী হতাম, আর একদিন হঠাৎ আমাকে পৃথিবী

ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হত, আমি কখনও তোমাকে টেনে নিতে চাইতাম না মৃত্যুর অন্ধকারে—আমি এই আলোর ভুবনেই তোমাকে চিরকাল রাখতে চাইতাম।

প্রতিবাদের একটা মৃদু ঝাঁজ আমার মনের মধ্যে দানা বাঁধে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। স্যাঁতস্যাঁতে দুপুরেও মাঝে মাঝে গাড়ির দমকা আওয়াজ শোনা যায়। একবার আমার ইচ্ছে করে আরও জোরে পাখা চালিয়ে দি। রজতের ভিজে কাপড় অল্পে-অল্পে শুকিয়ে যাক। কিন্তু এখন এক পা নড়বার যেন আমার ক্ষমতা নেই।

এখন আমার গলায় কান্না নেই। আমি মাথা তুলে বলি, তুমি হয় তো নিজে না থাকলেও এই পৃথিবীতে আমাকে রাখতে চাইতে কিন্তু প্রেমাংশু তা চায় না। সে একা থাকতে পারে না। কোন উপায় ছিল না বলেই আমাকে এমন করে ফেলে তাকে চলে যেতে হয়েছে।

রজত হঠাৎ হেসে ওঠে হা-হা করে। হাওয়ার ঝাপটায় প্রেমাংশুর ছবি দুলে ওঠে। আর একটু পরেই হয় তো মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। রজতের হাসি শুনে আমার বুকের কাঁপন দ্রুত হয়। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। ভয়ের সঙ্গে কিন্তু এক আশ্চর্য আনন্দ মিশে থাকে। একটি মানুষ যার উষ্ণ মুঠির মধ্যে আমার হাত, মনে হয়, আজ এই বর্ষায় সে আমাকে যন্ত্রণার জগৎ থেকে টেনে হেঁচড়ে আর এক আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে দেবে। প্রতিবাদ বুক ঠেলে আসে কারণ আমার মনে হয় যুক্তির এক-একটি ধারালো কথায় রজত আমার সব বিশ্বাস, সব সংশয় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিয়ে আমাকে এখুনি নতুন করে ফুটিয়ে তুলবে।

রজতের হাসি থেমে যায়। জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে ওর দুই চোখ। আমি ওকে দেখি। অসঙ্কোচে তাকিয়ে থাকি ওর চোখের দিকে। আর আমার রক্তে, আমার শিরায়, আমি অনুভব করি প্রেমাংশুকে—প্রেমকে। কিন্তু সে-কথাটা আমি এই মুহূর্তে রজতকে বলতে পারব না। কিছুতেই না।

দীপা, রজত আবার কথা বলে, আমি এবার তোমাকে ছোট করব—তোমাকে কৃপা করব—

কেন? কেন?

আমি আবার বলব, তুমি প্রেমাংশুকে ভালবাস নি—কখনও না। তুমি শুধু তার মৃত্যুকে ভালবেসেছ। আর সেই মৃত্যু তোমাকে সরিয়ে এনেছে প্রেমাংশুর কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে—যেখানে প্রেমাংশুর প্রেম মিথ্যা, জীবন মিথ্যা।

আমাকে ছোট কর না রজত—আমাকে কৃপা কর না। প্রেমাংশুকে নিয়ে এস! তাকে ফিরিয়ে দাও। আমাকে বাঁচতে দাও!

তুমি প্রেমাংশুকে মেরেছ দীপা। তুমি তাকে বাঁচতে দাও নি—তাকে বাঁচাতে চাও নি—

রজত!

আমি যদি প্রেমাংশু হতাম, রজত আমার কানের কাছে মুখ আনে। ওর নিশ্বাস লাগে আমার গালে। একটা উত্তাপ আসে কোন দূর বনভূমি থেকে কে জানে, একটা আভা ঝলসায় ঘরের দেয়ালে, প্রেমাংশুর ছবির কাচের ওপর। রজত কথা বলে। ওর স্বর, ওর উত্তাপ আমার রক্তে চারিয়ে যায়।

দীপা, আমি যদি তোমার স্বামী হতাম, তোমাকে ভালবাসতাম প্রেমাংশুর মতো, অন্য লোক থেকেও আমি বলে উঠতাম, দীপা, নিশ্চয়ই আমার দেহ মন প্রাণ দিয়ে এই পৃথিবীর আর সব সুখের কথা মনে করেই বলে উঠতাম, দীপা পৃথিবীতে থাক।

রজত থামে কেন? ও কেন আমার কাছে, খুব কাছে, আরও কাছে এসে এখান থেকে এখনও আমাকে তুলে নিয়ে যায় না অন্য কোথাও? আমার দেহে যেন কোন ভার নেই। আমি শুধু রজতের কথা শুনব—আরও শুনব।

রজত, ঘোর নামে আমার চোখে, আর কী বলতে তুমি?

দীপা, আমি আরও বলতাম—

বল, বল—

আমি বলতাম, দীপাকে যা দিয়েছিলাম তা কি এত ম্লান, যে দীপা সব ভুলে মরতে চায়—ফুরিয়ে যেতে চায়!

দীপা, আমি যদি প্রেমাংশু হতাম, তোমার স্বামী হতাম, অন্য লোকে থাকলেও আমি বলতাম, বলতামই, আমার সে-প্রেম দিয়েই তুমি আমাকে আবার জীবনের স্বাদ দাও—সে-প্রেম দিয়েই তোমার রক্তের উত্তাপে আমাকে আবার বাঁচাও!

অনেক দূর থেকে বলা প্রেমাংশুর কথা রজতের নিশ্বাসে ভেসে আসে। বাঁচার আবেগে, জীবনের ছোঁয়ায় আমি অবশ অচেতন হয়ে যাই।

তখন পৃথিবীতে শেষ মৃত্যু নামে। যা সব পুরানো মৃত্যুকে নিয়ে শুধু জীবনকেই রেখে যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬